মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

প্রকাশক :—
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
আজাদ অফিস, ঢাকেশ্বরী রোড,
ঢাকা—২

প্রথম সংস্করণ
রজবুল মোরাজ্জাব, ১৩৮৫ হিজরী
অগ্রহায়ণ, ১৩৭২ বাং
নভেম্বর, ১৯৬৫ ইং

মুদ্রাকর,
মোহাম্মদ কামরুল আনাম খাঁ
আজাদ প্রেস
ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা—২

মূল্য : ৭'৫০ পয়সা মাত্র।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস

الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره و نؤمن به ونتوكل عليه و نعوذ بالله
من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهدی الله فلا مضل له و من
يضلله فلا هادی له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له و نشهد ان
محمدا عبده و رسوله صلوات الله وسلامه عليه و على آله واصحابه اجمعين -
رب يسر و لا تعسر و تمم بالخير -

বিষয় সূচী

সমাপ্ত

মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

তাফছীরের কাজ আল্লার রহমতে সুসম্পন্ন হওয়ার পর, আমার কএক মাস চিকিৎসা করার ও বিশ্রাম গ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু প্রভু পরওয়ারদেগারের মর্জী হইল অন্যরূপ। ইহার প্রথম প্রকাশ ঘটিল ঢাকার কএকজন মাওলানা বন্ধুর নিতান্ত আকস্মিকভাবে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায়। ইহার কার্যাকারণ পরম্পরা সম্বন্ধে কিছু বলার আবশ্যক মনে করিতেছি না। কিন্তু সেই সময় আমার মনে হইল, কোরআন ও হাদিছের নামকরণে, মুছলমান সমাজে যেসব অনৈছলামিক কুসংস্কারের ও অনৈতিহাসিক অন্ধবিশ্বাসের প্রাদুর্ভাব ঘটাইয়া দেওয়া হইয়াছে—বিশেষতঃ খৃষ্টান-দিগের প্রবর্তিত পুরান-পুথিগুলির যেসব ভিত্তিহীন ও উদ্ভট গল্প কোরআন মজীদের তাফছীরে চরম নিষ্ঠুরতার সহিত ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ শিক্ষিত ও ন্যায়নিষ্ঠ সমাজের সম্মুখে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে। এজন্য আমি প্রস্তুতও হইতেছিলাম। এই উদ্দেশ্যে, "কোরআনের হজরত ঈছা ও বাইবেলের যীশুখৃষ্ট" নামক একখানা পুস্তকের ভূমিকাও লিখিত হইয়াছিল।

একান্ত অবান্তর হইলেও, নিজের বর্তমান অবস্থারও একটু পরিচয় এখানে দিয়া রাখিতে হইতেছে। আমার বয়স এখন ৯৪ বৎসরের শেষে উপনীত। প্লুরিসি রোগে ভুগিয়া একটি Lung অচল হইয়া আছে কম বেশী ২৫ বৎসর হইতে। কোমরের বেদনাও অনেক দিনের সঙ্গসাথী হইয়া আছে। তাফছীরের খেদমতে দীর্ঘকাল (১২ বৎসর) অবিরাম কুরসির উপর (পা ঝুলাইয়া) বসিয়া থাকিতে থাকিতে শরীরের নিম্নাঙ্গ শোথ ও বাত বেদনার আক্রমণে একপ্রকার পঙ্গু। কিন্তু আল্লার ফজলে হাত দুইখানা, চোখ দুটি ও মস্তিক এখনও সচল ও সবল আছে।

গত পীড়ার পর, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মুখে শুনিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাঁহারা সকলে আমার জীবন সম্বন্ধে একপ্রকার হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন আমার মনে হইল, শরীরে একটু বল পাইলে আমার সঙ্কল্পিত কাজগুলি যত সত্তর সম্ভব সমাপ্ত করিয়া ফেলিব। এই "কাজগুলির" সন্ধান নিতে গিয়া দেখিতে পাইলাম—মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস নামক একখানা কপি বুক আর কতকগুলি এলোমেলো গোছের ফস কাগজ এবং তাহাতে কতকগুলি অস্পষ্ট

"নোট" ও ইঙ্গিত। বহুদিন হইতে আমাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা চলিয়া আসিতেছিল। তখন একজন বন্ধুর "কৃপায়" দুই মাস তাফছীরুল কোরআন ছাপার কাজ বন্ধ থাকে! সে সময়ে আমি সময় কাটাইবার জন্য কিছু পড়াশোনা করিয়াছিলাম। আমি মরিয়া গেলে এগুলির কেহ তল্লাস নিবে না বা নিতে পারিবে না —এই ভয়ে, যতটুকু এখন সঙ্কলিত আছে, এবং পূর্ববর্ত্তী স্বদেশী ও বিদেশী লেখকগণের বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ বিচার আলোচনাগুলি পাঠ করিয়া এ পর্য্যন্ত যে সব তথ্য জানিতে পারিয়াছি, তাহা বিক্ষিপ্তভাবে কাগজের হাওলা করিয়া রাখিয়াছি।

মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে বিচার আলোচনা করা যে সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে, অভিজ্ঞ পাঠকবর্গকে তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। ভারতের সহিত বিশেষতঃ বঙ্গদেশের সহিত আরবদিগের ও ইছলাম ধর্মের সংশ্রবের ফল, তাহার সময়, বঙ্গদেশের পুরাতন ইতিহাস ও বিদেশী আর্য্যদিগের প্রতি তাহাদের তৎকালীন মনোভাব, বৌদ্ধ জৈন এবং বৈষ্ণব ও খৃষ্টান ধর্মের প্রভাব ও প্রসার, বাংলা ভাষার উৎপত্তি এবং তাহার ক্রমবিকাশ বা বিকার, এই দীর্ঘ সময় ধরিয়া তাহাদের সমাজ জীবনের, তাহাদের ধর্মীয় আচার ব্যবহারের, তাহাদের আত্ম-রক্ষার সাধনা ও সংগ্রাম প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সন্ধান আমাদিগকে লইতে হইবে। এমন অনেক প্রশ্নও আছে, বর্তমানে তাহা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বাহ্যতঃ অবান্তর বলিয়া মনে হইবে কিন্তু পরে দেখা যাইবে সেইগুলিই বস্তুতঃ অধিক দরকারী ও মৌলিক তথ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই প্রবন্ধটা সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত, ইহার বিষয়বস্তুগুলি কতক-গুলি বিক্ষিপ্ত তথ্যের সমষ্টিমাত্র। পাঠকগণ সেই হিসাবে ইহার বিচার করিলে বাধিত হইব। এই হিসাবে নিম্নে কতকগুলি সম-অর্থবাচক আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত শব্দ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

সম অর্থবাচক

সংস্কৃত ও আরবী শব্দের তালিকা

(১) অল্ল, অল্ল+অ=আল্লা। اَللّٰهُ।

তাৎপর্য্য—(ক) "পরম দেবতা" (বা, ভাঃ অভিধান)

(খ) "পরমেশ্বর··· যিনি সর্ব্বগ্রাহী, ইহাই ব্যুৎপত্তির লভ্য অর্থ (সং)।" (অভিধান)

"অল্ল অল্লা (=আল্ল, আল্লা,) মুসলমানদের উপাস্য পরম দেবতা। আমাদের অথর্বন সূত্রে ঐ পরম পুরুষের উপাসনার কথা উল্লিখিত আছে (বিশ্বকোষ, ১, ৫৮৫)।

বিশ্বকোষ-প্রণেতা প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয় আল্লা-উপনিষদের এই অংশের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যে সব অসঙ্গত মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার পুনঃ পুনঃ যথেষ্ট প্রতিবাদ করা হইয়াছে। দরকার হইলে পরেও তাহার বিচার করা যাইতে পারিবে।

(২) আপদ=আফৎ। آفت

(৩) ছতর=ছত্র (سطر)

(৪) কার্পাস=কার্বাছ كرباس

(৫) মা, সংস্কৃতে বারণ, আরবীতে "মা"—যেমন তুমি করিও না, এবং তুমি কর নাই।

(৬) শ্রমন—শর্ম্মন=শমন شمن

(৭) কর্পূর—কাফুর كافور

(৮) মানুষ, প্রাকৃতে মানুস=মানুছ। انس। ধাতু হইতে ইনছান।

(৯) ম'ন=মান্ বা মান্নোন্। من অর্থ—যাহা দ্বারা ওজন করা যায়।

(১০) মা (মাতা)=উম্মা। ام

(১১) হলাহল=হলাহল। هلاهل

(১২) পলিতা=ফালিতা فليتة

(১৩) রমল,
(১৪) জফর } উভয় জ্যোতিষের পরিভাষা।

(১৫) ব্যাম—(বাঁও)=বাওম باع

(১৬) শীত+অ শিতা,=শিতা شتا

(১৭) ছর্দ্দি,=ছাদ্দি, صردى

(১৮) সোনামুখী=ছানা মাক্কী سنامكى

(১৯) দ্রাবিড়=দ্রাভিদ ঃ دراويد

(২০) গান=(গনা غنا)

(২১) ক্রময়েল=গেমল, আরবী জামল।

(২২) আর্য্য=আরিয়া। আর্য্য। ارية

(২৩) চন্দন=ছন্দল صندل

(২৪) দীনার=দীনার। دينار স্বর্ণ মুদ্রা।

(২৫) অকর্কর=اقر قرة আকর করা।

(২৬) ব্রাহ্মণ=বেরাহমন। برهمن

(২৭) কামরূপ=কামরূ। قمرو

(২৮) অহিফেন=আফয়ুন—افيون-افعى (অহিশাপ, আফয়ী শাপ)

(২৯) ক্রিম, কৃমি (কীট, পোকা)—ক্রেম, کرم

(৩০) নায়ক,' 'শৃঙ্গার সাধক''—নায়েক نایک

(৩১) কলম—কলম, قلم

সম অর্থ বাচক
সংস্কৃত ও ফার্সী শব্দের তালিকা

(১) এক—য়াক্, দুই—দো, এইরূপে (তিন=(ছেহ্) বাদে ৯৯ পর্য্যন্ত সমস্ত শব্দ।

(২) শত—ছদ, صد

(৩) সপ্তাহ—হফতা, هفته

(৪) শৃগাল—শেগাল, شغال

(৫) মাস—মাহ, ماه

(৬) সপ্তসিন্ধু—হপ্তহিন্দু। هفت هندو

(৭) উষ্ট্র—উশতর اشتر।

(৮) গৌ—গাও, گاو

(৯) খার—খার, خر গাধা।

(১০) মেষ—মেষ میش

(১১) অ'ঙ্গীর—অঙ্গীরা انگره।

(১২) অঙ্গুষ্ঠ—অ'ঙ্গুশ্ত, انگشت।

(১৩) গ্রীবা, গ্রীবেন—গ্রেবান گریبان

(১৪) দুর্নাম—দুষ্‌নাম, دشنام

—যথা গীষ্পতি ও গীর্পতি।

(১৫) দেব—দেও, دیو

ওয়াও বর্ণের উচ্চারণ-ভেদ স্মরনীয়।

(১৬) দৈত্য—দাৎ দت

(১৭) পূর্ণিমা, পূণিমা پرنیمه —পূর্ণার্দ্ধ।

(১৮) আপ্—আব (পানি), যেমন পাদশাহ ও বাদশাহ।

(১৯) আম্র—আম।

(২০) অস্তি—আস্ত است।

(২১) শর্করা—শাক্কর—شکر

(২২) আর্দ্রক—আদ্‌রক—ادرک।

(২৩) তাম্বুল—তাম্বুল تمبول—পান।

(২৪) তাপ—তাব। تاب

(২৫) দ্বার—দার্—در দরজা।

(২৬) গন্ধ—গন্দ।

(২৭) কাম—কাম। کام, বাসনা, মনোবাঞ্ছা।

(২৮) বাজ—বাজ।

(২৯) নারিকেল—নারজীল نارجیل

(৩০) মোম—মোম, موم

(৩১) অশ্বতর—অ'ছ্তর—استر। খচ্চর।

(৩২) নায়ক—নায়েক।

(৩৩) তুরঙ্গ—অশ্ব, ترنگ

এই শব্দগুলি উদ্ধৃত করিয়া আমি দেখাইতে চাহিয়াছি যে, সে কালের সংস্কৃত ভাষী, আরবীভাষী ও পার্সীভাষী "আর্য্য"রা পরস্পরের নিকটবর্তী একই অঞ্চলে বসবাস করিয়াছিলেন। একই পরিবেশে দীর্ঘকাল অবস্থান করার ফলে, স্বাভাবিকভাবে তাঁহাদের মধ্যে, এই সকল, এবং এইরূপ আরও বহু শব্দের আদান প্রদান ঘটিয়াছিল। তখনকার দিনে আরবী পার্সী শিক্ষার প্রতি হিন্দু আর্য্যদের যে কত আগ্রহ ছিল এবং ঐ ভাষা দুইটি শিক্ষার জন্য তাহারা কিরূপ নিষ্ঠার সহিত উদ্যোগী হইতেন, নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় বচন হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে :—

"জ্যৈষ্ঠাশ্লেষা মঘা মূলা রেবতী ভরণীদ্বয়ে।
বিশাখা শ্চোওরাষাঢ়া শতর্ভে পাপ বাসরে॥
লগ্নে স্থিরে সচন্দ্রেচ পারসীমারবীং পঠেত॥"
ইতিগর্ণপতি মুহূর্ত্ত চিন্তামনি।
(শব্দকল্পদ্রুম ও বিশ্বকোষ হইতে উদ্ধৃত)

অর্থাৎ—জ্যৈষ্ঠা, অশ্লেষা, মঘা, মূলা, রেবতী, ভরণী, বিশাখা, উত্তরষঢ়া ও শতভিষা নক্ষত্রে, শনি রবি ও মঙ্গলবারে, সচন্দ্রস্থিরলগ্নে আরবী ও পার্সী অধ্যয়ন করিবে।

বিশ্বকোষ-কর্ত্তা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিতেছেন: আর্য্য (অর্থাৎ হিন্দু আর্য্য) ও পারসিকেরা বহুদিন হইতে যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহা এই উভয় জাতির ভাষা ও আচার ব্যবহার দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।" পার্সীদের ন্যায় অতটা ঘনিষ্ট সংশ্রব না হইলেও, আরবদের সহিতও তাঁহাদের যে পারিবেশিক সংশ্রব ছিল, তাহাও স্বতঃ প্রমাণিত হইয়া আছে।

আরবী, পার্সী ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে কোন্‌টা অধিক প্রাচীন, এক্ষেত্রে তাহা আমাদের বিবেচ্য নহে। এই আলোচনায় শুধু এই ভাষাগুলির পরস্পর আদান প্রদানের

পরিচয় দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ঐসকল ভাষাভাষীরা যে পূর্ব্বে দীর্ঘকাল একই জনপদে অবস্থান করিয়াছিলেন, উপস্থিত ইহাই আমার প্রতিপাদ্য। তবে ঐ ভাষাগুলি সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কএকটা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করাও আবশ্যক মনে করিতেছি।

যে ভাষার অথবা যেসব ভাষার সংমিশ্রণের বা সংস্করণের ফলে বৈদিক সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি ঘটিয়াছিল, সেগুলির নিরপেক্ষ বিচার আলোচনা করিলে, স্পষ্টতঃ দেখা যাইবে যে, বৈদিক ভাষাকে সভ্য মানব সমাজের আদি ভাষা বলিয়া কোনো-মতেই গ্রহণ করা যাইতে পারেনা। পার্সী ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যথাযথভাবে আলোচনা করার সুযোগ এখনও আমার ঘটে নাই। আরবী ভাষাকে দুনিয়ার আদিম বা সর্ব্বপ্রথম ভাষা বলিয়া দাবী করার কোনো সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া আমি জানিতে পারি নাই। কিন্তু অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা ইহা নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে. বাইবেল পুরাতন নিয়ম বা মোসির পঞ্চ পুস্তক প্রভৃতি রচিত হওয়ার অন্ততঃ সমকালে, তাহার মধ্যকার একখানা কেতাব বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। পুস্তকখানার নাম Book of job, আরবীতে اسفر ايوب الصديق খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতকে পুস্তকটি রচিত হইয়াছে বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন (Ency. Britanica)। বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক হিত্তী (Hitti) এই পুস্তকের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

In job 6-19 the Sheba (Ar Saba) are associated with Tema (Tayma'). Job, the author of the Finest piece of poetry that the ancient Semitic world produerd, was an Arab, not a Jew as the form of his name Iyyob, (Ar. Ayyub) and the scene of his book, North Arabia, indicate, (P. 42-43)।

মর্ম্মার্থ :—

জোবের কবিতায় শেবা (আরবী ছাবা) তেমার (তায়মা) সঙ্গে সংযুক্ত বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। প্রাচীন সেমেটিক দুনয়ার সবচাইতে সেরা কবিতার রচয়িতা জোব একজন আরব ছিলেন, ইহুদী ছিলেন না। তাহার আয়ুব (আরবী আইয়ুব) নামের গঠন এবং তাহার পুস্তকে উত্তর আববের দৃশ্যাবলীর বর্ণনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয়। (পৃঃ ৪২—৪৩)।

"পারস্যের স্বনামখ্যাত সম্রাট দাড়িউশ (দারা) তাঁহার نقش رستم নামক প্রাসাদে যে শিলালিপি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আজও মওজুদ আছে। তাহাতে দারিউশ এইভাবে নিজের পরিচয় দিতেছেন :—

منم دار یوش شاه بزرگ شاهان شاه........

پسر و یشتاسپ هخامنشی—پارسی پسرپارسی

آریائی ازنژاد آریائی...وقتنیکه اهورا مزدا
دید که کار زمین مختل شده، آنرا بمن سپرد الخ

আমি দারিউশ মহাসম্রাট রাজাধিরাজ, য়েশতাছপের পুত্র, (আমি হইতেছি) পার্সীর পুত্র পার্সী, আর্য্য ও আর্য্য বংশ সম্ভূত"'যখন অহুরা মাজদা (খোদাঅন্দে আলীম) দেখিলেন যে, দুনয়ার কাজ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তখন তিনি তাহা আমার ছোপর্দ্দ করিলেন এবং আমাকে বাদশা বানাইয়া দিলেন"—ইত্যাদি।

(দানেশগাহে তেহরান হইতে প্রকাশিত هشت مقاله হইতে উদ্ধৃত)।

এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে দেখান হইয়াছে যে, আরিয়া শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষাতেও প্রচলিত ছিল। আরবীতে (আরিয়া اری) য়া-বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ স্থলে য়-বর্ণ য-এ পরিবর্তিত হইয়া যায়, তখন উহার উচ্চারণ হইবে অনেকটা আর্য্য শব্দের বাঙ্গালা উচ্চারণের মত। অভিধান (ছোরাহ) আরও বলিয়াছেন যে, "পারস্যের একটি শহরের নাম ارجان আরজান। উহা ফার্সী আরগান শব্দ হইতে গৃহীত।" আমি যতদূর জানি, ফার্সী ব্যাকরণ অনুসারে আর্য্যঃ বা আরিয়াঃ শব্দের শেষোক্ত ঃ বা উহ্য হে-বর্ণ গাফে বদল হইয়া আরগান হইয়াছে। "গান" বহু বচন। অর্থাৎ উহার অর্থ হইবে আর্য্যগণ। কেহ কেহ "গান" শব্দের (ن) নুন বা ন-বর্ণকে غنه বা আনুনাসিক উচ্চারণ করিয়াছেন। আমার মতে ইহার অর্থ হইবে আর্য্যগণ। উপরোক্ত আরবী ভূগোলেও এই আর'জান নামক স্থানের উল্লেখ আছে। তখন পারস্যের আদী অধিবাসী "হিন্দু ও পারিসকগণ" সকলে নিজদিগকে আর্য্য বলিয়া প্রকাশ করিতেন।

আরব ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকগণও মিছর এবং ঈরাণের পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বিখ্যাত ভৌগোলিক য়াকুত হামাভীর দীর্ঘ বর্ণনার প্রাসঙ্গিক অংশ এই যে, " 'ফারেছ' শব্দ ফেরাছাত মাছদর হইতে উৎপন্ন আরবী নাম। উহার অর্থ বিদ্বান, জ্ঞানবান ও সুচতুর। তাই তাহাদের ফারছী নাম হইয়াছে বিচক্ষণ ও আলেম বা বিদ্বান লোক।" "ফারেছ দেশের নাম নহে। ফারেছ হজরত নূহের পৌত্র বা প্রপৌত্র, পারস্য দেশ যে সেকালে জ্ঞানচর্চ্চার বা বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল, য়াকুত তাহারও বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যরা বলিয়াছেন, ফারেছ মূলতঃ পার্সী শব্দ, আরবেরা উহাকে আরবী করিয়া নিয়াছেন। এই ভৌগোলিকের ও অন্যান্য ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকের মতামতের মধ্যে কিছু কিছু প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারা সকলে একমত যে, হজরত নূহের সমসাময়িক মহাপ্লাবনের পরবর্তী বংশধরদিগের একজন, সম্ভবতঃ তাহার পৌত্র বা প্রপৌত্র "ফারেছ" এই বিরাট জাতির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বা আদি পুরুষ। পারস্য দেশে, বিশেষতঃ ভারতের সীমান্তবর্তী খোরাছান প্রদেশে, বহু বিভিন্ন শ্রেণীর বহিরাগত লোকদিগের সমাগম হইয়াছিল, ইহাও ইতিহাস হইতে জানা যায়। আরবী

অভিধানকারদিগের বর্ণনা মতে "আর্যা" শব্দের অর্থ, মধু, বৃষ্টিধারা, ভীমরুলের চাক। এই কর্মপদে তাহার অর্থ হইবে—

اری صدره بالحسد، ای وغریعنی پرشد از کینه

অর্থাৎ "তাহার অন্তঃকরণ হিংসা বিদ্বেষে পূর্ণ হইল।'

এইরূপে আর্যুন ধাতু হইতে উৎপন্ন "তা'রিজ" Infinitive Mood বা মাছদারের অর্থ—برانگیختن وبراغالیدن অর্থাৎ কাহাকে কোন অসঙ্গত কাজের জন্ম উত্তেজিত বা প্ররোচিত করা। আরব দেশের বাক্‌র ও তাগলাক্‌ নামক দুইটি গোত্রকে প্ররোচিত করিয়া তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়াছিল যে ব্যাক্তি, আরবী ভাষায় তাহার নাম পড়িয়া গিয়াছে "মু'রেজ" বলিয়া।—ছোরাহ, মোন্তাখাব প্রভৃতি। আমার মনে হয়, হিন্দু আর্য্যদের পরবর্ত্তী যুগের ব্যবহৃত যবন, ম্লেচ্ছ, রাক্ষস ইত্যাদি শব্দের ইহা প্রতিধ্বনি মাত্র।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, এক দেশবাসী বিভিন্ন দলের মধ্যে এই মত-ভেদের ও পথভেদের কারণ কি ঘটিয়াছিল, কোন গুরুতর বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া পারস্যবাসীরা পরিণামে ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধবিগ্রহের পরিণাম কি ঘটিয়াছিল?

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করা হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈরাণীদের আত্মবিরোধ

দীর্ঘকাল একত্রে বাস, একই ধর্মের অনুসরণ এবং অভিন্ন সামাজিক আচার ব্যবহার সত্ত্বেও ঈরাণের প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে এমন সর্ব্বব্যাপী বিরোধ ও সর্ব্বনাশী যুদ্ধ বিগ্রহের কারণ কি ঘটিয়াছিল, এখন আমাদিগকে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়া তাহার বিচার আলোচনা করিতে হইবে। ইহাই এখনকার প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে একদল ঈরাণবাসীর দেশত্যাগের পর তাঁহারা কোন্ পথে কোন্ দেশে বা কোন্ কোন্ দেশে গমন ও অবস্থান করিয়াছিলেন। নিম্নে যথাক্রমে এই বিষয় দুইটার আলোচনা করিতেছি।

এই আলোচনার সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক সূত্র হইতেছে দুইটা—ভারতবর্ষীয় আর্য্যদের প্রাচীন সাহিত্য,—যথা বেদ, পুরাণ ইত্যাদি। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ ইহারই অনুসরণ করিয়া, এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার দ্বিতীয় সূত্র হইতেছে ঈরাণীদের সংস্কার-পূর্বযুগের এবং জরদশ্‌তের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তীযুগের ঐতিহাসিক উপকরণগুলি।

দ্বিতীয় সূত্রটা অবলম্বন করিয়া কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুসাধ্য না হইলেও একেবারে অসাধ্য নহে। ঈরাণের পুনঃ পুনঃ ভাষা পরিবর্ত্তন ও বর্ণমালার বহু রূপান্তর এবং তাহার অধিকাংশ ধর্ম্মীয় ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক পুঁথি পুস্তকগুলির বিলোপ, এক্ষেত্রেও সত্যান্বেষীর পথে বহু বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু কতকগুলি ধ্বংসাবশিষ্ট পুথি পুস্তকের, বিশেষতঃ ঈরাণীদের জার্দাশ্‌ত নামা, ও ফেরদাওছীর শাহ-নামার কল্যাণে এবং কতিপয় মূল্যবান পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে এই দুর্গম পথটী ক্রমে সুগম হইয়া চলিয়াছে।

তবু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, সংস্কৃত ভাষাভাষী আর্য্যদিগের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সত্য-অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিককে একেবারে দিশা-হারা হইয়া পড়িতে হয়। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হইয়া যাইবে। আমাদের সুবিজ্ঞ হিন্দু লেখকগণ সর্ব্বপ্রথমে স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরিয়া নিয়া থাকেন যে, ঋগ্বেদই হইতেছে জগতের সর্ব্বপ্রথম (আদি) ধর্ম্মগ্রন্থ। তাঁহাদের সর্ব্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে অন্যান্য বেদ মন্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল এবং ঐ মন্ত্রগুলি একত্র সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহার বহু বহু যুগ পরে। কিন্তু ঋগ্বেদের ও অন্যান্য বেদগুলির প্রাচীনত্বের দাবী স্বীকার করিতে হইলে, প্রথমে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উপস্থিত হয় ঐ বেদ-মন্ত্রগুলির রচনা ও সঙ্কলনের কাল সম্বন্ধে। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারাই আবার মুক্ত কণ্ঠে

ঘোষণা করিতেছেন যে, "বেদের সময় নির্দ্ধারণে এপর্য্যন্ত কেহই একমত হইতে পারেন নাই, কিন্তু সকলেই বেদকে পৃথিবীর আদিগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।" (রমেশচন্দ্র দত্ত)। পণ্ডিত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বেদের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনার পর বলিতেছেন—"সুতরাং বেদের কাল নির্ণয় অসম্ভব ব্যাপার।" (শাস্ত্র তত্ত্ব, ২৮ খণ্ড, ঋগ্বেদ, উপক্রণিকা, ৮৯ পৃষ্ঠা)

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—

"বেদের কাল কেহ বিদিত নয় এবং তৎনির্ণয় প্রয়াসও বিড়ম্বনা মাত্র।" সুতরাং বেদকে পৃথিবীর আদিগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়ার অনুকুলে যুক্তি প্রমাণ কিছুই নাই, ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত বেদের সংখ্যা, বিভিন্ন বেদের পারম্পর্য্য প্রভৃতি নিয়া আরও বহু সমস্যার উদ্ভব হইয়া আছে।

আমাদের পাঠকবর্গ হয়ত মনে মনে বলিতেছেন—প্রবন্ধের নাম দেওয়া হইয়াছে "মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস।" ইহাতে "শিবের গীত" আমদানী করা কি কারণে? আমি তাহাদের খেদমতে সবিনয়ে এইটুকু আরজ করিয়া রাখিতেছি যে, তাঁহাদের বিরক্তির ভয়ে, আমি প্রবন্ধটা অতি সংক্ষেপে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। ফলে অনেক দরকারী প্রসঙ্গ বাদ দিতে হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

এই প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য হইতেছে দুইটী বিষয়—

(১) বহুকাল একদেশে অতি ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করা সত্ত্বেও, তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হওয়ার প্রকৃত কারণ কি ছিল—ইহার ফল কি ঘটিয়াছিল?

ঋগ্বেদে এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাওয়া যাইতেছেনা। ইহার ভাষ্যকার ও বাংলা অনুবাদক পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ মহাভারতের আদি পর্ব্ব হইতে কএকটা শ্লোক (৫—১০) উদ্ধৃত করিয়া দিয়া তাঁহার পাঠকগণকে পরিতুষ্ট করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমি তাঁহার উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিয়া আদৌ পরিতুষ্ট হইতে পারি নাই। কেন পারি নাই, শ্লোকগুলির অনুবাদ পাঠ করিলে সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

শ্লোকগুলিতে বলা হইতেছে :—

"এই চরাচর ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য লইয়া পূর্ব্বে দেব ও অসুরের কলহ হইয়াছিল। সেই সময় জয়লাভ বাসনার্থে দেবগণ অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে শুক্রাচার্য্যকে দৈত্যগণ আপনাদিগের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করেন। এই বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য চিরকালই পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত স্পর্দ্ধা করিতেন। ঐ সময় দেবগণ সমরাঙ্গণে যে সকল দৈত্য দানবকে সংহার করিতেন, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনঃ জীবিত করিতেন এবং জীবন লাভ করিয়া সেই দৈত্য দানবেরা আবার দেবগণসহ যুদ্ধ করিতেন। কিন্তু অসুরগণ যে সকল দেবতাকে বধ করিতেন, উদারধী বৃহস্পতি তাহাদিগকে আর বাঁচাইতে পারিতেন না। কেননা শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী বিদ্যাবলে মৃত অসুরগণকে পুনর্জ্জীবিত করিতেন কিন্তু দেবগুরু বৃহস্পতি সে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জানিতেন না। ইহাতে দেবগণ নিতান্তই বিষাদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

এই বর্ণনায় দেবের প্রতিপক্ষ হিসাবে অসুর শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। অসুর বলিতে যে ঈরাণীদের আহুরকে বুঝাইয়া থাকে, তাহা সকলে স্বীকার করিতেছেন। ঋগ্বেদে এই অসুর শব্দের উল্লেখ আছে। বিশ্বকোষ-সম্পাদক এই প্রসঙ্গে বলিতে-ছেন :—"আবস্তিক অহুর শব্দের অর্থ প্রভু ও জীবিতমান।...সায়ণাচার্য্য বেদ সংহিতার অনেক স্থানে অসুর শব্দ সর্ব্বজীবের প্রাণদাতা, সুতরাং দেবগুণবাচক, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় ১।৩৫।৯ ঋকের ভাষ্যে "অসুরঃ সর্ব্বেষাং প্রাণদঃ" এবং দশম ঋকেও অসুর শব্দের ঐ অর্থই সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১১—২৮৫ পৃষ্ঠা।

এই বৃহস্পতি হইতেছেন—সুর গুরু, দেবতাদিগের আচার্য্য এবং খুব সম্ভব চার্ব্বাক দর্শনকার মুনি। আর শুক্রাচার্য্য হইতেছেন দৈত্যগুরু, "ষণ্ডামার্কের" পিতা এক নম্বরের

মায়াবী। দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁহার হাত হইতে সুর দেবগণকে রক্ষা করিলেন না, বা করিতে পারিলেন না। অথচ একদিনেই তিনি পঞ্চাশ হাজার কৃষ্ণচর্ম্ম আদিম অধিবাসীকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া ঋগ্বেদেই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই শ্রেণীর আজগুবী গালগুজবকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কোনও ন্যায়নিষ্ঠ ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। এখানে দেব ও দৈত্যের মধ্যে সংগ্রামের কথা বলা হইতেছে। অন্যত্র দেবরাজ ও দেব সেনাপতি ইন্দ্রের সহিত অসুরদিগের যুদ্ধবিগ্রহের অন্যান্য ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। প্রকৃত অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করার জন্য দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

ইন্দ্র দেবরাজ, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই অসুর শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। অতএব মোটামুটিভাবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাঁহার পিতা বা ভ্রাতারাও দেব-দলভুক্ত ছিলেন, অসুর ছিলেন না। কিন্তু ঋগ্বেদেই দেখা যাইতেছে, ইন্দ্র নিজের সহোদর ভ্রাতা "বৃত্রাসুর"কে হত্যা করিয়াছিলেন, অন্যান্য ভ্রাতাকেও তিনি হত্যা করিয়াছেন। এমন কি, নিজের জন্মদাতা পিতাকে, "দুই ঠ্যাং ধরিয়া আছড়াইয়া আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিতেও" তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। *

"এইরূপে, বৈজয়ন্তরাজ তিমিধ্বজ বা মহাসুর শম্বরের সহিত দেবগণের যুদ্ধ বিবরণে দেখা যাইতেছে যে, দেবগণ শম্বরকে যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। না পারার কারণও পূর্ব্ববৎ।—"মন্থরা কৈকয়ীকে বলিতেছেন—"মহাসুর শম্বর শত শত মায়া জানিতেন...এই মহাসমরে দেবপক্ষীয় সৈনিকগণ একদা সমস্ত দিবস যুদ্ধ করিয়া ক্লান্তি পরিহার-মানসে রাত্রিতে ক্ষত বিক্ষত শরীরে নিদ্রাগত হইলে রাক্ষসগণ বলক্রমে তাহাদিগকে শয্যা হইতে লইয়া গিয়া প্রাণ সংহার করিয়াছিল।" (মন্থরা দেবী কৈকয়ীকে আরও বলিতেছেন) সেই রাত্রিতে অসুরদিগের সহিত গুরুতর যুদ্ধে মহাবাহু রাজা দশরথের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল এবং তিনি অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনন্তর তুমি স্বয়ং সারথি হইয়া, তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্যত্র লইয়া গিয়া রক্ষা করিয়াছিলে (বাল্মীকি, রামায়ণ, অযোধ্যা কাণ্ড)। ইহার পর ইন্দ্র শম্বরকে বিনাশ করিবার জন্য স্বর্গমর্ত্ত আলোড়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহার মাথা কাটা হইল ও তাহার স্থলে ঘোড়ার মাথা বসান হইল। অবশেষে ব্রহ্মার শরণ হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, দধিচী মুনির হাড় দিয়া অস্ত্র বানাইয়া শম্বরের উপর সেই অস্ত্রের আঘাত করিলে সে মরিবে, অন্য কোনো উপায়ে তাহাকে বধ করা যাইবে না। ইন্দ্র অস্থি ভিক্ষা করার জন্য দধিচীর কাছে উপস্থিত হইলে, তিনি বিনা আপত্তিতে মৃত্যু বরণ করিলেন এবং তাহা দ্বারা অস্ত্র বানাইয়া মহাসুর শম্বরকে বধ করিলেন। ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানেও এই উপাখ্যানের কতক অংশের উল্লেখ আছে।

---

* অহন্‌ বৃত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রম বজ্রেন মহতা বধেন (ঋগ্বেদ, ১।৩২।১ মণ্ডল। অর্থাৎ— "জগতের আবরণকারী বৃত্রকে মহাধ্বংসকারী বজ্রদ্বারা ছিন্নবাহু করিয়া বিনাশ করেন।"

ভক্তরা এই উপাখ্যানগুলিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু বাহিরের লোক আমরা এগুলিকে কোনও মতে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ইহার পর ঈরাণের জাতীয় ইতিহাস ও তাহার ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া **আমাদিগকে প্রথম প্রশ্নের সঠিক উত্তর উদ্ধার করার চেষ্টা পাইতে হইবে।** সুখের বিষয়, পূর্ব্ববর্ত্তী কএকজন মুছলমান ও অমুছলমান ঐতিহাসিকের আন্তরিক চেষ্টার ফলে, বর্ত্তমানে ইহা অনেকটা সহজ হইয়া গিয়াছে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর

ঈরাণ দেশের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, বাদশাহ গাশ্‌-তাছপের রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, উহার অধিবাসীদিগের মন ও মস্তিষ্ক অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। অন্যান্য প্রাচীন মানব সমাজের ন্যায় তাহারাও ছিল ঘোর জড়-পূজক। প্রকৃতির প্রত্যেক অবদান—এমন কি ভেক পর্য্যন্ত ছিল তাহাদের পূজার দেবতা। বিবাহ পদ্ধতিতেও নানাবিধ অনাচারের প্রাদুর্ভাব ছিল। হিন্দুদের মত তাহাদের মধ্যেও নরমেধ যজ্ঞের প্রচলন ছিল। দাস প্রথা ইত্যাদির তো কথাই নাই।

এই সময় ঈরাণ দেশে "জরদশ্‌ত" নামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। ইংরাজীতে ইঁহার নাম লেখা হয় Zoroaster বলিয়া। বিশ্বকোষে ইহার অনুলিখনে "জরথুস্ত্রস্পিতম" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই মহাপুরুষের প্রকৃত নাম হইতেছে জরদুশ্‌তর' বা জরদ-উষ্ট্র। শাব্দিক অর্থ পীতবর্ণের উষ্ট্র। আরব ও এশিয়ার বহু-দেশে জরদ বা পীতবর্ণের উঁট অতিশয় মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়। আমাদের দেশের এবং অন্যান্য প্রাচীন-দেশের পৌরাণিক ইতিহাসে অনেক মান্যগণ্য লোকেরও এইরূপ নাম দেখা যায়। যেমন—

উষ্ট্রনাথ, কুক্কুরী সিদ্ধাচার্য্য, কুক্কুট নাথ, কৃমিকণ্ঠ, অশ্বগুপ্ত, অশ্ব ঘোষ, অশ্ব মিত্র ইত্যাদি। প্রচলিত ফার্সী সাহিত্যের ব্যবহার অনুসারে আমি সংক্ষিপ্ত নামের ব্যবহার করিয়াছি।

জরদাশ্‌তের অভিমত ও সংস্কার চেষ্টার পরিচয় সম্বন্ধে, ঈরাণী ইতিহাসের সুবিজ্ঞ লেখক Sir Percy Sykes-এর একটী মন্তব্য সর্ব্বপ্রথমে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

His youth was given up to meditation and retirement, in the course of which he saw seven visions and endured various temptations. Ultimately he proclaimed his mission, but for many long years he met with little success; indeed, in the first decade he gained only one convert.

Gushtasp, the First Royal Convert.—Zoroaster was then inspired to travel to Eastern Persia, and at Kishmar in the province of Khorasan he met Vistap, the Gushtasp of Firdausi's epic. At this ruler's Court he first converted the two sons of the Vizier and then the Queen. There

was a formal disputation between the Prophet and the wise men, during the course of which they tried to overcome him by their magic; but Zoroaster triumphed and gained the King himself as a fervid convert to the new religion. To quote from the Farvardin Yashi:

He it was who became the arm and the support of the Religion of Zarathustra, of Ahura; He, who dragged from her chains, the Religion, that was bound in fetters and unable to stir.

The conversion of Gushtasp and his Court was followed by invasions of the Turanian tribes of Central Asia, perhaps provoked by crusades of the converts. These "Holy Wars", as they may be considered, were waged mainly in Khorasan, and, if the legend can be trusted, the deciding battle was fought to the west of the modern town of Sabzawar. Zoroaster, full of years and honours, was slain at Balkh when the Turanians made their second invasion, The tradition runs that he died at the altar, surrounded by his disciples.

তরজমা ঃ—

তাঁহার যৌবন কাটিয়াছে তপস্যার নির্জনতার মাঝে। এ-সময়ে তিনি সাতটি অলৌকিক দৃশ্য অবলোকন করেন এবং বহু প্রলোভন জয় করেন। পরিশেষে তিনি প্রচার করেন তাঁহার ধর্মমত। কিন্তু বহু বৎসর পর্যন্ত তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ প্রথম দশ-বৎসরে মাত্র একটি লোক তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করে।

প্রথম রাজকীয় শিষ্য গাশ্‌তাছপ। জরদাশ্‌ত তারপর পূর্ব পারস্য ভ্রমণে যাইবার প্রেরণা লাভ করেন এবং খোরাসান প্রদেশের কিশমারে তিনি ভিষতাপের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ইনিই ফেরদৌছির মহাকাব্যের গশ্‌তাছপ। এই রাজ দরবারে প্রথম উজিরের দুই পুত্র এবং পরে রাণী তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'পয়গম্বর' ও তত্রত্য জ্ঞানীদের মধ্যে এক বিতর্কের অনুষ্ঠান হয়। জ্ঞানীরা তাঁকে যাদুর সাহায্যে পরাভূত করিতে চেষ্টা করেন। জরদাশ্‌ত বিতর্কে জয়ী হন এবং রাজা তাঁহার ধর্মের একান্ত বিশ্বস্ত অনুসারী হইয়া পড়েন।

ফারবারদিন ইয়াসি বলেন—তিনি (গশ্‌তাছপ) জরদশতের ধর্ম, আহুরার গোঁড়া সমর্থক হইলেন এবং যে শৃঙ্খলে ধর্ম আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা তিনি ছিন্ন করিলেন।

গশ্‌তাছপ ও তাঁহার সভাসদগণের ধর্মান্তর গ্রহণের পরই মধ্য এশিয়ার তুরানীরগণের আক্রমণ সংঘটিত হয়। ইহা নূতন ধর্মাবলম্বীদের আতিশয্যের ফলেই সম্ভবতঃ ঘটিয়া থাকিবে। এই ধর্মযুদ্ধ (?) খোরসানেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পৌরানিক কাহিনী অনুসারে ইহার শেষ যুদ্ধ সংঘটিত হয় সবজাওয়ার শহরের পশ্চিমাঞ্চলে। বৃদ্ধকালে জরদশতর যখন খ্যাতি ও সম্মানের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত, তখন তুরানীদের দ্বিতীয় আক্রমণকালে তিনি বল্‌খে নিহত হন। অবশ্য প্রচলিত মত এই যে তিনি উপাসনাগারে তাঁর শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

জরদাশ্‌তের সংস্কার

জরদাশ্‌তকে ঐতিহাসিকগণ সাধারণতঃ ঈরাণের Prophet বা পয়গাম্‌বার বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কোরআনে ইঁহার নাম উল্লিখিত হয় নাই বলিয়া, কেহ কেহ আবার এই মতবাদ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর বিষয়গুলি সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করার যে বিশেষ দরকার আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু "যেহেতু কোরআনে নাই, অতএব তাঁহাকে নবী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারেনা"—ইহাও ভুল ধারণা, কোরআনী শিক্ষার বিপরীত ধারণা। "আর দেখ, তোমার পূর্বে হে মোহাম্মদ! রছুলগণকে প্রেরণ করিয়াছি, কিন্তু তাহার মধ্যকার কতক রছুলের বর্ণনা তোমার কাছে করিয়াছি, আর কতক রছুলের বর্ণনা তোমার কাছে করি নাই···(কোরআন, মোমেন ৭৮ আয়ত)। রছুলগণের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণের পরিচয় কোরআনের বিভিন্ন ছুরায় বর্ণিত হইয়াছে। যেমন তিনি নিজে আস্তিক হইবেন, এবং শুন্যবাদী বা মোশরেক হইবেন না। তিনি নিজেও নরপূজক হইবেন না এবং স্বষ্টির কোনও কিছুকে (এবং নিজেকে) ঈশ্বরের অংশ, অবতার বা তাঁহার কোনো গুণের অধিকারী বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, ইত্যাদি। এই হিসাবে, বুদ্ধদেব বা শ্রীকৃষ্ণকে, হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় সাহিত্য অনুসারে, আমরা আল্লার রাছুল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা।

জরদাশ্‌তের শিক্ষা

আহুরা-মাজদা বা জ্ঞানময় আল্লাহ হইতেছেন জমিন-আছমান, চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের একমাত্র স্বষ্টিকর্তা ও একমাত্র মালেক। মানুষ কোনো দেব-দেবীর এবাদত করিবেনা। সোমরস পান বা অন্য কোনো মাদক দ্রব্যের ব্যবহার করা হারাম। আখেরাত বা পরকাল ও কর্ম্মফলকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। পাঠক, বাদশাহ গশ্‌তাছপের পুত্র সম্রাট দারিয়ুছের শিলালিপির আংশিক মর্ম ইতিপূর্বে অবগত হইয়াছেন। ঐ শিলালিপির অবশিষ্ট অংশেও তিনি প্রত্যেকটী বিজিত দেশের নাম উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন "আহুরা মাজদা উহা আমাকে দান করিয়াছেন।"···"আহুরা মাজদা যখন দেখিলেন যে, জমিনের কাজ বিপর্য্যস্ত হইয়া চলিয়াছে, তখন তিনি তাহার ভার আমার হস্তে অর্পণ করিলেন।" অর্থাৎ, তখনকার যুগে যতটা সম্ভব হইয়াছিল, তিনি আল্লার এই আমানতের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সফলও হইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু সেই সময় কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের চিরন্তন পোষক ও সমর্থক পণ্ডিত পুরোহিতের দল, বাপ-দাদার ধর্মের দোহাই দিয়া, অজ্ঞ জনসাধারণকে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। দেশে সরকারের ও নূতন ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যাপক

বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, খোরাছান অঞ্চলের শেষ যুদ্ধে জরদাশ্‌তকে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত কোরবান করিতে হইল, এবং এই সুযোগে তুরানীরা আবার ঈরাণের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়া দিল।

নবদীক্ষিত মুছলমানেরা ইহাকে ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলেন, সুতরাং তাঁহারা এই জেহাদকে সমাপ্ত করিয়া ছাড়িলেন। ইহার ফলে, নিজেদের পৈতৃক ধর্ম্ম ও প্রাণকে সঙ্গে নিয়া, বিদ্রোহী সমাজগুলি পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে চলিয়া যাইতে থাকেন।

আমি জরদাশ্‌তের প্রদত্ত শিক্ষা ও সংস্কারের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি। যাঁহারা তাঁহার সাধনা ও সংগ্রাম সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানিতে চাহেন, তাহাদিগকে স্যার পার্সী সইকের History of Persia প্রথম খণ্ড, Ency. Britanica Art. Zoroaster, বিশ্বকোষ ১১—২৮৭ পৃষ্ঠা, দাছাতীরে আছমানী, এমাম এবন্‌ হাজম ও শাহ্‌রাস্তানী কৃত মেলাল্ ونحل ملل নামক ধর্ম্মীয় ইতিহাস পাঠ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। শাহ্‌রাস্তানীর পুস্তকে বিষয়টা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (২—৮০)

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর

মোছলেম ও মোশরেকদিগের মধ্যেই জরদাশ্‌তের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম নিয়া এই সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল এবং ইহার ফলে চরম যুদ্ধ ঘটিয়াছিল খোরাছানে—ইহাও আমরা দেখিয়াছি। এই যুদ্ধে যাঁহারা পরাজিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই সুযোগ সুবিধা মত, এবং বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া, খোরাছানের তথা ঈরাণের বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকেন। ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায় যে, তৎকালীন ঈরাণ সম্রাট, খুব সম্ভব রাজনৈতিক কারণে বাধ্য হইয়া, খোরাছানেই নিজের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কারণ, এই অঞ্চলটী ছিল "প্যাগান" নেতাদিগের প্রধান শক্তি কেন্দ্র। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খোরাছানের সহিত সংলগ্ন ঈরাণ সাম্রাজ্যের সীমান্তের বাহিরের জনপদগুলি ছিল দেশত্যাগীদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল আশ্রয়।

এখন আমি ঈরাণের, বিশেষতঃ খোরাছানের মানচিত্রের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ঈরানের পশ্চিম-দক্ষিণ অঞ্চল দিয়া সুবিখ্যাত জায়হুন (Oxon) নদী প্রবাহিত। এই নদীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত হইতেছে খোরাছান প্রদেশ। জায়হুন নদীর পূর্ব্বপ্রান্তভাগের নাম আমু দরিয়া। এই দরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া সোজা চলিয়া গিয়াছে বাদখ্‌শান পর্য্যন্ত। তাহার পরেই পামীরের এলাকা।

এই নদীর উপকূলভূমির নাম হইতেছে খোরাছান। খোরাছানের পরই আরম্ভ হইতেছে তা-খারোস্তান নামক সুদীর্ঘ জনপদ। এই তানারোস্তানের সহিত "ভারতীয়" খারেস্তি (বা খারেস্তী) ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ব্রিটানিয়া বিশ্বকোষের লেখক বলিতেছেন—

Kharosti and Brahmi, two alphabets of India. Kharosti was a local alphabet of Aramaic Origin, introduced after the conquest of Darius.

The Brahmi alphabet developed characteristic forms in India where writing can be proved to have been in use since 600 B. C.

তরজমা—

খরোষ্ঠি এবং ব্রাহ্মী ভারতের দুই বর্ণমালা। খরোষ্ঠী আরামায়িক হইতে উদ্ভূত স্থানীয় বর্ণমালা। উহা দারিয়ুছের অভিযানের পর প্রবর্ত্তিত হয়।

ব্রাহ্মী লিপি ভারতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতির বিকাশ ঘটায়। যেখানে, খৃঃ পূঃ ছয়শো সন হইতে সেখানে লেখার চর্চা প্রচলিত ছিল তাহা প্রমাণ করা চলে।

অধ্যাপক নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত, এম-এ, পি, এইচ, ডি তাঁহার Aryanisation of India পুস্তকে বলিতেছেন :

"Further, we know that the Kharosti script had been a product of Darius' conquest of the Indus valley at the end of the sixth century B. C. If by that time the Brahmi script had not been fully developed in India the Kharosti script must have spread widely over the country instead of remaining confined to the Persian province only. All these prove that writing must have been adopted for the expression of the Sanskrit language in the 8th century B. C. at the latest.',

তরজমা—

'আমরা আরও অবগত হই যে, খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে দারিয়ুছের সিন্ধু উপত্যকা বিজয়ের ফলে খরোষ্টি লিপির উদ্ভব হয়। তৎকালে যদি ব্রাহ্মলিপি ভারতে সুপ্রচলিত হইয়া না পড়িত, তবে খরোষ্টিলিপি শুধু মাত্র পারস্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বহুস্থানে প্রসারিত হইয়া পড়িত। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লেখার মাধ্যমে সংস্কৃতভাষা প্রকাশিত হয় অন্যূন খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে।'

বিখ্যাত আরব ভৌগোলিক য়াকুৎ হামাভী (মৃত্যু ৬২৬ হিজরী) মো'জামুল বোলদান পুস্তকে তাখারেস্তান সম্বন্ধে বলিতেছেন :

هى ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلاد وهى من
نواى خراسان، وهى طخارستان العليا و السفلى - فالعليا
شرق بلخ وغربى نهر جيحون و بينها و بين بلخ ثمانية و
عشرون فرسخا - واما السفلى فهى ايضا غربى جيحون الا
بعد من بلخ الخ

"তাখারেস্তান উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি এই দুই ভাগেই বিভক্ত একটা বিশাল ও বৃহৎ দেশ। উভয় অংশ জায়হুন নদীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত। এই জনপদটী খোরাছানের পার্শ্বে অবস্থিত। উচ্চ ভাগটী হইতে বলখ ২৮ মাইল। কিন্তু নিম্নভাগ বহুদূরে অবস্থিত। এই প্রদেশে বহু আলেমের অভ্যুদয় হইয়াছে। (৬—৩১)।

দেশত্যাগীরা ঈরাণ হইতে বাহির হওয়ার পর কে কোন্ কোন্ পথে কোন্ কোন্ অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছেন, কোথায় তাঁহারা স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার সম্যক বেওয়ারা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অবশ্য তাঁহাদের একদল যে ইণ্ডিয়া (হিন্দিয়া) বা হিন্দুস্থানের দিকে চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায়। পক্ষান্তরে তাঁহাদের বহু লোক যে অন্যান্য স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, মনুর ব্যবস্থা হইতে তাহাও জানা যাইতেছে। মনু ব্যবস্থা দিতেছেন যে, আর্য্যরা আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত কোন জনপদে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাদের আর্য্যত্ব নষ্ট হইয়া যায় না। অন্যত্র অবস্থিত স্বদলীয় হিন্দুদিগকে হিন্দুস্থানে আনিয়া ফেলার জন্যই যে এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বে খোরাছানের সংলগ্ন "খারোস্তানের" উল্লেখ করা হইয়াছে। আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান ও পাকিস্তান প্রভৃতি শব্দের ন্যায় ইহার নামও খারিস্তান হওয়া উচিত ছিল। খুব সম্ভব সাধারণ কথাবার্ত্তায় এইরূপই উহার উচ্চারণ করা হয়। অথচ আমরা দেখিতেছি, কএকজন বিশেষজ্ঞ লেখক উহার বানান করিতেছেন Kharosti ও Kharastan বলিয়া। আমি যতটুকু বুঝি তাহাদের এই ব্যতিক্রম করার সুসঙ্গত কারণ আছে।

এখানে খারোস্তি শব্দের ব্যুৎপত্তিটাই হইতেছে প্রথম বিবেচ্য। ফার্সী ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় খার خر শব্দের অর্থ গাধা, উষ্ট্র বা উশ্‌তর অর্থে উট। খার্ + উষ্ট্র-উশতর + স্তান = খারোস্তান।

(পার্সী ভাষায় ট—বর্গের প্রচলন নাই।)

যেহেতু "খার্" শব্দের পরেই উষ্ট্রের "উ" বর্ণ আছে, সেজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এখানে খারিস্তান না লিখিয়া খারোস্তান লিখিয়াছেন। যেমন, আমরা হিন্দীস্তান না লিখিয়া হিন্দুস্তান লিখিয়া থাকি। এই দেশে মানুষের জীবন যাপনের অনেক পর্য্যায়ে, এই পশু দুইটির দরকার হইয়া থাকে, কাজেই উহার সমাদরও সেখানে ছিল, এবং ইহার ফলে উহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াও খুব স্বাভাবিক। খারোস্তান বা খারিস্তান নামের উৎপত্তি এই কারণে ঘটিয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। খারোস্তি ভাষা সম্বন্ধে পূর্ব্বে দুইজন বিশেষজ্ঞ লেখকের অভিমত উদ্ধৃত হইয়াছে।

উটের নামে দেশের নামকরণের প্রথা অন্যত্রও যে প্রচলিত ছিল, মহাভারত হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন উষ্ট্রকর্ণ, উষ্ট্রকর্ণিক, প্রভৃতি। উষ্ট্রকর্ণ হইতেছে—সিন্ধু নদের উত্তরস্থিত "ম্লেচ্ছ দেশ" বিশেষ, আর উষ্ট্রকর্ণিক হইতেছে—"দক্ষিণদিকস্থ যবন দেশ বা তদ্দেশীয় লোক।" আমাদের খা'র-উশতর স্থানও

হইতেছে সেই দেশবিশেষ, যাহা খোরাছানের পরেই অবস্থিত, এবং দারিউছ রাজার সমকালে যেখানে খারেস্তী ও ব্রাহ্মী ভাষার উৎপত্তি ও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। আর্য্যরা যে এক সময় (বা প্রথম সময়) খারোস্তানে বসবাস করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ মনু সংহিতায় পাওয়া যায়:—

উষ্ট্রযানং সমারুহ্য খরযানন্তু কামতঃ
স্নাত্বা তু বিপ্রো দিগ্বাসাঃ প্রাণায়ামেন শুদ্ধতি।

(মনুসংহিতা, ১১—২০২)।

অর্থাৎ—'উষ্ট্র এবং গর্দ্দভযানে গমন ও নগ্ন হইয়া স্নান করিলে বিপ্র তজ্জনিত পাপক্ষয়ার্থ প্রাণায়ামে শুদ্ধ হইবে।" (স্মার্ত্ত ভরতচন্দ্র শিরোমনির অনুবাদ)। বিশ্বকোষের অনুবাদে আছে:—"ব্রাহ্মণ যদি ইচ্ছা করিয়া উষ্ট্রযান অথবা গর্দভযান আরোহন করেন, তাহা হইলে তিনি বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।" বিশ্বকোষের লেখক বলিতেছেন, উষ্ট্রযানে "আরোহন" করিলে এই বিধি পালন করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। কিন্তু ঐ অধ্যায়ের ২০৪ শ্লোকে মনু আরোহনের ব্যবস্থা দিতেছেন। আবার ঐ পুস্তকের অনুবাদে বলা হইতেছে—উষ্ট্রযানে আরোহন করিলে বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিয়া প্রাণায়ামের দ্বারা শুদ্ধ হইতে হইবে। কিন্তু শিরোমনি মহাশয়ের অনুবাদে বলা হইতেছে—কেহ উষ্ট্র অথবা গর্দ্দভযানে "গমন" করিলে ও নগ্ন হইয়া স্নান করিলে, তাহাকে প্রাণায়ামের দ্বারা শুদ্ধ হইতে হইবে। অর্থাৎ নগ্ন হইয়া স্নান করাও অন্যায়। দুইয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। অন্যদিকে শিরোমণি মহাশয়ের অনুবাদে শ্লোকের "কামতঃ"—শব্দের কোনো অনুবাদ নাই। অথচ এইটাই হইতেছে অশুদ্ধি ঘটার একমাত্র শর্ত। তবে "গমন" করার অর্থ যদি অন্যত্র চলিয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে সংশয়ের আর কোনো কারণ থাকেনা। আমার মনে হয়, এখানে কামতঃ শব্দের দ্বারা অনর্থক বিলাস ভ্রমণকেও বুঝাইতে পারে। এত কথা বলার কারণ এই যে, আলোচ্য শ্লোকের অনুবাদ হইতে মনে হইতে পারে যে, আর্য্য হিন্দুরা উষ্ট্রকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। সুতরাং উষ্ট্রপ্রধান দেশে তাঁহাদের গমন বা অবস্থানের অনুমান ভিত্তিহীন। প্রকৃত অবস্থা এই যে, বৈদিক যুগ হইতেই আর্য্যরা উষ্ট্রের প্রতি সমাদর দেখাইয়া আসিতেছেন। ঋগ্বেদে ইহার প্রমাণ আছে। মনুর ব্যবস্থা অনুসারে, যজ্ঞের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ব্যাপারে উষ্ট্র মাংস ভক্ষণ করা বৈধ (৫—৪১৮)।

মোটের উপর কথা এই যে, ঈরাণের অধিবাসিদিগের মধ্যে মতভেদ, আত্মকলহ এবং পরিণামে ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল ধর্ম নিয়া। অবশেষে দুই দলের চূড়ান্ত যুদ্ধ ঘটে খোরাছান প্রদেশে। যাঁহারা জরদাশ্‌তের প্রবর্ত্তিত নূতন ধর্ম্মমতের সমর্থন করিলেন, তাঁহারা পূর্ববৎ ঈরাণে থাকিয়া গেলেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা পৌত্তলিকতা, জড়পূজা, নরপূজা প্রভৃতি মোশরেকী সংস্কারের সমর্থন করিতেন,

তাঁহারা পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া ঈরাণ হইতে দেশ দেশান্তরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

বলা বাহুল্য, তাঁহারা একই সময় সকলে দলবদ্ধভাবে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং যাত্রার পূর্বে গম্যস্থান নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তখনকার অবস্থা গতিকে সেরূপ অনুমান করা সঙ্গত হইতে পারে না। তাঁহাদের কোন্ দল কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, কোথায় গিয়া প্রথম বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সম্পুর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। আমাদের হিন্দু ভ্রাতাদের কাছে উচ্চদরের দর্শন আছে, জ্যোতিষ আছে, ব্যবহারশাস্ত্র আছে, কাব্য আছে, আয়ুর্বেদ আছে, অর্থাৎ সব আছে, নাই কেবল ইতিহাস। কাজেই এক্ষেত্রে অনুমানের উপর নির্ভর করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অবশ্য, সে অনুমান যতদূর সঙ্গত হয়, প্রত্যেক লেখককে তাহার চেষ্টা যথাসাধ্য করিতে হইবে।

এই হিসাবে আমাদের মত এই যে, দেশত্যাগীদের খোরাছানের সহিত সংলগ্ন একটা বড়দল সর্বপ্রথমে খারোস্তানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অন্য সকলে যে যার সুবিধামতে, বাদখশান, বলখ, বেলুচিস্তান, কাফিরিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। ইহার কতক সময় পরে, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ইন্‌ডিয়া, হিন্‌দিয়া, বা হিন্দুস্তানে যাওয়ার চেষ্টা করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের একদল (হয়ত বড়দল) ক্রমে ক্রমে সেখানে গিয়া উপা ; হন তা' সে স্থানটা কাশ্মিরই হউক আর এলাহাবাদই হউক। ইহাদের আর' এক (বা কএক) দল লোক কিছুকাল (খুব সম্ভব দীর্ঘকাল) ভারতের বাহিরে কোনো না কোনো প্রদেশে থাকিয়া যান। তাই মনু মহারাজকে ব্যবস্থা দিতে হইয়াছিল—"যে সব আর্য্য সন্তান আর্যাবর্তের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও আর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

আমাদের দেশের হিন্দু ঐতিহাসিকেরা দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, **ভারতের কোনও পুরাকালীন তথ্যের আলোচনা করিতে হইলে,** সর্বপ্রথমে আমাদিগকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে তাঁহাদের বেদ নামে পরিচিত চারিখানি ধর্ম পুস্তকের—বিশেষতঃ ঋগ্বেদের। কারণ উহা অপৌরেষেয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বর কর্তৃক বর্ণিত। এই বেদগুলির মধ্যে ঋগ্বেদ হইতেছে দুন্‌য়া জাহানের সর্বপ্রথম বা আদিগ্রন্থ। ইহার কোনও পরিবর্ত্তা বা বিকার আজ পর্যন্ত সংঘটিত হয় নাই। বেদ মন্ত্রগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া আর্য্য মুনিঋষিগণের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে, এবং শিক্ষার্থী গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া, তাঁহার বর্ণিত ঐ মন্ত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়াছে। সুতরাং উহাতে কোনও প্রকার ভ্রমপ্রমাদ বা বিকার বিপর্য্যয় সংঘটিত হইতে পারে নাই।

আমার মতে এই দাবীগুলি আদৌ সমীচীন নহে। আমি বলি, বেদ মন্ত্রগুলি মানুষের রচনা। বেদে যাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই ছিলেন মানুষ এবং আমাদেরই মত ষড়রিপুর প্রভাবাধীন মানুষ। দুন্‌য়ার সকল জনপদের আদিম মানুষের সমস্ত দোষ গুণের অস্তিত্বের প্রমাণ তাঁহাদের পুরাকাহিনীতেও পাওয়া যায়। ইরাণ হইতে অপসারিত হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত পারসিকরা ও তাঁহারা একই সাধারণ ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, এ প্রমাণও ইতিহাসে পাওয়া যায়।

ইরাণ হইতে অপসারিত হইয়া এই "আর্য্য"রা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। এই সময় তাঁহাদের যে দলের যেরূপ সুবিধা ঘটল—তা নগরে হউক বা অরণ্যে হউক, নদী সৈকতে হউক আর মরুপ্রান্তরে হউক—অস্থায়ী আবাস স্থাপন করিয়া ভবিষ্যতের কিংকর্তব্য স্থির করিতে থাকেন। হাজার হাজার বৎসর এইভাবে কাটিয়া যায়। এই সময় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন এই দেশত্যাগীদের মধ্যকার কেহ কেহ—প্রকৃতি পূজার মোহে হউক, ইষ্টলাভের ও অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে হউক, একটা কাল্পনিক শক্তির স্তুতি স্তোত্র বা পূজা আরাধনার জন্য বিভিন্ন শ্লোক বা মন্ত্র রচনা করিতে থাকেন। পরবর্তী যুগে, সম্ভবতঃ ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, ঐ শ্লোকগুলিকে একত্র করার সুযোগ তাঁহাদের ঘটে। যথাসম্ভব এই সুযোগের সদ্ব্যবহারও তাঁহারা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই অমিশ্র সংযোগের ফলে, একদিকে বেদের ঐতিহাসিক দিকটার উদ্ধার সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অন্যদিকে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি পরস্পর অসংলগ্ন হইয়াছে, এবং ঘোর জড়বাদ, প্রেত পূজা, বহু ঈশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতার অভিশাপের মধ্যে বেদের অমিশ্র তাওহীদবাদ (অদ্বৈতবাদ নহে) বা একেশ্বরবাদের শিক্ষা এখন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শুধু এইটুকুই নহে, বেদের প্রতি হিন্দু পণ্ডিতগণের বাস্তব উপেক্ষার ফলে, তাঁহাদের বেদ-বিমুখতা ও

পুরান-সর্ব্বস্বতার প্রতিক্রিয়ায় ও এক শ্রেণীর পুরান-পুস্তকের বেদের নিন্দা প্রচারের অভিশাপে বেদগুলির বিশেষতঃ ঋগ্বেদের বর্ণনাগুলি এমন অসংলগ্ন ও পরস্পর অসমঞ্জস হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ কোনো জ্ঞান ও সুশিক্ষা লাভ করা এখন অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুনিতে পাই, মহামুনি বেদব্যাস বেদগুলির মর্ম্মানুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, সামবেদ ও যজুর্বেদের বহু সংখ্যক মন্ত্র ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

এই পরিস্থিতির ফলে বেদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কিরূপ বিপন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহার সম্যক পরিচয় দেওয়ার জন্য, ঋগ্বেদের ভাষ্যকার পণ্ডিত মহেন্দ্র চন্দ্ররায় তত্বনিধি বিস্তা-বিনোদ মহাশয়ের ঋগ্বেদ ভাষ্য হইতে একটি মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"এতাদৃশ মূল্যবান্ বেদের আজ কেন এত অল্প প্রচার। একটু প্রণিধান করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের অবসানে ভারত মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। মহাযুদ্ধের সহিত আর্য্যগৌরবরবি যে চিরতরে অস্তাচলে গমন করিয়াছিল সে বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভূভাগের মহাবিক্রমশালী ক্ষত্রিয় বীরগণ ঐ কালসমরে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলে, তাঁহাদের বংশধরগণ নির্ব্বাণোন্মুখ চিতানলের ন্যায় আর্য্যাবর্ত্তের এখানে সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত করিয়া বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত সামান্য আলোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় রাজন্যবৃন্দের বংশধর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনে করদ ও মিত্ররূপে নিষ্প্রভ ভাবে রাজত্ব করিতেছেন। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, প্রবল পরাক্রান্ত মগধের নাগবংশীয় মহানন্দী সুত, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক হইতেই আর্য্য রাজত্ব বিলোপ হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম ভারত হইতেই অন্তহিত হইয়াছে। পুরাণে—"মহানন্দী সুত শূদ্রাগর্ভোদ্ভব মহাপদ্মানন্দ দ্বিতীয় পরশুরাম ইব নিখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা" এবং নব্যস্মৃতিতেও "ইদানীন্তন-ক্ষত্রিয়াদীনামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ" ইত্যাদি বিকৃতশাস্ত্রবচন ব্যাখ্যামূলে ভারত একেবারে ক্ষত্রিয়প্রভাবহীন হইয়া পড়িয়াছে। মহাপরাক্রমশালী বীরশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম একবিংশতিবার শাণিতাস্ত্রপ্রয়োগে যাহা করিতে পারেন নাই, তাহাই মৌর্য সম্রাট-দিগের আচরিত বৌদ্ধ ধর্মের সহিত বৈদিক ধর্মের প্রবল সংঘর্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লব, বারম্বার ধর্মের উত্থান-পতনে, শাস্ত্রকর্ত্তা ব্রাহ্মণশীলদলের সহিত শাসনকর্ত্তা রাজন্য-বৃন্দের অসদ্ভাবে, মতদ্বৈধে, বিদ্বেষে ও তান্ত্রিক ধর্মের আবির্ভাবে সাধিত হইয়াছে। ভারতের আর্য্যরাজত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের বিলোপের সহিত বেদোক্ত ধর্মের ভয়াবহ দুর্গতি ও বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল।

পরবর্ত্তীকালে বঙ্গে তান্ত্রিক ধর্ম প্রচারের পৃষ্ঠপোষক মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেনের নিয়োজিত ব্রাহ্মণগণের আগমোক্ত শাস্ত্রবাণী—"কলিতে বৈদিক মন্ত্রশক্তি লোপ পাইয়াছে," "বেদমন্ত্র কার্য্যকরী নহে," "যাগযজ্ঞ নিষ্ফল" ইত্যাদি প্রবচনে বেদের

আলোচনা একেবারে রহিত হইয়া গেল। স্বধর্মনিরত নিষ্ঠাবান্ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মের আবরণে, প্রাণপণে যে সকল গ্রন্থাদি অতি সংগোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাও গ্রীক্, রোমান্, পারসিক, তুরান্, আফগান প্রভৃতি বৈদেশিকগণের বারম্বার আক্রমণে বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন যাহা কিছু আছে তাহাও ক্রম-পরিবর্ত্তন দ্বারা নিরন্তর বদ্ধিতায়তনরূপে প্রকাশমান। ক্ষাত্রধর্মের বিকাশের অভাবেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবস্থান্তর ঘটিয়া আর্য্যজাতির চিরারাধ্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অমূল্য রত্নভাণ্ডার বেদমাতার স্বরূপ ভারতবাসীর অন্তর হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। বেদে যে সকল সত্য নিহিত আছে তাহা এতদিন জানিবার বিশেষ উপায় ছিল না। বেদের হস্তলিপি অতি দুর্লভ, যদি বিদেশীয়গণের অনুকম্পায় ও বহু অর্থ ব্যয়ে বিদেশ হইতে মুদ্রিত হইয়া বেদ ভারতে দর্শন না দিতেন তবে যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইত।"

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এই স্বীকারোক্তির পর, বেদের ঐতিহাসিক স্বরূপ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করার দরকার থাকিতেছে না। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, বর্তমানে বেদ নামে যে কয়খানা পুস্তক হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সঙ্কলিত হইয়াছিল কলিযুগের ম্লেচ্ছাবতার "পণ্ডিতাচার্য" মোক্ষমুলারের দ্বারা এবং সদাশয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিপুল অর্থ সাহায্য ও অস্বাভাবিক সহানুভূতির ফলে। অস্বাভাবিক বলিতেছি, কারণ সে সময় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ও ইংরাজ বণিক ও ধনিকদের একান্ত আগ্রহ ছিল ভারতবাসী হিন্দু মুছলমান প্রভৃতি জনসাধারণকে তাহাঁদের নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আস্থাহীন করিয়া তোলা এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া লওয়া। এজন্য তাঁহারা দুই শত বৎসর ধরিয়া বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সেই হীন মানসিকতার পরিবেশে বেষ্টিত থাকিয়া, তাঁহারা যে হিন্দু প্রজার প্রেমে অথবা শুধু জ্ঞানচর্চার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বেদ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমি তাহা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। বৃটিশ শাসনের ও মিশনারী সঙ্ঘগুলির কার্যকলাপের ইতিহাসও তাঁহাদের প্রতি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এই ভক্তিপ্রবণতার সমর্থন করিতেছে না।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এই উক্তি সম্বন্ধে আমার কএকটা জিজ্ঞাস্য আছে। তিনি বলিতেছেন—"বেদে যে সকল সত্য নিহিত আছে, তাহা মোসলমান রাজত্ব পর্যন্ত জানিবার সবিশেষ উপায় ছিলনা।" না থাকার কারণ কি, লেখক তাহা প্রকাশ করেন নাই। মুছলমান শাসকেরা কি হিন্দু পণ্ডিতগণকে ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন? ইতিহাস কিন্তু অনাবিল ভাষায় সাক্ষ্য দিতেছে যে, মুছলমান শাসনকর্তারা, তাঁহাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রথম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মোগল রাজত্ব এবং বাংলার মুছলমান ছুলতানদের আমলদারী পর্যন্ত, জ্ঞানের আদান প্রদানে কখনই সঙ্কীর্ণতা বা ছুঁৎমার্গের প্রশ্রয় দেন নাই। আয়ুর্ব্বেদ ও হিন্দু জ্যোতিষের

ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। দিল্লীর মোছলেম শাসনকর্তাদের উৎসাহে এবং তখনকার শিক্ষিত মুছলমান সমাজের অনুপম মনীষা ও একনিষ্ঠ সাধনার ফলে হিন্দু ধর্মের কত পুথি পুস্তক ফার্সীতে ও হিন্দীতে অনুবাদিত হইয়াছে, তাহাও কি হিন্দু ভ্রাতাদিগকে নূতন করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে? আল্-বেরুণীর জগৎ-বিখ্যাত কেতাবুল-হিন্দের কথাও কি তাঁহারা অবগত নহেন! ইহা ব্যতীত ১৭৫৭ সালে মোছলেম রাজত্বের অবসান ঘটিয়া যাওয়ার পরও তাঁহারা মোক্ষমুলারের আশ্রয়ের অপেক্ষায় চুপ করিয়া না থাকিয়া বেদাদি-ধর্মশাস্ত্রগুলি নিজেরাই প্রকাশ করিলেন না কেন?

হিন্দু সমাজের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, তাঁহাদের প্রধান ধর্মশাস্ত্রগুলি প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতি বিভাগের প্রধান হইতেছে বেদ। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, বেদের পরই উপনিষদের স্থান। রাজা রামমোহনের মতে উপনিষদের স্থান হইতেছে বেদের উপর (Lecture)। পক্ষান্তরে কিছু সংখ্যক পণ্ডিত পুরাণকে বেদ হইতে অধিক মর্য্যাদা দিতে চাহিয়াছেন।

"The majority of the Hindu people believes that the Vedas too attest the truth of the Puranas, which shows that the Puranas are more authentic and more ancient. In the Atharva we find : "Verses and songs and magic hymns, Purana, sacrificial text—All the celestial Gods Whose home is heaven sprans from the residue." Again we find : "He went away to the grat region. Itihasa and Purana and Gathas and Narasansis followed him." Similarly, in the Rig Veda a mention is made of Puranas : "So by this knowledge (of) Puran Yajua our fathers raised up to Rishis." A reference to Purans is also met with in Chhandogya Upanishad." Vidyarthi. Paye 56.

মর্ম্মার্থ: অধিকাংশ হিন্দুই বিশ্বাস করেন, পুরাণের সত্যতাকে বেদও সপ্রমাণ করিতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, পুরাণ—বেদ হইতে অধিকতর প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য। অথর্ববেদ ও ঋগ্বেদে পুরাণের উল্লেখ রহিয়াছে। ছন্দোগ উপনিষদেও পুরাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিন্তা বিভ্রাট

এই প্রসঙ্গে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে, স্বয়ং হিন্দু পণ্ডিতদিগের মধ্যে আজ আমরা যে চিন্তা বিভ্রাট ও পরস্পর মতবিরোধ দেখিতে পাইতেছি, তাহা তাঁহাদের দীর্ঘদিনের ইতিহাসেরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। এই ইতিহাসের কএকটা বিশেষ শিক্ষা নিম্নে অতি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

(১) সংস্কৃত ভাষায় যখন যে কোন বিষয় কথিত বা লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তকেই তাঁহারা পাইকারী হিসাবে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেগুলিকে সাধারণ-

ভাবে সমান মর্য্যাদা দিয়াছেন। অথচ এই বিষয়গুলি রচিত হইয়াছে বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন মতবাদের লোকদিগের দ্বারা, বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতির, পরিবেশের সাময়িক তাকিদে। সুতরাং ঐ "শাস্ত্রগুলির" পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান আজ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(২) তাঁহাদের ধর্ম্মের মৌলিক শিক্ষা কি, তাহা তাঁহারা কোনও কালেই নিশ্চিত-ভাবে অবধারিত করিতে পারেন নাই। সুতরাং অবশ্যমান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাগুলিকে, অপশাস্ত্র ও উপশাস্ত্রগুলির মধ্য হইতে ছাটাই বাছাই করিয়া নেওয়ার উপযোগী কোনো নির্ভুল নৈতিক মান আজ তাঁহারা দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিতেছেন না। ফলতঃ অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, হিন্দুধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের ঐতিহাসিক বিবরণ ও নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে, প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে।

(৩) তাঁহারা বেদকে অপৌরুষেয় ঈশ্বরবাণী (আল্লার কালাম) বলিয়া উচ্চকণ্ঠে দাবী করিতেছেন, এবং ঋগ্বেদকে এসম্বন্ধে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করিতেছেন। অথচ ঋগ্বেদ হইতেই অকাট্যভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উহার শ্লোক বা মন্ত্রগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষের দ্বারা রচিত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি:—

(১) হে হরি! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র রচনা করিতেছি। (১০ম—১৬।২১)।

(২) হে ইন্দ্র! তোমার স্তুতির জন্য গোতম বংশীয় কবিগণ মন্ত্র রচনা করিয়াছেন (১।৯।৬৩)।

(৩) গোতম এই নূতন বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন (১ম।৩৩।৬২)।

(৪) হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের রচিত নূতন উক্থে (মন্ত্রে) সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর (১ম।১০।১৩০)।

(৫) এই স্তুতি বিষয়ক বেদমন্ত্র আমি মান্দার্য্য ঋষির রচিত (১ম।১৫।১৬৬)

(৬) পুরুভুজ ঋষি এই বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন (৮ম।১৭।৮)

(৭) হে ইন্দ্র! বিমদ বংশীয় ঋষিগণ···তোমার উদ্দেশে এই বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন (৭।৯।২২)।

(৮) হে ইন্দ্র! কি পূর্ব্বকালীন প্রাচীন ঋষিগণ কি একালের ঋষিগণ, সেই সকল "বিপ্ররাই" হইতেছেন বেদ মন্ত্রের রচয়িতা (৭ম।২।৭)

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ঋগ্বেদ সংক্রান্ত পুস্তক হইতে উপরোক্ত নজীরগুলি উদ্ধৃত হইল। এখানে একজন বিদুষী হিন্দু মহিলার অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি:—

"The tradition that has gained such a firm hold on the Indian mind, that the Vedas are not human compositions but revelations from God, indicates that the mantras of the Vedas were not collected

in their present form until long after their composition, when their authorship and origin were fairly forgotten. The present traditidn, that the four Vedas were originally revealed to four rishis, and that Vyasa after-wards classified and arranged them in their present form, is very superficial ; it must have been gradually evolved during a long period of little acquaintance with the actual text. But behind it there is this kernel of truth that the mantras of the Vedas, which had been composed by different persons at different places and at different times, were collected and arranged in their present form at a certain time by a certain person or more probably by a group of persons. Who this person was, or when this great work was accomplished, cannot be ascertained ; but the tradition of the classification of the Vedas is substantially correct.

There can be no doubt that the Vedic mantras long remained scattered among the various groups of Aryan settlers in India. They were composed by different persons during different periods, and were preserved by the descendants and disciples of the original composers. The tradition of divine origin in its liberal sense could not have originated except in an age of uncritical and blind veneration—when possibly, there was a falling off in the actual acquaintance with the texts. For apart from all considerations of reason and experience, the hymns themselves bear unquestionable marks of human authorship. In the texts of many of the hymns, the names of the authors are mentioned. For instance, the last verse of the sixty second hymn of the first mandala of the Rig Veda says, "O Indra, Nudha, the son of Gotama, has composed, for us, this new hymn of thine." The last verse of the thirty-ninth hymn of the second mandala concludes with the statement that "Gritsamada has composed this new hymn of praise for the glorification of the Aswinis." The sixth verse of the twenty-third hymn of the tenth mandala of the Rig Veda says, "Oh Indra, the Vimadas have composed this new beautiful hymn in honour of thee." Such references to the authors are innumerable in the Vedic mantras. The rishis of the Vedas used to mention their own names in the texts of the hymns of their composition as was the custom with the later bards and singers of India, even down to the present day. Nor can it be contended that the hymns were made known to the rishis, for often they themselves say that these were new hymns, composed by them with great labour. "We have composed this hymn according to our knowledge and ability." "As an expert wise artisan constructs a chariot, so have I composed this hymn of praise for thee, Agni."

মর্মার্থঃ বেদের মন্ত্রসমূহ মানুষের রচনা নহে বরং ঐশী বাণী—এই প্রথাগত ধারণা ভারতীয়দের মনে এমনভাবে দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়া গিয়াছে যে, উহা হইতেই বুঝা যায়, বেদের মন্ত্রসমূহ উহার বর্তমান আকারে সংগৃহীত হয় নাই। রচিত হওয়ার বহু পরে এমন সময় উহা সংগৃহীত হইয়াছে, যখন তাহার মূল রচনাকারীগণ অনেকাংশে বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন। বর্তমান ধারণা—গোড়ায় চারি বেদ চারিজন ঋষির নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল, পরে ব্যাস উহাকে শ্রেণীবদ্ধভাবে উহার বর্তমান রূপে সন্নিবেশিত করেন। এই ধারণা সঙ্গত নহে। যখন বেদের মূল মন্ত্রগুলির সহিত পাঠকদের সামান্যই পরিচয় ছিল, এমন এক সময়—দীর্ঘকাল ধরিয়া এই মন্ত্রগুলি ধীরে ধীরে তাহার বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে সত্য থাকিয়া যাইতেছে তাহা হইল, বেদের মন্ত্রগুলি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছে, তাহা কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট লোক কিম্বা একদল লোক দ্বারা বর্তমান আকারে সংগৃহীত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বেদের মন্ত্রগুলি বহুদিন যাবৎ ভারতে বসতি-স্থাপনকারী আর্যদের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক এই মন্ত্রগুলি রচনা করিয়াছেন এবং তাহাদের বংশধর ও শিষ্যগণ উহা সংরক্ষণ করিয়াছেন। যখন মন্ত্রগুলির সঙ্গে সঠিক পরিচয় কমিয়া আসিয়াছে—এমনই এক অন্ধভক্তির যুগে উহাকে ঐশীবাণী বলিয়া গ্রহণের প্রবণতার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। এই সব যুক্তি তর্ক ছাড়াও স্বয়ং বেদের মন্ত্রগুলিই মানুষের দ্বারা রচিত হওয়ার প্রমাণ বহন করিতেছে। বহু মন্ত্ররচনাকারী তাঁহার নাম মন্ত্রের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। মন্ত্ররচনাকারী ঋষিগণেরই স্বগতোক্তি হইতেছে, আমরা বহু পরিশ্রমে এবং নিজেদের জ্ঞান ও সাধ্যানুসারে এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছি।"*

আমরা সুবিজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়া আসিয়াছি যে, বেদ পূর্বে ছিল, ব্যাসদেব যেভাবে সঙ্কলন করিয়াছেন, এখনও অবিকল সেইভাবেই সুরক্ষিত হইয়া আছে; তাহাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন ঘটে নাই। কিন্তু আধুনিক যুগে এই মতের পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। একটা উদাহরণ দিতেছি।

হিন্দু সমাজে দীর্ঘকাল হইতে যে মারাত্মক জাতি-বিচারের প্রথা প্রচলিত আছে, আধুনিক যুগে তাহার সমর্থন করা তাঁহাদের একদলের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই তাঁহারা নানা সূত্রে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন যে, বৈদিক যুগে এই কুপ্রথার প্রচলন ছিল না। এমন কি এই মতটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁহারা দরকার মত বেদমন্ত্রের ভুল অর্থ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তটী "পুরুষ সূক্ত" নামে বিখ্যাত। এই সূক্তের শেষ ভাগে অনাবিল ভাষায় প্রচলিত জাতি বিচারের ব্যবস্থা প্রদান করা হইয়াছে।

* Aspirations from a fresh world, by Shakuntala Rao Shastri P P ১—২।

ইহাতে বলা হইতেছে যে, "সেই বিরাট পুরুষের মুখ (বা মুখ হইতে) ব্রাহ্মণ, তাঁহার বাহুদ্বয় (বা বাহুদ্বয় হইতে) ক্ষত্রিয়, তাঁহার উরুদ্বয় (বা উরুদ্বয় হইতে) বৈশ্য"—এই বর্ণনার শেষ অংশে শূদ্রদের সম্বন্ধে বলা হইতেছে, 'পদভ্যাং শূদ্র অজায়ত।" বর্তমানে উহার অর্থ করা হইয়াছে,—"এবং শূদ্রই উহার পদদ্বয়" বলিয়া। আমি সংস্কৃত জানি না, সেই জন্য সংস্কৃতবিদ পণ্ডিত মহাশয়দিগকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই অনুবাদ কি সঙ্গত? আমার বিশ্বাস, উহার অনুবাদ হইবে—"এবং তাঁহার পদদ্বয় হইতে শূদ্রের জন্ম বা উৎপত্তি হইয়াছে। অধিকন্তু, আমার মতে সূক্তের শেষ পংক্তির বর্ণিত এই "অজায়ত", শব্দটী পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সম্বন্ধে সমান ভাবে প্রযোজ্য। অন্য পণ্ডিতরাও এই প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন। এমন কি, বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যও এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ঋগ্বেদের অনুবাদক ও ভাষ্যকার হেমন্তকুমার রায় বিদ্যাবিনোদ এই সূক্তের পদভ্যাং শব্দটীকে 'আর্ষ-প্রয়োগ' (প্রক্ষেপ) বলিয়া আত্মরক্ষা করার চেষ্টা পাইয়াছেন। বেদের স্বনামখ্যাত অনুবাদক ও টীকাকার, রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আলোচ্য সূক্তটী সম্বন্ধে বলিতেছেন—"ঋগ্বেদের অন্য কোনো অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই। জাতি বিভাগ প্রথা ঋগ্বেদের সময় প্রচলিত ছিল না। ঋগ্বেদে এই কুপ্রথার একটী প্রমাণ সৃষ্টি করার জন্য এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।" সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঋগ্বেদে কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই—এই দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

ঋগ্বেদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, হিন্দু-ধর্ম্মের শিক্ষা ও সংস্কারগুলির সহিত এই আলোচনার কোনও সম্বন্ধ নাই। এই হিসাবে, যথাসম্ভব সংক্ষেপে আর দুই একটা উদাহরণ দিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে দেবতাগণের স্তুতিতে দেবগণের সংখ্যা মাত্র তেত্রিশটি দেখা যায়, কিন্তু দশম মণ্ডলে সেই সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া তিন হাজার তিন শত নয় জনে পরিণত হইয়াছে (যথাক্রমে ১।৩৪।১১ ঋক এবং ১০।৫।৬ ঋক দ্রষ্টব্য)।

ঋগ্বেদে এই দেবতাদের পূজা অর্চনারই ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ মনে করা হইয়া থাকে। কিন্তু ন্যায়ের হিসাবে স্বীকার করিতে হইবে যে, উহাতে স্থানে স্থানে খাঁটি তাওহীদের বা একেশ্বরবাদের সন্ধান পাওয়া যায়।

সংস্কৃত সাহিত্যে যেসব মুনি ঋষির নাম পাওয়া যায় তাঁহারা সকলেই ভগবান; সংস্কৃত ভাষায় যেসব পুথিপুস্তক লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই অবশ্যমান্য ধর্ম্মশাস্ত্র, ...আমার মতে এই শ্রেণীর ধারণাগুলি হিন্দু সমাজের প্রধানতম সমস্যায় পরিণত হইয়া আছে। একেশ্বরবাদীদের ধর্ম্মীয় জীবনে তাই চার্বাকের মত একজন জাদরেল বেদবিরোধী পণ্ডিত মুনি নামে ঘোষিত হইতেছেন, আর বৃহস্পতিও দেবগুরুর উচ্চতর আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই দিশাহারা ভাবটা এত বেশী ব্যাপক

হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, একদিকে ঘোষণা করা হইতেছে যে, বৈদিক যুগে জাতি বিচারের আদৌ প্রচলন ছিল না, অন্যদিকে মনুসংহিতাকে তাঁহার শ্রুতির প্রধান পুস্তক ও অবশ্য-মান্য হিন্দু শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা হইতেছে। অথচ এই সংহিতায় জাতি বিচারের চরম ব্যবস্থাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হইয়াছে।

এইরূপে তন্ত্রোক্ত হিন্দু শাস্ত্র ও ভোজবিদ্যা ও শাস্ত্রকথা তন্ত্রকে "বেদের শাখা বিশেষ" বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। অথচ সেই তন্ত্রে স্পষ্ট ভাষায় বেদের নিন্দা করা হইতেছেঃ

নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌত জাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যা দে সফলা আসন বলে তে মৃতকা ইব।
ইত্যাদি। (বিশ্বকোষ)।

"বেদের মন্ত্রগুলি এখন বিষহীন সাপের ন্যায় বীর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছে।" তন্ত্রে আর যাহা আছে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, কারণ এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাহা অবান্তর।

ভোজবিদ্যার মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন, বশীকরণ প্রভৃতি ব্যতীত আরও অনেক উদ্ভট কাণ্ডকারখানার অবতারণা করা হইয়াছে।

প্রচীন সমস্ত সমাজের ইতিহাসে এই শ্রেণীর অস্বাভাবিক ও ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনীর প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর বেলাতেই যে কেবল এইরূপ ঘটিয়াছে, সেরূপ ধরণা করা অন্যায় হইবে। এমন কি হিজরীর চতুর্থ শতকের পর হইতে, মুছলমান সমাজেও এই মারাত্মক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। গত দুই শত বৎসর হইতে দুন্‌য়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মোছলেম মনীষীবর্গ, নিজেদের সমাজকে এই ব্যাধির অভিশাপ হইতে মুক্ত করার জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছেন এবং আজও সে সংগ্রামের নিবৃত্তি ঘটে নাই। তবে তাহা যে বহু পরিমাণে সার্থক হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই সফলতার কতকগুলি অনুপম ও অক্ষয় কারণ আছে, কতকগুলি তুলাদণ্ড ও কষ্টিপাথর আছে। সে আলোচনা এখানে অবান্তর।

এখন আমরা এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিতে চাহিতেছি যাহার একটা উপেক্ষিত নাম—বঙ্গদেশ বা ভঙ্গদেশ।

পঞ্চম অধ্যায়

পাঠকগণ সম্ভবতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, হিন্দুস্তানের বা হিন্দু সমাজের কোনো ঐতিহাসিক বিষয়ের আলোচনা করার সময়, আমি প্রধানতঃ নির্ভর করিয়াছি, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও হিন্দু লেখকগণের বর্ণনার উপর। কিন্তু বিপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাঁহাদের পাশ্চাত্য গুরুমহাশয়দিগকে নিয়া। যে কোন বিষয়ের বিচার আলোচনায় ঐ গুরুমহাশয়-দিগের মতামতগুলিকে প্রমাণ হিসাবে তাঁহারা উল্লেখ করিয়া থাকেন। আর্য্যামীর অভি-মানকে জয়যুক্ত করার জন্য তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন হইয়া থাকেন, ঐ পাশ্চাত্য-(বিশেষতঃ জার্ম্মান) পণ্ডিতরাই।

এক্ষেত্রে পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার বা "মোক্ষমূলার" সাহেবের নাম অগ্রগণ্য। ইহার জন্ম হয় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টম্বর তারিখে, এবং মৃত্যু হয় ১৯০০ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখে। ম্যাক্সমূলার সাধারণ শিক্ষা সম্পন্ন করিয়া ২ জন জার্ম্মান ও একজন ফরাসী পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮৪৬ সালে তিনি ইংলণ্ডে চলিয়া আসেন। এই সময় সায়ন ভাষ্যসহ ঋগ্বেদের অনুবাদ করেন। "সংস্কৃত ভাষায়" ইতিহাস প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এই ম্যাক্সমূলার সাহেবই আর্য্য জাতির উৎপত্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে একজন প্রধান authority বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। তাই তাঁহার মতামত প্রথমে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:— *

আর্য্য

বিভিন্ন ভাষাতত্ত্ববিদ আর্য্য শব্দের নানা পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। ম্যাক্সমূলার ইহাকে ইন্দো-ইউরোপীয় অথবা ইন্দো-জর্ম্মান ভাষাগোষ্ঠিসমূহের সকলের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত সম্বোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। ১৮৮৮ সালে ম্যাক্সমূলার Biographies of words and the Home of the Aryas নামক যে পুস্তক প্রকাশ করেন তাহাতে উল্লেখিত ভাষাসমূহে যে সব লোক কথা বলে তাহাদিগকেও তিনি আর্য্য বলিয়া উল্লেখ করেন। উক্ত পুস্তকের ২৪৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়:—

"রক্ত ও ভাষা যাহাই হউকনা কেন, যে সমস্ত লোক আর্য্য ভাষায় কথা বলিয়া থাকে তাহারাই আর্য্য। উক্ত অধিবাসীদের নির্দ্ধারণের বেলায় তাহাদের ভাষার ব্যাকরণ আর্য্য কি না, তাহাই শুধু বিবেচ্য।" সুতরাং ইহা লক্ষ্যণীয় যে, অন্য কোন মানব

---

* বৃটানিয়া বিশ্বকোষের ১৪শ সংস্করণে বিষয়টাকে আদৌ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। তাহার পূর্ববর্ত্তী সংস্করণে আলোচ্য বিষয়টা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে তাহার অনুবাদ প্রদান করা হইল। —লেখক।

জাতিতত্ত্ব বিষয়ক নিদর্শন পরিহারের ব্যাপারে তিনি সতর্ক ছিলেন। আর্য্য ভাষা বংশ পরম্পরাগতভাবে প্রাপ্ত ভাষা কিনা, তাহা ধর্তব্যের মধ্যে না আনিয়া যাহারা আর্য্য ভাষায় কথা বলে তাহারাই আর্য্য। যেমন উক্ত পুস্তকের আর এক স্থানে (১২০ পৃঃ) তিনি আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলেন, "আমি পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছি যে, আর্য্য বলিয়া অভিহিত করার সময় আমি রক্ত বা অস্থি এবং চুল বা মাথার খুলি, ইহার কোনটাকেই মানদণ্ড হিসাবে খাড়া করি নাই, আমি সোজাসুজিভাবে শুধু ইহাই বুঝি যে, যাহারা আর্য্য ভাষাসমূহে কথা বলে তাহারাই শুধু আর্য্য। হিন্দু, গ্রীক, রোমান, জার্ম্মান, কেল্ট এবং শ্লাভদের বেলায়ও উক্ত একই কথা প্রযোজ্য। উহাদের সম্পর্কে বলার সময় আমি কোনরূপ শরীর ব্যবচ্ছেদ বিষয়ক তত্ত্বের দায়িত্ব লই নাই। নীল চক্ষু ও শ্বেত চুল বিশিষ্ট স্ক্যাণ্ডিনেভীয়রা বিজিত বা বিজেতা হইতে পারে, তাহারা তাহাদের অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণাঙ্গ প্রভুদের অথবা প্রজাদের ভাষা ব্যবহার করিতে পারে, অথবা উহার বিপরীতও হইতে পারে, হিন্দু, গ্রীক, রোমান, জার্ম্মান, কেল্ট এবং শ্লাভ বলিয়া অভিহিত করার সময় আমি তাহাদের ভাষা ছাড়া আর কোন বিষয়কে ধর্তব্যের মধ্যে আনি নাই এবং কেবলমাত্র এই মতেরই বশবর্ত্তী হইয়া আমি বলিতে চাই যে, এমনকি সর্বাধিক শ্বেত আকৃতি বিশিষ্ট স্ক্যাণ্ডিনেভীয় অপেক্ষা সর্ব্বাধিক কৃষ্ণাঙ্গ হিন্দুরাও অপেক্ষাকৃত পূর্ববর্ত্তী আর্য্য ভাষা ও চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে।"

"ভাষাতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনায়" ম্যাক্সমূলারের অবদানের জনপ্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত শব্দটীর ব্যবহার পাঠক সাধারণের নিকট সর্বাধিক পরিচিত। তিনি তাঁহার Lectures on the Science of Language (first series) নামক বক্তৃতামালার শেষ অংশে এবং তাহার শেষ সংস্করণের (Chap. Vii) ২৯১ পৃষ্ঠায় উক্ত শব্দের ব্যবহারের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশ্বকোষের ৯ম সংস্করণে "Aryan" নামক প্রবন্ধে তিনি উক্ত শব্দের সংস্কৃত ভাষ্য পুরাপুরি বর্ণনা করিয়াছেন। শব্দটীর প্রারম্ভিক ব্যবহার হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র ভারতেই নহে, এমনকি ব্যাক্ট্রোরিয়া ও পারস্যে জাতীয় নাম হিসাবে শব্দটী ব্যবহৃত হইত (যেমন সংস্কৃতে আর্য্য arya, জেন্দ-এ airya, প্রাচীন ফার্সীতে ariya)। সুতরাং যে কোনভাবেই হউক না কেন উহা পৃথিবীর সংস্কৃত প্রতিশব্দ ira-র সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া ম্যাক্সমূলার যাহা বলিয়াছেন, বাস্তবের সাথে তার কোনই সম্পর্ক নাই। Spiegel তাঁর Die arische Periode পুস্তকের ১০৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—"শব্দটীর সহিত ar-এর একটী মূল সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া বলা সহজ হইলেও ভিন্ন অর্থবোধক অনুরূপ আরও অনেক মূল শব্দের সহিতও উহার সম্পর্ক রহিয়াছে এবং কোন্ শব্দের সাথে উহা অধিক ওতোঃপ্রতোভাবে জড়িত তাহা নির্ণয়ের কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড নাই। আবার এই গ্রুপের বাহিরে অন্য কোন শব্দের সহিত যে উহার মূলগত সম্পর্ক রহিয়াছে সে সম্পর্কেও নিঃসন্দেহে কিছু বলা চলে না। শব্দটীর সহিত Eria (Ireland) আয়ার্ল্যাণ্ড

শব্দের মূলগত সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া Pictel তাঁর "Iran and Arier" প্রবন্ধে যে ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করিয়াছেন তাহাও বাস্তব-বজ্জিত। আর্মেনিয়া (প্রাচীন ফার্সীতে ব্যবহৃত Armina) নামের সহিত শব্দটির ব্যবহার যেমন প্রায়শঃই করা হইয়াছে তাহাও মূলগতভাবে অসম্ভব। সংস্কৃত ভাষাতেও দুইটি শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। (১) Aryan-এর মূলগত উৎপত্তি হিসাবে আর্য্য শব্দের ব্যবহার; (২) ঋগ্বেদে দেবদেবীর গুণবাচক বিশেষণ হিসাবে প্রায়শঃই আর্য্য শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। অনেক জায়গায় aryas শব্দ ari-র মূলগত প্রতিশব্দ হইতে পারে এবং ari কে "সক্রিয় ও একাগ্র ধাম্মিক" বলিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে জাতীয় নাম হিসাবে আর্য্য শব্দের ব্যবহার দেখা যায় নাই। তবে Vajasaneyi-Samhitaয় মহীধর হিসাবে উহাকে বৈশ্য বা মানুষের মূল ৪টি শ্রেণীর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর স্থানপ্রাপ্ত কৃষক শ্রেণীভুক্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অথর্ববেদে আবার ইহাকে শূদ্র বা চতুর্থ শ্রেণীর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারত ও পারস্যে একটি শব্দ পাওয়া যায় (সংস্কৃতে aryaman; জেন্দ-এ airyaman) যাহার উৎপত্তির মূল একই। সংস্কৃত ও জেন্দ—এই উভয় ভাষাতেই উহার অর্থ সহকর্মী বা অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু আর্য শব্দের মূল যাহাই হউক না কেন, তাহা যে সম্মানিত গোষ্ঠির সহিত সংশ্লিষ্ট একটা শব্দ তাহা সুস্পষ্ট এবং ইন্দো-ইউরোপীয়দের পূর্ব্বাঞ্চলীয় শাখা নিজদিগকে উক্ত নামে অভিহিত করিয়া গর্ববোধ করিত। ব্যাক্টেরিয়া ও পারস্যে বসবাসকারী ইরাণীদের হইতে পৃথক, বলিয়া অভিহিত ভারতে বসতি স্থাপনকারী Indo-Aryan বলিয়া পরিচিত পূর্ব শাখার একটা গোষ্ঠিকে বুঝাইবার জন্য পণ্ডিতগণ সাধারণভাবে এখন উক্ত শব্দটার ব্যবহার করিয়া থাকেন। আবার ভারতীয় ব-দ্বীপে বসবাসকারী দ্রাবিড়দের পৃথক আর একটী ভারতীয় জাতির সংজ্ঞা নির্ণয়ের জন্য Aryo-Indian বা আর্যভারতীয় শব্দের ব্যবহার করা হইয়া থাকে। আর্য জাতি কর্তৃক ইরাণ অধিকার সংক্রান্ত ঘটনাবলীর বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। ভারত অভিযান সম্পর্কে হিন্দুদের কোন ঐতিহ্যমণ্ডিত ধারা না থাকিলেও তাহারা যে মূলতঃ স্বদেশীয় অধিবাসী নয় ইহা সুনিশ্চিত এবং স্বদেশীয় না হইয়া থাকিলে তাহারা যে হিন্দুকুশ পর্বতমালার অপর পার্শ্ব হইতেই আগমন করে ইহাও সুস্পষ্ট। খৃষ্টপূর্ব প্রায় ১০০০ অব্দে তাহাদের সর্বপ্রথম সাহিত্য আত্মপ্রকাশের সময়ে তাহারা সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসী ছিল এবং ঐ সময় তাহাদের বিভক্ত হওয়ার ঘটনাও বিশেষ পুরাতন হয় নাই;—কারণ ঐ সময় পর্যন্ত উক্ত গোষ্ঠীর পূর্ব শাখা কাবুল উপত্যকা বরাবর সিন্ধুর সমতলভূমিতে গমন করে। অধ্যাপক ই, ডবলিউ, হপকিন্স তাঁহার India Old and New পুস্তকে (১৯০১, পৃঃ ৩১) বলেন যে, সম্ভবতঃ উম্বালা নামক জেলায় ঋগ্বেদ প্রণীত হয়। তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, উক্ত অধিবাসীরা সেই সময় নিশ্চয়ই প্রখ্যাত নদীগুলির পশ্চিমে বাস করিতেছিল।

অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হইতে আর্য্য ভাষার বিচ্ছিন্ন হওয়ার ইতিহাস এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নহে। বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন ও অপরিচিত ভাষাকে উক্ত গ্রুপের ভাষার সাথে এক করিয়া দেখাইবার বহু চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু তাহা কদাচিৎ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। Boghaz Kaniতে জার্মান ভূতাত্বিকদের খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত তথ্য হইতে উক্ত অনুসন্ধানকার্য অধিকতর নূতন ও অনুকূল পর্যায়ে উপনীত হয়। উক্ত স্থানে খৃষ্টপূর্ব ১৪ শতকে Hitties এর রাজা এবং Mitanni-র রাজার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে প্রায় নিশ্চিতরূপে মিত্র, বরুণ এবং ইন্দ্র—দেব দেবীর নাম ব্যবহৃত হয় এবং ঐ সব নাম প্রাথমিক আর্য উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত। তুরকান বা তুর্কীস্তানে জার্মান অভিযাত্রীদের গবেষণার বিরাট ফলাফল উদ্ঘাটিত হওয়ার পর এই বিষয়ের উপর অধিকতর আলোকসম্পাত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

—৫

৬ষ্ঠ অধ্যায়

আর্য্যাবর্ত্ত সম্বন্ধে

আর্য্য শব্দের তাৎপর্য্য এবং আর্য্যদিগের আবাসভূমির ভৌগোলিক তথ্যাদি সম্বন্ধে বিচার আলোচনার সময় সত্যসন্ধ ঐতিহাসিককে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে বৈদিক সাহিত্যের, বিশেষতঃ "জগতের আদিগ্রন্থ" ঋক্-বেদের—হিন্দু পণ্ডিত-পুরোহিতেরা দীর্ঘকাল হইতে নানাভাবে এই প্রচারণা চালাইয়া আসিতেছেন।

'বিশ্বকোষের' সম্পাদক মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন :— "এই প্রাচীন মহাজাতির আদিম বাসস্থান কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সুকঠিন। যখন দেখা যাইতেছে, অনন্তকাল হইতে এই প্রাচীন আর্য্য নাম চলিয়া আসিতেছে, তখন কে নির্ণয় করিয়া বলিতে পারে, এই আদি সভ্য জাতির আদিম বাসস্থান কোথায়?"

এই উদ্ধৃতাংশে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করা হইতেছে যে, আমাদের দেশে আর্য্য বলিয়া কথিত জাতির আদিম বাসস্থান কোথায় ছিল, তাহার নির্ণয় করার মত কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করা অসম্ভব। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য হইতেছে "আদিম নিবাস নহে"—পরবর্ত্তী নিবাস বা নিবাসগুলির ভৌগোলিক পরিচয় ও নিদর্শনগুলি সম্বন্ধে।

এখানে 'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক মহাশয়, তাঁহার অভ্যাস অনুসারে, প্রথমেই "প্রমাণিত হইয়াছে, ঋক্ সংহিতা জগতের আদি গ্রন্থ" বলিয়া ভূমিকা করিতেছেন। তাহার পর এই প্রমাণহীন, বরং প্রমাণের বিপরীত, সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, "এই গ্রন্থে আর্য্য জাতি প্রসঙ্গে যেসব নদনদী, নগর ও পবিত্র স্থানের উল্লেখ থাকিবে, স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্য্যগণ সেই সব দেশে বাস করিতেন।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর্য্যরা যে দেশ হইতে আসুন না কেন, আমরা যে দেশকে ভারতবর্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি, সেই দেশের কোন্ বা কোন্ কোন্ অঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন? ঋক সংহিতায় সে দেশের উল্লেখ আছে কিনা? থাকিলে জগতের সেই "প্রথম গ্রন্থের" বর্ণনা উল্লেখ না করিয়া প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ মহাশয় অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন কেন?

আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী, তাঁহার কুখ্যাত 'সত্যার্থ প্রকাশ' পুস্তকে এই প্রসঙ্গে আর্য্যাবর্ত্ত নামক দেশের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাহার ভৌগোলিক সীমা-সরহদ্দেরও বিবরণ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নিজের (কল্পিত) শিষ্যের প্রমুখাৎ প্রশ্ন করাইতেছেন—"প্রথমে এই দেশের (=আর্য্যাবর্ত্তের) কি নাম ছিল এবং ইহাতে কাহারা বাস করিত?" স্বামীজী সপ্রতিভভাবে উত্তর দিতেছেন—"ইহার পূর্ব্বে এই দেশের অন্য কোন নাম ছিল না এবং আর্য্যদিগের পূর্ব্বে এই দেশে কেহই বাস করিত না।"

(২৩২ পৃষ্ঠা)। সুতরাং আর্য্য-নিবাস সম্বন্ধে কোনো গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, স্বামীজীর এই উক্তি হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

মনু সংহিতায় যথাক্রমে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ, ব্রহ্মর্ষী দেশ, মধ্য দেশ ও আর্য্যাবর্ত্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্ত সংক্রান্ত শ্লোকের নম্বর হইতেছে ২২, এবং ব্রহ্মাবর্ত্ত সংক্রান্ত শ্লোকের নম্বর হইতেছে ১৭। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়, মনু সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আর্য্যাবর্ত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি করার মতলবে, ২২নং শ্লোকের পরে ১৭নং শ্লোকটী জুড়িয়া দিয়াছেন এবং ১৭নং শ্লোকের "ব্রহ্মাবর্ত্তং" শব্দের স্থলে "আর্য্যাবর্ত্তং" শব্দ বসাইয়া দিয়াছেন। আমি মনু সংহিতা হইতে শ্লোক দুইটী, স্মার্ত্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণির অনুবাদসহ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

সরস্বতীদৃষবত্যামে বলদ্ব্যোর্যদন্তরম।
তৎ দেব নির্মিত দেশম ব্রহ্মমবর্ত্তং প্রক্ষেতে।

"সরস্বতী ও দৃষবত্তা এই দুই প্রশস্ত দেব নদীর মধ্যস্থলে যে সকল দেব নির্ম্মিত দেশ, তাহাদিগকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে (১৭)।

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বদাসমুদ্রত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গিয্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বধা।

"পূর্ব্বে সমুদ্র, পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত, ইহার মধ্য-স্থানকে পণ্ডিতগণ আর্য্যবর্ত্ত বলেন (২২)।

আর্য্যাবর্ত্ত শব্দের অর্থ—আর্য্যদিগের বাসস্থান। এই আর্য্য শব্দের তাৎপর্য্য সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত। পূর্ব্বে ইহার কিছু কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু অভিধানকারীরা নানা ব্যুৎপত্তি আবিষ্কার করিয়া এবং নানাবিধ শ্লোক রচনা করিয়া, "আর্য্য"-শব্দকে দুনয়ার যাবতীয় জ্ঞানগরিমার ও সকল প্রকার চরিত্র-মাহাত্ম্যের আকর বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। স্বনামখ্যাত সংস্কৃত কোষকার যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে আর্য্য শব্দের অর্থ করিয়াছেন—ঈশ্বরপুত্র বলিয়া (শাস্ত্রতত্ত্ব, বিদ্যাবিনোদ, বিশ্বকোষ, আর্য্য শব্দ)। অথচ ঋক-বেদের বিভিন্ন স্থানে এইসব ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত অনেক বাস্তব নজীরও পাওয়া যাইতেছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক যুগের আদর্শস্থল আর্য্যদিগের মধ্যেও এমন অনেক কদাচারের প্রচলন ছিল যে, এই কলিযুগের "ম্লেচ্ছ ও যবনরা" তাহা পাঠ করিতেও লজ্জাবোধ করিয়া থাকে।

এখন আমি, আমার মত বাংলানবিশ পাঠকগণের জন্য, দুইখানা বাংলা অভিধান হইতে, পূর্ব্বোক্ত বিরক্তিকর আলোচনার সারমর্ম্মস্বরূপ দুইটী মন্তব্য নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

(১) আর্য্যাবর্ত্ত=পূজ্য, আবর্ত্ত=বাসস্থান, ৬ তৎ। অথবা কুল্লুক ভট্টের মতানুসারে "আর্য্যা আবর্ত্তন্তে পুনঃপুনঃ উদ্ভবন্তী আর্য্যাবর্ত্তঃ।

আর্য্যেরা এই স্থলেই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া এই নাম। আর্য্য জাতির জন্মভূমি, যাহার পূর্ব্ব সীমা সাগর (=বঙ্গোপসাগর), পশ্চিম সীমা সাগর (=আরব সাগর) উত্তর সীমা হিমালয়, এবং দক্ষিণ সীমা বিন্ধ্যাচল।

(বাংলা ভাষার অভিধান, জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস)

(২) পৃথিবী—ভূমণ্ডল। পৃথু রাজার অধিকৃত দেশ বলিয়া—

ভারত বর্ষ।—(গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ানের মতে) নববর্ষের অন্তর্গত বর্ষ বিশেষ; হিমালয়ের দক্ষিণ, সমুদ্রের উত্তরস্থ দেশ। আরব, পারস্য, তুরস্ক ও মধ্য এশিয়ার বহু দূর পর্য্যন্ত এককালে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (বাংলা ভাষার অভিধান)

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া বাস্তবিক দুনিয়ায় কোনো নির্দিষ্ট দেশ ছিল না। পক্ষান্তরে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর এবং বিন্ধ্যাচল ও হিমালয় চৌহদ্দীর মধ্যে অবস্থিত দেশগুলিকেও আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত, পুরাণাদির বর্ণনায় বিভিন্ন ভারতের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন রাজা দশরথের পুত্র ভরত, দুষ্মন্ত রাজার ঔরষে শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্র ভরত, ইত্যাদি। এইরূপে পৃথু রাজার বিশিষ্ট পরিচয় জানিতে চাহিলে কোষকারগণের মুখে উত্তর পাওয়া যায়—ইনি "বেন" রাজার পুত্র, পৃথিবী মণ্ডলকে ইনিই "প্রোথিত" করিয়াছিলেন, কিন্তু কবে প্রোথিত করিলেন, তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁহার পিতৃদেব বেন রাজার সন্ধান নিয়া, পঞ্জিকাকার মহাশয়দের মুখে জানা যাইবে যে, এই বেন রাজা হইতেছেন সত্যযুগের লোক। এই সত্যযুগে ছয়জন মহারাজ চক্রবর্ত্তী রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। মানুষ তখন স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিত, এবং তাহারা সকলেই ছিল সত্যপরায়ণ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, রাজকুমার পৃথু তো পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা বেন মহারাজের বাসস্থান বা রাজ্যপাঠ ছিল যে দেশে, তাঁহার শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল যে দেশে, তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন এবং লালিতপালিত হইলেন যে দেশে, তাঁহার জন্মের বহু পূর্বেই তো সে দেশটার বিদ্যমান থাকার কথা। সুতরাং তিনিই পৃথিবীকে "প্রোথিত" করিলেন—এ কথার কোনো অর্থ এই কলিকালের মানুষদের বোধগম্য হইতে পারে না।

এইখানেই বিভ্রাটের নিবৃত্তি ঘটিতেছে না। বিশ্বসৃষ্টির অতীত ইতিবৃত্তের দিকে আরও অগ্রসর হইলে, আমরা শাস্ত্রকথিত এক মহা ব্রহ্মাণ্ডের সন্ধান পাইতে পারি। "বিরাট পুরুষ নিজ তেজ দ্বারা সকল দিককে আলোকিত করিয়া ফেলিলেন এবং জলের সৃষ্টি করিলেন। সেই জলের মধ্যে বীজ নিক্ষিপ্ত হইল, সেই বীজ সুবর্ণ অণ্ডে পরিণত হইল, সেই অণ্ডে বিরাট পুরুষ ব্রহ্মারূপে অবস্থান করিলেন। কিছুদিন পরে ঐ অণ্ড দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল, এবং তাহার এক ভাগ হইতে আকাশ ও অন্য ভাগ হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইল।" সুতরাং এই বর্ণনা হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, বেন রাজার ও তাঁহার পুত্র পৃথু রাজের জন্মের বহু পূর্বেই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল।

ফলতঃ অকাট্য সত্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে যে, বেদাদি হিন্দু শাস্ত্রের ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক ভিত্তি বিন্দুমাত্রও নাই।

আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, দীর্ঘকাল "পারস্য দেশে" অবস্থান করার পর সেখানে ধর্ম বিপ্লবের ফলে, সংস্কার বিরোধী বহুসংখ্যক রক্ষণশীল বা পৌত্তলিক অধিবাসী অবশেষে সংস্কারকামী দেশবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হন এবং অবশেষে খোরাছানের যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া অন্যান্য দেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। যাত্রা শেষে তাঁহারা হিন্দুস্তানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহারা সব ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন—এক পুরাতন পিতৃভূমির "আর্য্য" উপাধিটা ব্যতীত। হিন্দুস্তানে আসিয়া দেশগত আর্য্য-উপাধিটাকে জাতিগত অর্থে পরিবর্তিত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং নিজেদের আবাসভূমিকে আর্য্যাবর্ত বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, ঐতিহাসিক সত্যের মুণ্ডপাত করিয়া।

কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, পারস্য দেশ বলিয়া দুনয়ায় কোনো দেশ ছিল না। যে ভূভাগকে আমরা পারস্য দেশ বলিয়া উল্লেখ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহা হইতেছে ঈরাণ দেশের একটা প্রদেশ মাত্র। পূর্বে ইহার নাম ছিল Persis বা পারেস, প্রতিবেশী আরবদের সংস্রবে আসার পর উহা فارس হইয়া যায়। এই ঈরাণ নাম পূর্বে লিখিত হইত Ariana রূপে। সঙ্গে প্রদত্ত প্রাচীন মানচিত্র হইতে এই সত্যটা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে। সম্রাট দারিয়ুছের শিলালিপির বর্ণনার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

৭ম অধ্যায়

জাতীয় ইতিহাসের শুভ-সূচনা

ইছলামের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে মানব সভ্যতার প্রথম বিকাশের অর্থাৎ হজরত আদমের যুগ হইতে। আদম হইতে নুহ নবী পর্য্যন্ত সেই বিকাশের প্রথম যুগ, নুহ হইতে Patriarch বা কুলপতি হজরত ইবরাহীমের সময় পর্য্যন্ত নানাদিক দিয়া তাহার যুগোপযোগী বিবর্তন হইয়া আসিতে থাকে। হজরত মুছার যুগ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ইহা একটা বিধি ব্যবস্থা সম্বলিত আঞ্চলিক শরিয়তের আকার ধারণ করিতে সমর্থ হয়। বানিইছরাইল জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রকট হইয়া ওঠে এই সময়ে, এবং তাওহীদ ধর্ম্মের প্রথম স্মৃতিসৌধ বায়তে-ঈল বা বায়তুল্লাহ মক্কার মরু-প্রান্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় এই যুগে।

কিন্তু তখনও অপেক্ষার কাল অতিবাহিত হয় নাই—ইবরাহীমের মোনাজাত, ঈছা মছিহের খোশখবর এবং অথর্ববেদের সেই "রছুলবর" তখনও বাস্তবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন নাই।

হজরত ইবরাহীমের মোনাজাত :—

واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا
تقبل منا انك انت السميع العليم ० ربنا واجعلنا مسلمين لك
ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك
انت التواب الرحيم ० ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو
عليهم ايتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت
العزيز الحكيم ०

আরও স্মরণ কর (সেই সময়ের কথা), ইব্‌রাহীম যখন (কা'বা) গৃহের প্রাচীর-গুলি (গাঁথিয়া) তুলিতেছিলেন—এবং তাহার সঙ্গে (ছিলেন) ইছমাইল; (তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—) হে আমাদের প্রভু, হে আমাদের পরওয়ার দেগার, আমাদের (এই খেদ্‌মতকে) তুমি কবুল কর। নিশ্চয় তুমি হইতেছ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা!

আর, হে আমাদের পরওয়ারদেগার। আমাদের উভয়কে তুমি তোমার প্রতি (নিবেদিত চিত্ত) রাখিও, এবং আমাদের বংশধরদিগের মধ্য হইতে একটি মোছলেম উম্মত (কাএম) করিয়া রাখিও, আর আমাদের এবাদাত্‌ বন্দেগীর স্থান ও পদ্ধতিগুলি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিও এবং আমাদের প্রতি রহমতের নজর রাখিও, নিশ্চয় তুমি হইতেছ মহাক্ষমাশীল, কৃপানিধান।

আর, হে আমাদের প্রভুপরওয়ারদেগার! তাহাদেরই মধ্য হইতে এমন একজন রছুলকে অভ্যুত্থিত করিও, যিনি তাহাদের কাছে তোমার আয়াতগুলির তেলাওত

করিবেন আর তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন কেতাব ও প্রজ্ঞা (হেকমত) আর তাহাদিগকে পাকছাফ করিয়া তুলিবেন ; নিশ্চয় তুমি হইতেছ প্রবল প্রজ্ঞাময়।

(ছুরা বাকারা ১২৭, ১২৮, ১২৯ আয়াত)

ঈছার খোশখবর

و اذ قال عيسى ابن مريم يبنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقالما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد فلما جاءهم بالبينت قالوا هذا سحر مبين 0

এবং মরয়ম তনয় ঈছা যখন বলিয়াছিলেন : "হে বানি ইছরাইল ! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি আল্লার রাছুলরূপে, আমার সম্মুখে তাওরাতের যে অংশ (বিদ্যমান) আছে তাহার তাছদীক করার জন্য—এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রাছুল আসিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে "সুসমাচার" দেওয়ার উদ্দেশ্যে ;

কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত রাছুল যখন তাঁহাদের কাছে সমাগত হইল উজ্জ্বল দলিল প্রমাণগুলিসহ, তখন তাহারা বলিতে লাগিল—এগুলি স্পষ্টতঃ যাদুর ব্যাপার।

(ছুরা ছফ ৬ আয়াত)

কালক্রমে অপেক্ষার সময় অতিবাহিত হইল, এবং আজ হইতে ১৪ শত বৎসর পূর্বে, মক্কার এক বিধবা নারীর পর্ণকুটীরে আবির্ভাব হইল সেই যুগে যুগে নন্দিত, দেশে দেশে বন্দিত—মহা মানবের, এক এতীম শিশুরূপে।

ہوئے پہلو ئے آمنہ سے ہویدا
دعا ئے خلیل و نوید مسیحا

য়াহুদ ও বানি ইছরাইল

এহুদ জাতি তাহাদের নবীগণের দ্বারা বহুবার অভিশপ্ত হইয়াছে, তাহাদের কাপুরুষতা ও নাফর্মানীর জন্য। এই শ্রেণীর নাফর্মানীর ও অনাচারের ফলে, দুনিয়ায় তাহাদিগকে বহুবার নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত হইতে হয়। হজরত মূসার এন্তেকালের পর তাহাদের দুর্দশা ও দুর্ভোগ চরম অবস্থায় উপনীত হইয়া যায়। বলা আবশ্যক, জেহাদ হইতে বিমুখ হইয়া পড়াতেই শত্রুরা বিভিন্ন সময় তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে, তাহাদিগকে সপরিবারে গোলাম বাঁদী করিয়া রাখে, অশেষ প্রকার নিষ্ঠুর যাতনা দিতে থাকে। বায়তুল মোকাদ্দাছকে পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ধূলিস্মাৎ করিয়া ফেলে। ধর্মীয় সাহিত্যগুলিকে পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া দেয়।

এমনি অবস্থায় তাহারা এক সময় নিজেদের নবীর নিকট উপস্থিত হইয়া অনুরোধ করিতে থাকে—"আমাদের জন্য একজন বাদশাহ কাএম করিয়া দিন, যেন তাঁহার

নেতৃত্বাধীনে আমরা দুশমনদের সঙ্গে জেহাদ করিতে পারি। নবী ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—আবার তো তোমরা পূর্বের ন্যায় নাফর্মানী করিবে! অনেক একরার অঙ্গীকার করার পর তখনকার নবী আল্লার নির্দেশ অনুসারে তালুৎ নামক একজন জ্ঞানী বীর পুরুষকে তাহাদের বাদশাহরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। কিন্তু এবারও তাহাদের অধিকাংশ লোক তাঁহাকে অমান্য করিল, তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। জেহাদের ময়দান হইতে কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সত্যকার মোমেন ছিল যে অল্প সংখ্যক লোক, তাহারা হুঙ্কার দিয়া বলিল—সংখ্যালঘুদল তো বহুবার সংখ্যাগুরুদলকে আল্লার হুকুমে পরাজিত করিয়াছে। এই বলিয়া তাঁহারা ময়দানে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং পরিণামে আল্লার হুকুমে তাহারা কাফেরদিগকে পরাজিত করিল। এমন কি, তাহাদের প্রধানতম দুশমন জালেম বাদশাহ জালুতও হজরত দাউদের হস্তে নিহত হইল। (ছুরা বাকারা ৩২ ও ৩৩ রুকু।)

ছুরা বাকারার ৩২ ও ৩৩ রুকুর বর্ণনাগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টভাবে জানা যাইবে যে, তালুত বাদশাহের আমলের প্রথম পরীক্ষাতেই বানি ইছরাইল সমাজ পৃথক পৃথক দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদল ছিল আল্লার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী, নবীর ফর্ম্মাবরদার ও ছরদারের তাবেদার, বীর মোমেন মোছলেম, আর একদল ছিল তাহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত, অবিশ্বাসী, কাপুরুষ, নবীর অবাধ্য ও ছরদারের নাফর্ম্মান। আফগানিস্তানের অধিবাসীরা দাবী করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা হইতেছেন তালুতের সহকারী ও সাহায্যকারী মোমেনদিগের বংশধর—বানি ইছরাইল। য়াহুদী তাঁহারা নহেন, নাফর্ম্মান অনাচারী ও মোনাফেকদলই বর্ত্তমানে য়াহুদী নামে আখ্যাত হইয়া আছে। ঐতিহাসিক বিচার আলোচনার জন্য যে সব যুক্তি প্রমাণের দরকার হইয়া থাকে, তাহার সবগুলি তাহাদের জাতীয় সাহিত্যে বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া আছে। সে গুলির পরিচয় আমরা পরে প্রদান করিব। আলোচনার সুবিধার জন্য উপস্থিত তাহাদের ইছলাম গ্রহণের ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আরজ করিয়া রাখিতেছি।

কোরআন মাজীদে তালুতকে বানি-ইছরাইলের ম'লেক ملک বা বাদশাহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাদের যাঁহারা আল্লার নবীর নির্দ্দেশ অনুসারে তালুতের নির্দ্দেশ মান্য করিয়া জাতীয় বৈরীদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং অবশেষে জালুতকে নিহত করিয়া স্বজাতিকে মুক্তিদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সাধারণ য়াহুদী সমাজের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া নিজদিগকে বানি ইছরাইল বলিয়া আখ্যাত করিতে লাগিলেন। পূর্বাধিকারী তালুতের স্বজন ও সন্তান সন্ততি হিসাবে ম'লেক উপাধিও তাঁহারা গ্রহণ করিলেন। পক্ষান্তরে "য়াহুদী" আখ্যাকেও তাহারা আন্তরিক ঘৃণার সহিত বর্জ্জন করিলেন।

কিন্তু তালুতের পর বানি ইছরাইলের অবস্থা ক্রমে ক্রমে শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইয়া যাইতে লাগিল। তখন তাহাদের প্রধান এবাদৎগাহ বিধ্বস্ত, ধর্ম্মীয় পুথি-পুস্তকগুলি

প্রায় ভস্মীভূত এবং বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে তাহাদের জাতির প্রায় সমস্ত নরনারী বিভিন্ন জালেম বাদশাহ কর্তৃক হয় স্বদেশ হইতে বিতাড়িত, না হয় বন্দী হিসাবে অতি নিষ্ঠুর দাস জীবন যাপনে বাধ্য হইয়াছে। অথচ এই পরিস্থিতির প্রতিকারের কোনো উপায়ই তাহারা দেখিতে পাইতেছে না।

জাতীয় দুর্দ্দশার এই চরম মুহূর্তে, বানি-ইছরাইল সমাজের মধ্যে সুমতির উদ্রেক হইল এবং তাহাদের কএকজন বিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তি একত্র হইয়া উদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই সময়কার অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু দেশের বহু পর্য্যটক ও ঐতিহাসিক বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। এখানে "তারীখে খান জাহানী" হইতে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

چون بخت نصر بنی اسرائیل و فرزندان آصف واولاد افغان را که درکثرت برجمیع قبایل تفضل داشتند، از ولایت شام اخراج نمود، جمع از ایشان درملک عرب درآمدند وباخود گفتند که چون از زیارت وعبادت آن خانۂ خدا که مهتر داؤد و مهتر سلیمان بنا کرده بودند محروم شدیم و آں سعادت ازما فوت شده بندگی وطاعت این بیت الله را که مهتر اسماعیل وابراهیم و اسحاق علیهم السلام بنیاد نهادند و این مکان شریف که جائے تولد و بعثت پیغمبر آخرالزمان خواهد بود. ازدست نه دهیم و خود را باین دولت سرمدی نایز سازیم الخ -

মর্ম্মার্থ : —পারস্যরাজ বখত নছর যখন বানি ইছরাইলকে এবং আছফের সন্তান-বর্গকে ও আফগানের আওলাদকে শাম দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল, তখন ইহাদের একটা দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিল—আমরা হজরত দাউদ ও হজরত ছোলয়মানের খোদার ঘর বায়তুল-মোকাদ্দছের জিয়ারত ও এবাদত হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমাদের সে সৌভাগ্যও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হজরত ইবরাহিম ও হজরত ইছমাইল যে বায়তুল্লার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন এবং যে পবিত্র ভূভাগ আল্লার শেষ নবীর আবির্ভাবের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়া আছে, আমরা সকলে সেই আরব দেশে গমন করিব। এ সুযোগকে উপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। সেই মহানবীর সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ যদি এখন আমাদের নাও ঘটে, তাহা হইলে আমাদের সন্তান সন্ততিবর্গ তাঁহার চরণ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করার পর উপরোক্ত দলের সমস্ত লোক মক্কা শরীফে গিয়া হরমের এলাকায় অবস্থান করিতে থাকে। আরবরা উহাদিগকে বানি ইছরাইল ও বানি-আফগান বলিয়া সম্বোধন করিত। ২য় অধ্যায় ৭৭ পৃঃ।

এইরূপে হজরত ছোলায়মানের ১৫ শত বৎসর পরে আরবের পবিত্র ভূমিতে দুনয়ার শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আবির্ভাব ঘটিল। ইহার পর বানি-ইছরাইল গোত্রের বহু লোক নিজেদের দায়াদ বানি-ইছমাইল ও আরবদিগের সহিত সম্মিলিত হওয়ার জন্য আরব দেশে গমন করিলেন। সমগ্র মোছলেম জাহানের স্বনামধন্য বীর খালেদ এবন অলীদ ইহার পূর্বে মক্কায় গমন করিয়াছিলেন তাঁহার পুরা নাম—খালেদ এবন অলীদ মাখ্‌জুমী। *

এখানে একটা খটকা লাগিতে পারে যে, আফগানিস্তানের অধিবাসীরা হজরত ইব্রাহিমের প্রতিষ্ঠিত খানায়ে খোদার অর্থাৎ কা'বা শরীফের বিবরণ পূর্ব হইতে অবগত হইতে পারিয়াছেন কোন্ সূত্রে ও কি উপায়ে। সংক্ষেপে ইহার উত্তর লিখিত হইতেছে :—

(১) ছুরা আল এমরানের ৯৫ আয়াতে মক্কাকে বাক্কা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মাক্কা বা বাক্কা উভয় নামই আরবদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। (রাগেব ফত্‌হোল বোলদান প্রভৃতি) বানি-ইছরাইলদিগের ধর্মশাস্ত্রেও বাক্কা নামের উল্লেখ আছে। এই বাক্কা বা মক্কার "খোদার ঘরের" মহিমা সম্বন্ধে জবুর গীতসংহিতায় হজরত দাউদ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতেছেন :—

فطوبی للسكان فی بیتک رامی الابد یسبحونک - مغبوط هو الرجل الذی نصرته من عندک مطالع فی قلوبه یضع - فی وادی البکا فی المکان الذی وضعته فیه لان البرکات یعطیها واضع الناموس -

مبارک وہ ہیں جو تیرے گھر میں بستے ہیں' وہ سدا تیری ستایش کرینگے - مبارک وہ انسان جس میں قوت تجھہ سے ہے - ان کے دل میں تیری راہیں ہیں' وہ بکا کی وادی میں گزر کرتے ہوئے اسے ایک کنواں بناتے - پہلی برسات اسے برکتوں سے ڈھانپ لیتی -

Blessed are they that dwell in thy house ; they will be still praising thee ; in whose heart are ways of thee who passing through valling of Bacca make it a well : the rain also filleth bowls.

মোবারকবাদ তাহাদের জন্য, যাহারা তোমার গৃহে বাস করিতেছে তাহারা সতত তোমার তাছবীহ্ (স্তবস্তুতি) করিতে থাকিবে, মোবারক সেই ব্যক্তি, যাহাকে

---

* খালেদ-এবন অলীদের 'মাখজুমী' উপাধি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। উপস্থিত এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, ওহোদুল গাবা প্রমুখ বহু নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পুস্তকে (২—১০১ পৃষ্ঠা) ইহার উল্লেখ আছে।

তুমি নিজ সন্নিধান হইতে সাহায্য করিয়াছ। তোমার পথগুলি যাহার অন্তরে নিহিত আছে—বাক্কার সমতলভূমিতে, যে স্থানে তুমি তাহাকে স্থাপন করিয়াছ, কারণ নামুছের প্রতিষ্ঠাতা তাহাকে বরকত প্রদান করিবেন। (৮৩, ৪-৬)।

(২) হজরত ইছমাইলের ইতিকথা তাওরাতের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। হজরত ইব্রাহিমের পুত্র কোরবানী করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার বিবরণ উল্লেখ করার পর তাওরাতের আদি পুস্তকে বলা হইয়াছে—"তখন ঈশ্বর বালকটির রব শুনিলেন, আর ঈশ্বরের দূত আকাশ হইতে হাগার (হাজেরা)কে ডাকিয়া কহিলেন, "হাগার তোমার কি হইল! ভয় করিও না…তুমি উঠিয়া বালকটাকে তুলিয়া ধর, কারণ আমি উহাকে (ইছমাইলকে) এক মহাজাতি করিব। তখন তাহার চক্ষু খুলিয়া দিলেন। তখন সে এক সজল কূপ দেখিতে পাইল…পরে ঈশ্বর বালকটীর সহবর্ত্তী হইলেন, আর সে বড় হইয়া উঠিল এবং প্রান্তরে থাকিয়া ধনুর্দ্ধর হইল। সে ফারান প্রান্তরে বসতি স্থাপন করিল (২১ অধ্যায়)।"

ইহার পর সদাপ্রভু ইবরাহিমকে আর এক পুত্রের শুভ সংবাদ দিলেন। কিন্তু নিজেদের বার্দ্ধক্যের উল্লেখ করিয়া একটু হতাশার ভাবে তিনি সদাপ্রভুকে বলিলেন—"ইছমাইলই তোমার গোচরে বাঁচিয়া থাকুক।" এইসব কথা শুনিবার পর ঈশ্বর ইবরাহিমকে বলিলেন—আমি ইছমাইলের বিষয়ে তোমার প্রার্থনা শুনিলাম। দেখ, আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে কর্ম্মবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করিব। তাহাকে বহু বহু ফজিলত প্রদান করিলাম এবং তাহা হইতে বার জন এমাম (খলিফা) উৎপন্ন করিব (আদি পুস্তক, ১৭ অধ্যায়)।"

উপরোক্ত বর্ণনাগুলি হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, বানি ইছরাইল সমাজ তাহাদের ধর্মপুস্তকগুলি হইতে মক্কার ঘরের, বায়ত-ঈল—বায়তুল্লার, হজরত ইছমাইলের এবং তাহার সহযাত্রী স্বজাতীয়গণের সম্যক সংবাদ নিশ্চিত ভাবে অবগত ছিল। এ সম্বন্ধে তাওরাত, ইঞ্জিল ও বানি ইছরাইল জাতির ইতিহাস হইতে আরও অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারিত। কিন্তু এখানের জন্য ইহাই যথেষ্ট হইবে মনে করতঃ পাঠকগণের ধৈর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া প্রমাণটা এখানে শেষ করিতেছি। *

আফগানিস্তানকে সাধারণ ভাবে পাঠান কওমের আবাসভূমি বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসীরা আজও নিজেদের আবাস ভূমিকে পখতুনিস্তান বা পাঠানিস্তান বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। অন্যান্য সকল দেশের ন্যায়, পাঠান আফগান ব্যতীত অন্যান্য কওমের কিছু সংখ্যক যে ঐ দেশে বসবাস করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুপাতে পাঠানদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

বানি ইছরাইল জাতি বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল, ইহা ইতিহাসের ছাত্রেরা নিশ্চয় অবগত আছেন। কিন্তু তালুত বা ছোলের পূর্ববর্ত্তী সময় হইতে, তাহাদের দশটি

* হজরত ইছহাককেও ঠিক এই ভাষায় আশীর্বাদ করা হইয়াছিল। (ঐ, ঐ)

গোত্রের লোকদিগের নৈতিক, ধর্ম্মীয় অবস্থার চরম অধঃপতন ঘটিতে থাকে, এবং সে জন্য তালুত বাদশার ও তাঁহার সমসাময়িক নবীর আদেশ নিষেধগুলি অমান্য করার প্রতিফলে তাহারা একটি অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হইয়া যায়। ইহার পর অন্য দুইটি মোমেন মোছলেম গোত্রের সহিত তাহাদের আর কোন সংশ্রব থাকে না।

এই দুই গোত্রের লোকেরা নিজেদের তৎকালীন শোচনীয় পরিস্থিতির বিষয় কিছুকাল ধরিয়া বিবেচনা করার পর সমবেত ভাবে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত তাঁহাদের আত্মরক্ষা করার আর কোন উপায় নাই। এই সিদ্ধান্তের কথা পূর্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

তারিখে জাহাঁকুশা, মজ্মাউল আনছার ও তারীখে আছনাফুল মখলুকাত প্রণেতাগণ লিখিয়াছেন :—

১১ چوں انوار طلعت آفتاب جہانتاب جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عالم تاریک راروشن ومنور گردانید خالد بشرف اسلام مشرف گشت وگروہ اعراب واصناف خلائق رجوع بمدینہ آوردند۔ خالد مکتوبی بجانب (بنی اسرائیل و) بنی افغان و بنی اعمام خود کہ در کوھستاں نواحی غور مسکن (مالوف) داشتند از زماں اخراج بخت نصر بنی اسرائل دراں مکاں متوطن بودند نوشت واینشا نرا از بعثت پیغمبر آخر الزماں وحقیقت اسلام و ایماں اعلام نمود - چوں مراسلۂ خالد باین قوم رسید چند کس از رؤساء وبزرگاں آں طوائف متوجہ مدینہ شدند و بزرگ ترین جماعۂ بنی افغاں قیس نام بود۔

মর্মানুবাদ :—হজরত রাছুলে করীমের শুভ আবির্ভাবের পর যখন দুনিয়ার বিভিন্ন দিক নবুওতের স্বর্গীয় নূরে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, খালেদ-এবন-অলীদ সেই সময় ইছলাম গ্রহণ করেন। বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন স্থানের আরবী লোকেরা তখন দলে দলে মদীনার দিকে ধাবিত হইল এবং ইছলাম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে ধন্য করিল। এই সময়ে খালেদ, ইছরাইলী, আফগানীও নিজের গোত্রগোষ্টির লোকদিগের নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করেন। বাখ্‌ত নছর কর্ত্তৃক বানি ইছরাইল দেশান্তরিত হওয়ার পর আফগানিদের সহিত কুহিস্তান ও গওরের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে বসবাস করিতেছিল। পত্রে খালেদ শেষ নবীর আবির্ভাব, ইছলাম এবং ঈমানের ব্যাখ্যা করিয়া উহা গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে আহ্বান জানান। খালেদের পত্র পাওয়ার পর সেই সমস্ত গোত্রের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির একটি দল মদীনায় গমন করার সিদ্ধান্ত করিলেন। সেই আফগানী প্রতিনিধিদলের নেতা ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির নাম ছিল কয়ছ।—তারীখে খানজাহান (১) ২০৭ পৃষ্ঠা।

এই প্রতিনিধি দল যথাসময়ে মদীনায় উপস্থিত হইল এবং খালেদের পরামর্শ অনুসারে ইছলামের সত্যতা অনুভব করিয়া রছুলুল্লার মোবারক হাতেই ইছলামের বয়আত গ্রহণ করিল। রছুলুল্লাহ উক্ত প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ পাইয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন, ও সকলের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। দলপতির নাম "কয়ছ" শ্রবণ করতঃ তিনি এর্শাদ করিলেন : কয়ছ ত ইবরাণী নাম, আমরা আরবী লোক, সুতরাং তোমার নাম আবদুর রশীদ রাখা হইল। অধিকন্তু মলেক তালুতের বংশধর আর আল্লাহ পবিত্র কোরআনে তাঁহাকে 'মলেক' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন অতএব তোমাদিগকেও মলেক উপাধিতে সম্বোধন করা অধিক সঙ্গত হইবে। কিছুদিন পর প্রতিনিধিদল স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি আবদুর রশীদকে পুনরায় ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাদের জন্য পুনঃপুনঃ দোয়া-আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। তাহাদের বিদায়কালে খালেদের ইংগিতে রছুলুল্লাহ জনৈক আনছারী ছাহাবীকে আবদুর রশীদ পাঠানের সহিত তথায় ইছলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর তারীখে খান জাহনী প্রণেতা লিখিয়াছেন,

پس قیس که باسم عبد الرشید وخطاب پٹھان معزز گشته بود خوشحال وخرم به دیار خود باز گشت ودین اسلام راارواج داد وقبیلهٔ خود رابشرف اسلام مشرف ساخت۔

অতএব সেই কয়ছ যিনি আবদুর রশীদ নামে এবং পাঠান উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন তিনি সানন্দে ও উৎফুল্লচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইছলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ৭৮ বৎসর বয়সে মুআবিয়া বিন আবু ছুফ্‌ইয়ানের সময়ে ইন্তেকাল করেন। (১) ১১২ পৃঃ।

উল্লিখিত ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে আকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, আফগানিস্তানে ইছলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার আরম্ভ হইয়া যায় হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনকালে আফগান প্রতিনিধিদলের ইচ্ছা ও আগ্রহের ফলে। কোনো পক্ষ হইতে কোনো প্রকার জবরদস্তি তাহাদের উপর করা হয় নাই।

আনুষঙ্গিক কথাগুলি আলোচনা করিলে জানা যায় যে, হজরত রছুলে করীম আফগানিস্তানে পাঠানদের অবস্থান সম্পর্কে অল্পবিস্তর অবগত ছিলেন। সেই জন্যই ছরদার আবদুর রশীদকে বিদায় প্রদানের সময় হজরত তাহাকে হাজা বাতান (—পাঠান) বলিয়া সম্বোধন করিয়ছিলেন। হজরত রছুলে করীমের এই এর্শাদ হইতে পাঠান শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মুছলমান ঐতিহাসিকগণের অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন।

খালেদ এবন অলীদের পরিচয়

খালেদ নাম, আবু ছোলায়মান অথবা আবুল অলীদ উপনাম এবং পরবর্তীকালে রছুলুল্লাহ কর্তৃক তিনি ছয়ফুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত হন। পিতার নাম অলীদ। তাঁহার বংশ পরিচয় নিম্নরূপ :

খালেদ এবন অলীদ বিন মুগীরা বিন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন মখ্‌জুম আল-কোরায়শী আল্‌মখ্‌জুমী।

তাঁহার মাতার নাম ছিল লুবাবায়ে ছুগরা বিন্‌তে হারিছ বিন হুজ্‌না। তিনি মুছলিম কুলজননী বিবি ময়মুনার ভগ্নি ছিলেন। তাঁহার অপর ভগ্নি লুবাবায়ে কুব্‌রাকে আব্বাছ বিন আবদুল মুত্তালিব বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সম্পর্ক অনুসারে রছুলুল্লার বিবি ময়মুনা, খালেদ এবন অলীদের খালা এবং রছুলুল্লাহ তাঁহার খালু ছিলেন। বস্তুতঃ এই সম্পর্ক যে খালেদের জন্ম অতি গৌরবের বিষয় ছিল তাহা না বলিলেও চলে।

ایک گونہ نسبتے بتو کافی بود مرا -
بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس است

খালেদ এবন অলীদ ইছলাম গ্রহণের পূর্বে স্বীয় গোত্রে অতি সম্মানিত ব্যক্তি এবং নেতৃত্ব পদে বরণীয় ছিলেন। আপদে বিপদে লোকেরা তাঁহারই আশ্রিত হইত। খালেদের ইছলাম গ্রহণের সময় নির্ণয়ে ঐতিহাসিকগণের মতবিরোধ ঘটিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশের মতে সপ্তম হিজরীতে খয়বর বিজয়ের পর তিনি ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি হিজরত করতঃ মদীনায় বসবাস করেন। খালেদ এবন অলীদ অতি সাহসী ও বীর পুরুষ ছিলেন। বদর যুদ্ধের পর সপ্তম হিজরী পর্যন্ত মুছলিমদের সহিত কুরায়শগণের প্রায় সমস্ত যুদ্ধেই তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহুদের লড়াইতে তাঁহারই রণ কৌশলে মুছলমানদের বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। ইছলাম গ্রহণ করার পরও খালেদ বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁহার রণ কৌশল প্রদর্শন করেন। তাঁহার বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ রছুলুল্লাহ তাঁহাকে ছয়ফুল্লাহ (আল্লার তরবারী) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

রছুলুল্লার ইন্তেকালের পর মুছলিম জাতির উপর যে সংকট উপস্থিত হয়, ইতিহাসের ছাত্রদের নিকট তাহা অবদিত নহে। মুছলমানের একটি বিরাট দল মুর্তাদ হইয়া যায় এবং যাকাত প্রদান করিতে অস্বীকার করে।

কিন্তু অনেক বাধা সত্বেও দৃঢ়চেতা আবুবকর তাতে দমিলেন না বরং তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন এবং খালেদ এবন অলীদকে তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদে প্রেরণ করেন। খালেদ তাঁহার রণকৌশলে অল্পদিনের মধ্যে সেই ফছাদকে দমন করেন। উক্ত দলের নেতা মুছায়লামা কাজ্জাবকে কতল করিয়া সেই ফেৎনাকে সমূলে উৎপাটিত করেন।

মৃত্যুর পূর্বক্ষণে খালেদ বিন অলীদ আক্ষেপ করিয়া বলেন, আমি ইছলাম গ্রহণের পর ন্যূনাধিক একশত জেহাদে যোগদান করিয়াছি এবং তরবারী, বাণ অথবা তীরের জখম হইতে আমার শরীরের কোন অংশই বাদ পড়ে নাই। অথচ আজ আমাকে ভীরু ব্যক্তির ন্যায় নিজের বিছানায় মৃত্যু বরণ করিতে হইতেছে, ইহার চাইতে অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

খালেদ বিন অলীদ ২১ অথবা ২২ হিজরীতে মদীনায় এন্তেকাল করেন। (—এছাবা (২) ১০০ পৃঃ ; ইস্তিয়াব (১) ১৫৪ পৃষ্ঠা)

৮ম অধ্যায়

মালাবারে ইছলাম

হজরত রাছুলে করীমের ৪০ বৎসর বয়সে, অর্থাৎ তাঁহার নবুয়ত লাভের অব্যবহিত পরবর্তীকাল হইতেই ইছলাম ধর্ম্মের প্রভাব ও প্রচার ব্যাপকভাবে বাড়িয়া যাইতে থাকে। সততার সহিত ইহার কার্য-কারণ পরম্পরার সন্ধান লইলে জানা যাইবে যে, করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্ তাআলার মঙ্গল ইচ্ছাই ছিল ইহার মৌলিক প্রেরণা। নানা অবিচারে কদাচারে, মূঢ়তা ও কুসংস্কারের সূচীভেদ্য অন্ধকারে আল্লার সৃষ্টি তখন শোচনীয়তার চরম স্তরে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল। তাই দয়াময়ের ফর্মান আসিল—আবার আমার দুনয়ার নবতম সৃষ্টির উদ্রেক হউক! সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনিই জাগিয়া উঠিয়াছিল ফারান প্রান্তরের আকাশে বাতাসে, তাই স্বর্গের আলোকে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল তাকবীরের সঞ্জীবনী মন্ত্র, দুনয়ার দিকে দিকে, যুগপৎভাবে। তাই আফগানিস্তানের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আজই আবার উপস্থিত হইতেছে মালাবারের পুণ্য কাহিনী! এমনি করিয়া সেই আব-হায়াতের স্রোত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে দুনয়ার সকল জনপদের পানে অবিরাম গতিতে।

মালাবার দেশ

মালাবার দেশের এবং সেই দেশে ইছলাম প্রচারের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের পূর্ববর্তী লেখকগণের প্রায় সকলেই প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, শেখ জায়নুদ্দীনের স্বনামখ্যাত তোহফাতুল মোজাহেদীন পুস্তকে (১) মরহুম মাওলানা ছৈয়দ ছোলায়মান ছাহেবও মালাবার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন (২)

ভারত রাষ্ট্রের মাদ্রাজ প্রদেশের একটি জেলার নাম মলাবার বা মালাবার, ভৌগোলিক পরিভাষায় অনেক সময় সম্পূর্ণ উপদ্বীপটাকে মালাবার বলা হয়। আরব ভৌগোলিকগণের অনুলিখনে مليبار; এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে।

'আধুনিক গ্রীকদিগের 'মলি (Mali) শব্দে বর্তমান মালাবার নামের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ মালাবার নাম আরববাসী কর্তৃক প্রদত্ত হয়" বিশ্বকোষ সম্পাদকের এই সিদ্ধান্তটা খুবই সঙ্গত। আমাদের মতে মালাবার আরবী ভাষার শব্দ, মলয় + আবার = মালাবার। আরবী অনুলিখনে ملى মলয় + আবার। মলয় মূলতঃ একটি

---

১ تحفة المجاهدين فى بعض احوال البرتكاليين - تاليف الفقيه الشيخ زين الدين -

২ عربون كى جهاز رانى -

পর্ব্বতের নাম, আবার অর্থে কূপপুঞ্জ, জলাশয়। আরবরা এই দেশকে معبر মা'বার বলিয়া থাকেন। উহার অর্থ, অতিক্রম করিয়া যাওয়ার স্থল—পার ঘাট। আজকাল-কার ভূগোলে পূর্ব ঘাট ও পশ্চিম ঘাট। যেহেতু আরব বণিক ও নাবিকরা এই ঘাট দুইটি পার হইয়া মাদ্রাজে ও হেজাজ প্রদেশে যাতায়াত করিতেন এবং মিছর হইতে চীন দেশে ও পথিপার্শ্বস্থ অন্যান্য নগরে বন্দরে গমনাগমন করিতেন, এইজন্য তাঁহারা এই দেশকে মা'বার বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

এই নাম দুইটি হইতে ইহাও জানা যাইতেছে, এই দেশের সহিত তাঁহাদের পরিচয় অতি পুরাতন এবং সম্বন্ধ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ।

বস্তুতঃ ইছলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার বহু পূর্বে বহু আরব এই দেশে আগমন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের বহু লোক এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া আসিতে-ছিলেন, ফলতঃ স্বীকার করিতে হইবে, আরবরা এদেশে বসবাস স্থাপনের পর তাহার পুরাতন নাম পরিবর্ত্তিত হওয়া ও নূতন আরবী নাম প্রবর্ত্তিত হওয়া সম্ভবপর হইয়া-ছিল। এখানকার মুছলমানেরা মোপলা-নামে পরিচিত। তাঁহাদের পরিচয় পরে দেওয়া হইবে। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু জানাইয়া রাখিতেছে যে, ছোট বড় নৌকা চালানই তাহাদের জীবিকা অর্জনের প্রধান অবলম্বন ছিল। মাছ ধরা, মাল ও যাত্রীবহন করার জন্য তাঁহাদিগকে অনেক সময় নদনদী এমন কি সমুদ্রেই অবস্থান করিতে হইত। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাহাদিগকে রুজী রোজগারের জন্য অনেক সময় ভারত মহাসাগর পার হইয়া আরব দেশে যাতায়াত করিতে হইত, পুরাতন আত্মীয়তার মায়াও হয়তো তাহাদের অনেকে শীঘ্র কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। দেবল্ বা করাচী শহরে আজও মাক্রানীদের ভিড় দেখিতে পাওয়া যায়।

মোহাম্মদ মোস্তাফা দুনয়ায় আগমন করিয়াছিলেন আল্লার দেওয়া কতকগুলি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সঙ্গে করিয়া। শৈশব কালেও তিনি কোনো পুতুল-প্রতিমার নিকট মাথা নত করেন নাই। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি একটা শক্তিশালী জমায়াত গড়িয়া তুলিলেন আরবদিগের সর্বনাশী গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য। তাঁহার অসাধারণ সাধুতা, সততা ও সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া কোরেশ সমাজ তাহাকে সম্বোধন করিত আল্-আমীন বলিয়া। নবুয়ত লাভের পর হইতে দুনয়ার দিকে দিকে তাঁহার আলোচনা আরম্ভ হইয়া যায়—শত্রুভাবে বা মিত্রভাবে। বলা বাহুল্য, এই শুভ সংবাদটি মালা-বারী আরবদিগের ও অন্যান্য অধিবাসীগণের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না।

আরব নাবিক ও বণিকগণ সদাসর্ব্বদা এই পথ দিয়া বঙ্গদেশ ও কামরূপ হইয়া চীন দেশে যাতায়াত করিতেন। এই মালাবারই ছিল তাঁহাদের মধ্যপথের প্রধান বন্দর। এখানকার মোহাজেরদিগের ভাষাও ছিল আরবী। সুতরাং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার ও ইছলাম ধর্মের সকল প্রকার বিবরণ যে, তাঁহারা যথাসময় সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে ইহাও

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আরব বণিকরাই ছিলেন হিজরীর সপ্তম শতক পর্যান্ত, এশিয়া ও আফ্রিকায় ইছলাম প্রচারের প্রধান উদ্যোগী ও সদা সক্রিয় উপলক্ষ্য। আমার মতে, এই উৎসাহী ও ধর্ম্মপ্রাণ প্রচারকদিগের সংস্রবে আসার ফলেই মালাবারের আরব মোহাজেরগণ, হজরতের জীবনকালে—খুব সম্ভব হিজরী সনের প্রথম দিকেই ইছলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মালাবারের অনারব অধিবাসীদিগের মধ্যে ইছলামের প্রসার আরম্ভ হয়, ইহার কিছুকাল পরে—স্থানীয় রাজার ইছলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে।

হিন্দু সমাজের প্রাচীন শাস্ত্রে ও সাহিত্যে মালাবার সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ দেখা যায়। বিশ্বকোষের সম্পাদক মহাশয় তাহার অনেকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন ; সেগুলির অধিকাংশই মহাভারত ও পুরাণাদি পুস্তক হইতে উদ্ধৃত পরশুরামের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে কতকগুলি উদ্‌ভট উপকথা ছাড়া আর কিছুই নহে। তবে এই কোষকার নিজে মালাবারের হিন্দু রাজা সম্বন্ধে একটা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন ঃ—পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, চেরর রাজ্যের শেষ রাজা, চেরুমাল পেরুমাল্ ইচ্ছাপূর্ব্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মুছলমান ধর্ম্ম গ্রহণ অভিলাষে মক্কা নগরীতে গমন করেন (বিশ্ব, ১৪—২৩৪)।" শেখ জইনুদ্দীন কৃত তোহফাতুল মোজাহেদীন পুস্তকেও একজন রাজার মক্কা গমন, তাঁহার হজরত রাছুলে করীমের খেদমতে উপস্থিত হওয়া এবং স্বেচ্ছায় ইছলাম গ্রহণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বর্ণনার এক অংশে যে সকল রাবী ও রেওয়াতের উল্লেখ করা হইয়াছে, রেজাল শাস্ত্র অনুসারে পরীক্ষা করিয়া সেগুলির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে সকল সংস্কার ও প্রবাদের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, সেগুলিকে অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার সমর্থনও আমরা করিতে পারিতেছি না। তোহফার মাননীয় লেখক উপরোক্ত বিবরণের প্রথম অংশ সম্বন্ধে নিজেও সন্দেহের আভাস দিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের পাঠকদিগকে বিবরণের দ্বিতীয় অংশের গুরুত্বটাও স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন।

তাঁহার এই বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে যে, মালাবারের রাজা যে মক্কায় ছফর করিয়াছিলেন এবং হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট ইছলামের বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্থানীয় মুছলমানদিগের মধ্যে ইহাই মশহুর ছিল···"রাজা কিছুকাল হজরতের খেদমতে অবস্থান করিয়া দেশে ফিরিয়া আসার সময় "শহর" নামক স্থানে এন্তেকাল করেন—এই বিবরণটা মালাবারের মুছলমান ও অমুছলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাবে মশহুর হইয়া আছে। তবে স্থানীয় অমুছলমানরা বিশ্বাস করে যে, রাজাকে উর্দ্ধে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, তিনি আবার দুনয়ায় ফিরিয়া আসিবেন।"

স্থান কালাদির খুটিনাটি বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, এবং সেগুলিকে অবিশ্বাস্য

৭—

বলিয়া গৃহীত হইলেও, রাজার মক্কায় যাওয়ার, হজরতের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার এবং কিছুকাল মক্কায় অবস্থান করার পর দেশে ফিরিয়া আসার জন্য ছফর করার—বিবরণকে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার কোন কারণ নাই। মুছলমান-অমুছলমান নির্ব্বিশেষে একটা দেশের সমস্ত অধিবাসী আবহমানকাল হইতে যে ঐতিহ্যকে সমবেতভাবে বহন করিয়া আসিতেছে, তাহাকে অনৈতিহাসিক ও ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কোনও মতে সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেনা। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে বিবেচ্য হইতেছে বিশ্বকোষের বিবরণটি। কোষকার বলিতেছেন—"পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, চেরর (=মালবার) রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমাল পেরুমাল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, মুছলমান ধর্ম গ্রহণাভিলাষে মক্কানগরীতে গমন কারন...।"* সুতরাং মালাবার রাজ্যের রাজার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সিংহাসন ত্যাগ করা, ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করা এবং হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া ইছলাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করার বিবরণকে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া আদৌ সঙ্গত হইতে পারে না।

ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে একজন রাজার এই ব্যাকুলতার বিভিন্ন কারন ছিল। তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে বৌদ্ধ ও জৈনদের মতবাদ, তাহাদের উপর হিন্দু পণ্ডিত-গণের নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং পক্ষান্তরে কএকজন মুছলমান সাধুপুরুষের সাক্ষাৎলাভ ও তাঁহাদের মুখে হজরতের ও ইছলাম ধর্ম্মের পরিচয় লাভ। অন্যান্য স্থানে অতি অল্প সময়ে ইছলামের প্রভাব ও প্রসার বৃদ্ধির প্রধান কারণও ছিল ইহাই। এই শ্রেণীর বিষয়গুলির সম্যক বিচার ও আলোচনার জন্য স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা হওয়া উচিত।

মোপলাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

মালাবারের অধিবাসী মোপলাদের সম্পর্কে বিশ্বকোষ রচয়িতা বলিতেছেন: ইহারা অধ্যবসায়শীল, কর্ম্মক্ষম এবং বর্দ্ধিষ্ণু।…ইহাদের অবয়ব সুগঠিত ও বলিষ্ঠ…ইহারা দেখিতে সুশ্রী…ইহাদের ন্যায় পরিশ্রমী দ্বিতীয় জাতি ভারতবর্ষের আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না।…সাহসিকতায় ইহারা চিরপ্রসিদ্ধ।…ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ধীবর জাতীয়।… আরবের সহিত বাণিজ্য এবং স্বদেশীয় ধীবরদিগকে আরবীয় ধর্ম্মমতে দীক্ষা দানই ইহাদের প্রধান কর্ম্ম।…ইহারা শ্মশ্রু ধারণ করে এবং কেশ কর্ত্তন করে। সকলেই মস্তকে টুপী দেয়।…ইহারা স্বভাবতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।… (বিশ্বকোষ—১৪ খণ্ড, ৬১৭ পৃঃ)

মালাবারে নির্ম্মিত মছজিদের তালিকা

১। প্রথম মছজিদ পেরুমলের রাজধানী কর্ণক্লোর (কোড়ঙ্গনুর) বা ক্রাঙ্গানুরে নির্মাণ করেন মালেক এবনে দীনার।

---

*(১৪—২০৪)। চেরর ও কেরল—মালাবারের প্রাচীন নাম।

২। ২য় মছজিদ নির্মিত হয় ত্রিবাঙ্কোড়ের অন্তর্গত কওলাম বা কোলমে (বা কুইলনে)।

৩। ৩য় মছজিদ নির্মাণ করেন ডিলি পর্ব্বতে (বা হিলী মারাওয়াতে)।

৪। ৪র্থ মছজিদ নির্মিত হয় দক্ষিণ কানাডার অন্তর্গত বুর্কবে (বা পাকনুরে)।

৫। ৫ম মছজিদ মঙ্গলোর নগরে নির্মিত হয়।

৬। ৬ষ্ঠ মছজিদ তেল্লীচেরীর অন্তর্গত ধর্মপত্তন (বা দরমফতন) নগরে।

৭। ৭ম মছজিদ নির্মিত হয় বেপুর রেলটার্মিনাসের নিকটবর্ত্তী চালিয়াম (বা শালিয়াত) নগরে।

৮। ৮ম মছজিদ জৈফত্তন (বা জরমফতনে) যাহার বর্তমান নাম হইতেছে স্বরূ-কুণ্ডপুরম। ইবনে বতুতা খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে এই মছজিদের উল্লেখ করিয়াছেন।

৯। ৯ম মছজিদ পন্থারিনীতে (বা ফন্দারিনায়) নির্মাণ করা হয়।

১০। কঞ্জরকোট নামক স্থানে ১০ম মছজিদ নির্মিত হয়।

বিশ্বকোষ প্রণেতা বলেন: মছজিদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে এতদ্দেশে মুছলমান প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সকল মছজিদের ব্যয়ভার বহনের জন্য অনেক সম্পত্তিও প্রদত্ত হইয়াছিল।

...ঐ সময়ে উপকূলবাসী মুছলমানগণের এবং ইছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত দেশীয় অধি-বাসীদিগের সংখ্যায় পরিবৃদ্ধি হইয়াছিল। ক্রমে তাহারা রাজ্য মধ্যে প্রভাবসম্পন্ন হইয়া উঠে।

(বিশ্বকোষ (১৪), ৬১৮ পৃষ্ঠা ও তোহফাতুল মোজাহেদীন ২৩ ও ২৪ পৃঃ)।

৯ম অধ্যায়

সিন্ধু বিজয়

সিন্ধুর ইতিহাস আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে আসে রাজা দাহীরের কথা আর "এবনে কাছেমের" বিজয় কাহিনী। অথচ প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু অভিযানের কারণ উপস্থিত হইয়াছিল, মোহাম্মদ এবন কাছেমের পূর্বে, ১৫ হিজরীর মধ্যভাগে। পক্ষান্তরে কাছেমের পূর্বে আরও কয়েকটা যুদ্ধও হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার কোনো কোনোটায় মুছলমানদিগকে অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এমন কি একবার মোছলেম ফওজকে সমগ্রভাবে শাহাদত বরণ করিতে হইয়াছিল। সংক্ষেপে, এই অভিযানের সূচনা হয় হজরত ওমরের খেলাফতের প্রথম অবস্থায় আর তাহা শেষ হয় হজরত আলীর খেলাফতের সময়। সুতরাং এই দীর্ঘ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সার বালাজরীর ফোতুহুল-বোলদান হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

ইছলামের দ্বিতীয় খালীফা ১৫ হিজরীতে ওছমান এবনে আবুল-আবী ছাকাফীকে বাহ্‌রায়েন ও আম্মানের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। এই নিয়োগের পরেই, ওছমান নিজের ভাই হাকামকে বাহ্‌রায়নের কর্ত্তারূপে নিযুক্ত করিয়া নিজে চলিয়া গেলেন আম্মানে। তথা হইতে তিনি একটি সৈন্যবাহিনী ভারত সীমান্তে প্রেরণ করেন। উক্ত অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি পুনরায় তাঁহার ভ্রাতা মুগীরাকে দেবল (বর্ত্তমান করাচী) অঞ্চলে অভিযানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং মুগীরা তথায় গমন করিয়া দুশমনের মোকাবেলা করতঃ সফলতা লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তৃতীয় খালীফা ওছমান এবন আফ্‌ফান খেলাফতের আসনে সমাসীন হইলে তিনি আবদুল্লাহ এবনে আমেরকে এরাকের গভর্ণর নিযুক্ত করেন এবং তৎকালীন ভারত-সীমান্তের সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দান করেন। তিনি কার্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই হাকিম এব্‌ন জবলাহকে উক্ত তথ্য সংগ্রহে প্রেরণ করেন। হাকিম ভারত সীমান্তে পৌঁছিয়া তথাকার তথ্য ও তত্ত্ব অবগত হইয়া যথাসময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং গবর্ণরের নির্দেশে কতিপয় সঙ্গীসহ হাজির হন মদীনায় খালীফার দরবারে। খালীফা তাঁহার নিকট উক্ত সীমান্ত অঞ্চলের বিবরণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন :

ماؤها وشل وثمرها دقل ولصها بطل ان قل الجيش بها ضاعوا وان كثروا جاعوا -

সেখানে পানি অপ্রচুর, খাদ্যশস্য অপর্যাপ্ত এবং সেখানে ডাকাতের দল অতি দুর্ধর্ষ, যদি সৈন্যসংখ্যা স্বল্প হয় তবে তথায় তাহারা হালাক হইবে, পক্ষান্তরে সংখ্যায় তাহারা অধিক হইলে খাদ্যাভাবে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

অতঃপর ৩৮ হিজরী পর্য্যন্ত পাক-ভারত অভিমুখে আর কোন অভিযান করা হয় নাই। ৩৮ হিজরীর শেষ ভাগে এবং ৩৯ হিজরীর প্রথম দিকে চতুর্থ খালীফা আলী এব্‌ন আবিতালেবের সময়ে, তাঁহার অনুমতিক্রমে হারিছ এব্‌নে মুর্‌রা আবদী সিন্ধু সীমান্তে অভিযান আরম্ভ করেন এবং যথেষ্ট সফলতা লাভ করেন। তিনি প্রচুর গনিমতের মাল প্রাপ্ত হন এবং শত্রুদের হতাহত করা ছাড়াও তিনি তাহাদের বহু লোক বন্দী করেন। এমন কি একদিনে তিনি তাঁহার সৈন্যের মধ্যে এক সহস্র বন্দীকে বণ্টন করিয়া দেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সিন্ধুর অন্তর্গত 'কয়কান'* নামক স্থানে উপস্থিত হইলে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হন এবং সন ৪২ হিজরীতে অধিক সংখ্যক সৈন্যসহ তথায় শাহাদত বরণ করেন।

অতঃপর ৪৪ হিজরীতে আমির মোআবিয়ার শাসনকালে মোহাল্লাব এব্‌ন আবুছুফ্‌রা উক্ত সীমান্ত দেশ আক্রমণ করেন। তিনি বিজয়ী বেশে মুল্‌তান ও কাবুলের মধ্যবর্ত্তী বান্না এবং আহ্‌ওয়াজ নামক স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে তিনি স্থানীয় শাসকদের সহিত কঠোর সংগ্রামও করিয়াছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণ বশতঃ তাঁহার এই অভিযান এখানেই সমাপ্ত হইয়া যায় এবং তিনি তথায় ইন্তেকাল করেন। মোহাল্লাবের ইন্তেকালের পর আমীর মোআবিয়া, আবদুল্লাহ এব্‌নে ছওয়ারকে প্রেরণ করেন। তিনি ভারত সীমান্তে আক্রমণ করতঃ প্রচুর গনিমত হাছেল করেন এবং উক্ত মাল হইতে মোআবিয়ার জন্য একটি কয়কনি অশ্ব উপঢৌকন-স্বরূপ লইয়া যান। কিছুদিন আমীরের নিকট অবস্থান করার পর তিনি পুনরায় তথায় গমন করেন এবং তুর্কী দুর্ব্বৃত্তের অতর্কিত আক্রমণে শহিদ হন। তারপর আজ্‌দ গোত্রীয় রাশেদ-এবন আমর জদীদী কয়কানে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া উহা পুনর্দখল করিয়া লন। কিন্তু কিছুদিন পরই 'ময়দ-দেবল' নামক স্থানের অভিযানে তিনি শহীদ হন এবং ছেনান এবন ছলমাহ্‌, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন আর উহা জয় করিয়া দুই বৎসর তথায় অবস্থান করেন। অতঃপর আব্বাছ এবনে জিয়াদ, মুন্‌জির এবনে জরুদ আবদী হিন্দু সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন এবং বিজয়মাল্যে ভূষিত হন।

ঐতিহাসিক বালাজরী আরও বলিয়াছেন, হাজ্জাজ এবন ইউছুফ ছকফী এরাকের গভর্ণর নিযুক্ত হইলে তিনি সিন্ধু অভিযানের উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ এবন হারুন নমরী, উবায়দুল্লা এবন নবহান ও বোদায়ল এবন তোহফা বজলীকে পর পর নিয়োজিত করেন। অতঃপর ৯৩ হিজরীতে মোহাম্মদ এবনে কাছেমকে তথায় সাজ ছামানে সজ্জিত করিয়া প্রেরণ করেন এবং তাঁহার দ্বারাই সিন্ধু বিজয় সমাপ্ত হয়। মোহাম্মদ এবন কাছেমের এই অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল জল ও স্থল উভয় পথে।

---

* কয়কান : খোরাছানের নিকটবর্ত্তী সিন্ধু প্রদেশের একটি শহর।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে পাঠক অবগত হইতে পারিয়াছেন যে, পাক-ভারত অভিমুখে ইছলামের অভিযান মোহাম্মদ এবন কাছেম হইতেই আরম্ভ হয় নাই বরং খলীফা ওমরের যুগ হইতেই উহার সুচনা হইয়াছিল। হজরত ওছমানের সময়ে থানা, ভরুজ দেবলের উপর মুছলমানেরা তিন তিনবার সামুদ্রিক আক্রমণ চালাইয়াছিলেন বলিয়া মরহুম আল্লামা ছৈয়দ সোলায়মান নদভী উল্লেখ করিয়াছেন। *

মোহাম্মদ এবন কাছেম বিভিন্ন স্থান জয় করিতে করিতে রোজ শুক্রবারে সিন্ধুর উপকুল অঞ্চল দেবল বন্দরে উপস্থিত হন। এই সময়ই সমুদ্র পথে প্রেরিত রসদ-পত্র বোঝাই জাহাজগুলিও তথায় পৌঁছিয়া যায়। অতঃপর তিনি দেবলের সর্ববৃহৎ মন্দির আক্রমণ করেন এবং রণ কৌশলে তাহা জয় করিয়া ফেলেন। এই দেবল নগরে মোহাম্মদ এবন কাছেম মুছলমানদের জায়গীরের ব্যবস্থা করেন, মছজিদ নির্মাণ করেন এবং তথায় চারি হাজার মুছলমানের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। অতঃপর তাঁহার জনৈক সৈন্যকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তিনি পুনরায় অগ্রসর হইতে থাকেন। তিনি যে স্থানেই গমন করিতেন সেই স্থান জয় করতঃ তথায় একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতেন। রাছেল নামক স্থানে পৌঁছিয়া তিনি সুকৌশলে একটি বিপজ্জনক সেতু অতিক্রম করেন। রাজা দাহের তথায় গোপনে অবস্থান করিতেছিলেন। এই স্থানে মোহাম্মদ এবন কাছেম তাঁহার সহিত কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে তাঁহার সহিত অন্যান্য সৈন্য ছাড়াও চারি হাজার জাঠ সৈন্যও ছিল বলিয়া ঐতিহাসিক বলাজরী লিখিয়াছেন। রাজা দাহিরের নিহত হওয়ায় সমস্ত সিন্ধু প্রদেশই মুছলমানদের অধিকারভুক্ত হইয়া যায়। মোহাম্মদ এবন কাছেম পুরাতন ব্রাহ্মণাবাদ জয় করিয়া যখন অগ্রসর হইতেছিলেন তখন ছাওয়ান্দরবাসীরা পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বলাবাহুল্য যে, ছাওয়ান্দরবাসীরা সকলেই তখন মুছলমান ছিলেন। মোহাম্মদ এবনে কাছেম তাঁহাদের সহিত আপোষ করিয়া অন্যান্য বহু স্থান জয় করতঃ অবশেষে পশ্চিম পাঞ্জাবের বিখ্যাত মুলতান নামক স্থানে উপস্থিত হন ও তাহা জয় করেন। (ফতুহুল বোল্দান, ৪৪১—৪৪৫পৃঃ)

বলাজরীর উল্লিখিত বর্ণনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, মোহাম্মদ এবনে কাছেমের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বেই মুছমানেরা পাক-ভারত উপমাদেশে অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং ইহার বহু পূর্ব হইতেই পাক-ভারতের বুকে ইছলাম ধর্ম জারী হইয়া গিয়াছিল। আমরা পূর্বেই ইহা উল্লেখ করিয়াছি। আর ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, আরব বণিক ও নাবিকদের ঐকান্তিক চেষ্টায় পাক-ভারতে সাধারণতঃ ইছলাম আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। এমন কি আরব বণিক, আরবী নাবিক এবং মুছলমান সাধুদের দ্বারা যে বাঙ্গলা দেশেও ইছলাম প্রচার লাভ করিয়াছিল, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

* আরবোঁ-কী জাহাজরানী, ৫২ পৃঃ।

১০ম অধ্যায়

আফগানিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশে ইছলাম ধর্ম্মের প্রচার ও প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাহার গতি মন্দিভূত হইয়া পড়ে নাই, বরং একটা সর্ব্বব্যাপী বন্যা-স্রোতের ন্যায় তাহা জল ও স্থল উভয় পথে সমগ্র ভারতভূমিকে প্লাবিত করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল বঙ্গোপসাগরের সমস্ত দ্বীপপুঞ্জকে ও তাহার উপকূলস্থিত সমতলভূমিগুলিকে। ঐতিহাসিকগণ এখানে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িতেছেন এবং ইহার কারণ নির্দ্ধারণের জন্য নানা প্রকার সম্ভাবনার উল্লেখ করিতেছেন। কিন্তু কোনো সার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না।

আমাদের মতে, সত্যদর্শনের ও পূর্ণদর্শনের মুক্ত মনোবৃত্তির অভাব অমুছলমান ঐতিহাসিকগণের এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ। ইহা ছাড়া, আকস্মিক ভাবে সমাগত এই নূতন ধর্ম্মের প্রতি একটা স্বাভাবিক বিদ্বেষ ভাব স্থানে স্থানে তাঁহাদের বিচারবুদ্ধির বিকারের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, অমুছলমান লেখকগণের মধ্যে এমন সাধু প্রকৃতির লোকেরও অভাব নাই, যাঁহারা প্রকৃত তথ্যের সন্ধান লওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন এবং বহু ক্ষেত্রে সফলও হইয়াছেন। আমরা ভবিষ্যতে বিস্তারিতভাবে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে জানাইয়া রাখিতেছি যে, ইছলাম ধর্ম্ম যে ভারতে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে এমন অসাধারণ সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রধানতম কারণ হইতেছে ইছলাম ধর্ম্মের সহজাত আধ্যাত্মিক শক্তি। অন্য কারণগুলি হইতেছে আনুসঙ্গিক।

ইছলাম ধর্ম্মের মূলনীতি ও প্রধান আদর্শ হইতেছে—অনাবিল এক ঈশ্বরবাদ। নরপূজা, প্রতীকপূজা, অবতারবাদ এবং পৌত্তিলিকতার অভিশাপগুলিকে আল্লার দুনিয়া হইতে ধুইয়া মুছিয়া সেই সর্বশক্তিমান, সর্বমঙ্গলময় একমাত্র আল্লার পূজাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাহার সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ—মানব সমাজকে তাঁহারই নামে এক অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃসমাজে পরিণত করা। হজরতের ইন্তেকালের পর আরবরা নিজেদের আবাসভূমি হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন প্রধানতঃ এই আদর্শের প্রেরণায় আত্মাহারা হইয়া।

ডক্টর ঈশ্বরীপ্রসাদ তাঁহার ইতিহাসে লিখিতেছেন—

"The earliest Muslim invaders of Hindustan were not the Turks but the Arabs, who issued out from their desert homes after the death of the great Prophet to spread their doctrine throughout the world, which was, according to them, "the key of heaven and hell." Wherever they went, their intrepidity and vigour roused to the highest pitch by their proud feeling of a common nationality and their zeal for the faith, enabled the Arabs to make themselves masters of Syria, Palestine, Egypt Persia

within the short space of twenty years. The conquest of Persia made them think of their expansion eastward and when they learnt of the fabulous wealth and idolatry of India from the merchants who sailed from Shiraz and Hurmuz and landed on the Indian coast, they discounted the difficulties and obstacles which nature placed in their way, and determined to lead and expedition to India, which at once received the sanction of religious enthusiasm and politcal ambition. The fiist recorded expedition was sent from Uman to pillage the cost of India in the year 636-37 A.D. during the Khilafat of Umar.

অর্থাৎ হিন্দুস্থানের প্রথম মোছলেম বিজেতাগণ তুর্কী ছিলেন না; বরং তাঁহারা ছিলেন আরবের অধিবাসী। মহানবীর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই এই আরবগণ ইছলামী মতবাদের প্রচার ও প্রসার করে সারা দুনিয়ার বুকে ছড়াইয়া পড়েন। তাবলীগ পরিচালনার মধ্যেই আছে আখেরাতের ভাল ও মন্দ, এই ছিল তাঁহাদের বিশ্বাস। এই আরবগণ যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই শঙ্কাহীন দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। এক জাতীয়তাবাদের গৌরবময় প্রেরণাকে সম্বল করিয়া এই ভাবেই, সত্যানুসারী আরবগণ মাত্র কুড়ি বৎসরের মধ্যেই ছিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিছর ও পারস্যের অধিপতি হইতে পারিয়াছিলেন। পারস্য দখলের পর আরবগণ তাহাদের এই বিজয়কে পূর্বদিকে আরো সম্প্রসারিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। সিরাজ ও হরমুজের সওদাগরগণ তখন তেজারতী কর্যোপলক্ষে ভারতের উপকুলবর্তী অঞ্চলে যাতায়াত করিতেন। আরবগণ তাঁহাদের মুখেই ভারতের প্রাচুর্য ও উহার অধিবাসীদিগের বোতপরস্তীর খবর পাইয়াছিলেন। প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়াই তাঁহারা ভারতে এক অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য, এই অভিযানের ব্যাপারে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় উভয়বিধ সমর্থনই পাওয়া যায় এবং ৬৩৬—৩৭ খৃষ্টাব্দে হজরত উমরের খেলাফত আমলেই, ওমান হইতে ভারতের উপকুলভাগে আরবদিগের প্রথম অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ রহিয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইছলাম প্রবর্তক মহানবী মুছলিম সমাজকে জ্ঞানাহরণের জন্য বিভিন্ন দেশে এমন কি সুদূর চীন দেশেও ভ্রমণ করতে নির্দেশ দিয়াছেন, এরূপ একাধিক হাদীছ উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনুরূপভাবে রছুলুল্লাহ তাঁহার অনুচর ছাহাবাগণকে পাক-ভারতে অভিযান পরিচালনা করিতেও উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া হাদীছের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা নমুনা স্বরূপ নিম্নে একটি হাদীছ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

عن ابی هريرة قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فان ادركتها انفق فيها نفسی ومالی وان قتلت كنت افضل الشهداء وان رجعت فانا ابوهريرة المحرر-

ছাহাবী আবুহোরায়রা বলিয়াছেন, "রছুলুল্লাহ আমাদিগকে হিন্দ-অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়াছেন।" অতএব যদি আমি সেই সময় জীবিত থাকি তবে আমি তাহাতে আমার জান ও মাল ব্যায় করিতে কুণ্ঠিত হইব না। ইহাতে যদি আমাকে কতল করা হয় তবে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদে পরিগণিত হইব আর যদি ছহীছালামতে ফিরিয়া আসি তবে আমি হইব দোযখ-মুক্ত আবহোরায়রা (নাছায়ী (২) ৬২ পৃঃ)।

উল্লিখিত হাদীছে মুছলিম জাতিকে শুধু পাক-ভারত অভিযানে উদ্বুদ্ধ করাই হয় নাই বরং একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে পাক-ভারত-অভিযানের অপরিহার্যতাও ঘোষণা করা হইয়াছে। অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে মুছলমানেরা পাক-ভারতে ইছলামের অভিযান পরিচালনা করিবেন তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

১১শ অধ্যায়

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়টি সম্বন্ধে সুসঙ্গত ভাবে বিচার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে, বাংলার হিন্দু সমাজের বিশ্বাস ও সংস্কারাদি সম্বন্ধে যেসব ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্য গ্রহণ করার আবশ্যক হয়, সর্বপ্রথমে তাহা অবগত হওয়ার বিশেষ কোনো সুযোগই আমাদের নাই। আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, বঙ্গীয় মোছলেম সমাজের সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে বঙ্গ দেশের ও তাহার সমসাময়িক হিন্দু অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সম্যকভাবে জ্ঞান লাভ করা বিশেষ আবশ্যক। অন্যথায় কোন্ জাতি কোন্ জাতির দ্বারা কি পরিমাণ প্রভাবান্বিত হইয়াছে, অথবা আদৌ প্রভাবান্বিত হয় নাই, তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হইবে না।

উদাহরণস্বরূপ প্রথমে বঙ্গদেশের ইতিহাসের কথাই আলোচনা করা যাক। এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে প্রথমে নজরে পড়িবে বলি রাজার ও অন্ধ ঋষির পাপাচারের কথা। হিন্দু শাস্ত্রকাররা স্বচ্ছন্দ মনে জানাইয়া দিতেছেন যে—পুরু রাজের ২২ অধস্তন পুরুষে মহারাজ বলি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধর পাঁচপুত্র—অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, ও কলিঙ্গ। ইহারাই মহারাজ বলির ক্ষত্রীয় সন্তান।" পরে কিন্তু ইহারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন (হরিবংশ)।

এই ব্যবস্থার বৈধতা সপ্রমাণ করার জন্য লেখকগণ মহাভারতের ১০৪ অধ্যায়ের বরাত দিয়া বলিতেছেন:—ভূলোক পরশুরাম কর্ত্তৃক (২১ বার) নিক্ষত্রীয় হওয়ার পর অনেক ক্ষত্রীয় নারী, ব্রাহ্মণ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লইলেন। বেদের বিধান এই যে, যে পানি গ্রহণ করে ও তাহার ক্ষেত্রে যে সন্তান উৎপাদন করে, সেই সন্তান তাহার (ক্ষেত্র স্বামীর) হইবে। অতএব ধর্ম্মাচরণ ভাবিয়াই ক্ষত্রীয় পত্নীগণ ব্রাহ্মণের সহবাস করিয়াছিল। এইরূপ ক্ষেত্রজ পুত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য মহাভারতকার এই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন।"

ইহার পর আসল কথা আসিতেছে—"ক্ষত্রীয়রাজ বলির পুত্র সন্তান হয় নাই। তিনি একদিন গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া দেখিলেন এক অন্ধঋষি নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছেন। সেই অন্ধঋষির নাম দীর্ঘতমা। ধার্মিক রাজা অবিলম্বে তাঁহাকে তুলিয়া নিজ প্রাসাদে আনিলেন। ধার্মিক নরপতি তাঁহার ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করার জন্য ঋষিকে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে তাঁহার মহিষীর গর্ভে দীর্ঘতমা পাঁচ পুত্রের জন্ম দিলেন। এই পঞ্চ পুত্রের নাম অনুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম ইত্যাদি পাঁচটা দেশের নাম হইল।

শুধু এইটুকু করিয়া, 'বিশ্বৈব কুটম্বকম' নীতির প্রচারকরা ক্ষান্ত হয় নাই। সংস্কৃত

সাহিত্যে নিন্দা ও কুৎসামূলক যতগুলি কদর্য্য বিশেষণ আছে, বঙ্গদেশের আধিবাসী-দিগের প্রতি সে সমস্তের প্রয়োগ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। শাস্ত্রকারগণ **বাংলা দেশের অধিবাসীদিগকে রাক্ষস, পিশাচ, অসুর প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।** এমন কি "ভগবান মনু" ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, তীর্থ যাত্রা ব্যতীত অঙ্গ বঙ্গাদি দেশে কোনও আর্য্য সন্তান গমন করিতে পারিবেনা। তীর্থযাত্রা ব্যতীত গমন করিলে তাহাকে পুনরায় সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে। "ভগবান" মনুর নির্দ্দেশ ইহাই।

কিন্তু এ সম্বন্ধে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। ইছলাম ধর্মের ও তাহার সেবকগণের কল্যাণে বাংলা দেশের ও তাহার অধিবাসীগণের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে একপ্রকার সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

১২শ অধ্যায়

আরব জাতি ও নৌ-বিজ্ঞান

ইছলামের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতে আরববাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইছলাম তাহাদের এই উদ্যমকে দমন করে নাই বরং ইছলাম ও কোরআনের শিক্ষার প্রভাবে অল্পকাল মধ্যেই তাহা আরও সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ফলে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই দলে দলে আরব বণিকগণ মৌসুমী বায়ু ভর করিয়া অসীম সাহসে দুনিয়ার বিভিন্ন সাগরে সমুদ্রে তাঁহাদের বাণিজ্যপোত চালাইয়া দূর দেশন্তরে গমনাগমন করিতে লাগিলেন।

যেহেতু আরব দেশের অধিকাংশ স্থান মরুভূমি, অনুর্ব্বর এবং সর্ব্বদিক হইতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের অনুপযোগী ছিল সেইহেতু স্বাভাবিক ভাবে আরবেরা জল ও স্থল উভয় পথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়া খাদ্যশস্য আমদানী করিতেন। আরবদের আদি ইতিহাস হইতে তাঁহাদের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে অভ্যস্ত হওয়াও প্রমাণিত হয়। খৃষ্টপূর্ব দেড় দুই হাজার বৎসর পূর্বে ইউছুফ নবীকে যে বাণিজ্য কাফেলা সুদূর মিশরে পৌঁছাইয়াছিল তাহারা আরব বণিক ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ফলকথা, প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই আরবেরা নৌ-বিজ্ঞানের সাহায্যে জলপথে এবং উষ্ট্র প্রভৃতির সাহায্যে স্থলপথে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়া আসিতে-ছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। মরহুম আল্লামা সৈয়দ ছোলায়মান নদভী তাঁহার বিভিন্ন মূল্যবান পুস্তিকায় এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে আরবদের নৌ বিজ্ঞান সম্পর্কে মোটামুটী আলোচনা করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করিতেছি।

ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, আরব দেশ একটি উপদ্বীপ বিশেষ। পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর এবং ভারত মহাসাগর দ্বারা উহা তিন দিক হইতে পরিবেষ্টিত। এই কারণেই আরবেরাও তাঁহাদের দেশকে জযীরা বলিয়া আখ্যাত করিতেন। *

অতএব বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সহিত আরবের যোগাযোগের প্রধান পথ ছিল সমুদ্র-পথ এবং এই পথেই আরবেরা ওই সকল দেশের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিতে বাধ্য হন। ইহাতে তাঁহাদের নৌ-বিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। আবিসিনিয়া আরবের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং আরবেরা সমুদ্রপথেই তথায় গমনাগমন করিতেন, ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া চীন সমুদ্রে জাহাজ পরিচালনা করতঃ আরবেরা মহাচীনে নির্মিত দ্রব্য স্বদেশে আনয়ন করিতেন এবং সিরিয়া হইতে রুম সমুদ্রে গমন করিয়া তাঁহারা রুমী ব্যবসায়ীদের সহিত মিলিত হইতেন। অধিকন্তু আরবের সুজলা

---

* মু'জামোল বুলদান (৩) ১০১ পৃষ্ঠা

ফলা এলাকা বাহ্‌রায়ন, এমামা, আম্মান, হাজরমওত ও য়্যামন প্রভৃতি সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত ছিল বলিয়া আরবেরা স্বাভবিক ভাবে নৌ-বিজ্ঞানে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রাগৈছলামিক যুগে আরববাসীদের নৌ চালনা এবং সামুদ্রিক ছফরের বিবরণ তাঁহাদের সাহিত্য, আরবী অভিধান এবং আরবদের কবিত্ব হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইহাতে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, আরববাসীরা সর্বকালেই নৌ-বিজ্ঞানে আর সামুদ্রিক তথ্য সম্বন্ধে বিশেষরূপে ওয়াকেফহাল ছিলেন।

আরবী অভিধানে বাহ্‌র بحر এবং يم ইয়াম্‌ন্ শব্দের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। এই উভয় শব্দের অর্থ হইতেছে সমুদ্র। কোরআন মজীদেও এই উভয় শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। অনুরূপ ভাবে প্রাচীন আরবী সাহিত্যে নৌকা এবং জাহাজের অর্থে سفينة ছফীনাতুন ও فلك ফুল্‌কুন ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন আরবী সাহিত্যে সাধারণতঃ ছফীনাতুন এবং কোরআন মজীদে ফুল্‌কুন শব্দের অধিক ব্যবহার দেখা যায়, আরবী সাহিত্যে যাহাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞানও রহিয়াছে তাহাদের নিকট উহার বিশ্লেষণের প্রয়োজন করেনা। সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, নৌকা এবং জাহাজ পরিচালনা সম্পর্কে আরবী অভিধানে আরও কতিপয় শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরন স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ملاح মল্লাহ জাহাজ বা নৌকা পরিচালক। এই অর্থে داری দারিউনও ব্যবহৃত হইয়াছে।

نوتی নূতী সারঙ্গ خلاسی খালাসী (জাহাজের সাধারণ কর্মচারী), নৌকা অর্থে جارية জারীয়াতুন, বহুবচনে جواری জওয়ারী ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ প্রাচীন আরবী কবিগণ بوصی বূছী নৌকা خلية খলীয়াতুন বৃহৎ নৌকা অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরবী কবিরা বিশেষতঃ যাঁহারা সমুদ্র উপকূলে যাতায়াত করিতেন তাঁহাদের প্রাচীন কবিতায় সমুদ্র আর নৌকার প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা শুধু কতিপয় কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

যুবক কবি তুর্ফা ইছলামের বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে আমাদের দেশের উচ্চতম বিদ্যালয়সমূহে 'ছাবআ মোআল্লাকা' নামক যে আরবী কবিতা সাহিত্য পড়ান হয় তাহাতে তুরফার একটি উচ্চাংগের কবিতাও স্থান লাভ করিয়াছে। উহাতে তিনি তাহার উষ্ট্রর দীর্ঘ গণ্ডদেশের প্রশংসায় বলিয়াছেন,

واتلع نهاض اذا صعدت به ـ
كسكان بوصى بدجلة مصعد ـ

উষ্ট্রী সুদীর্ঘ গণ্ডধারী; যখন সে উহাকে দীর্ঘতা দান করে তখন উহা দেজলা সমুদ্রে চলায়মান নৌকার দুম্বালার (গলই) ন্যায় প্রকাশিত হয়।

يشق حباب الماء حيزومها بها
كما قسم الترب المفائل باليد ـ

(সেই) জাহাজের অগ্রভাগ সমুদ্রের উত্তাল তরংগকে এইভাবে দ্বিখণ্ডিত করিয়া চলিতেছে যেমন মাটির খেলাড়ী (ছেলেরা) মাটির স্তুপকে হস্ত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া থাকে।

সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের সময়কার অভিজ্ঞতাই কবির এই কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে।

জাহেলী যুগের কবি আ'শা কলিয়াছেন,

وما مزبد من خليج الفرات * جون غوارية تلتطم
يكب الخلية ذات القلاع * تدكاد جؤ جؤ ها ينحطم

ফোরাত উপকূলে নীলসমুদ্রে যখন উত্তাল তরংগ প্রবাহিত হয় তখন বাদাম খোলান বৃহৎ জাহাজও উল্টাইয়া যায় যাহাতে উহার অগ্রভাগ ভাংগিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়।

ফোরাত সমুদ্রের ঢেউ এবং বৃহৎ নৌকার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন,

مثل الفرات اذا ما طما -
يقذف بالبوصى وبالماهر -

ফোরাতের ন্যায় যখন উহাতে প্রকাণ্ড ঢেউ উঠে তখন জাহাজ ও নৌকাগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়।

বনু তাগলীব গোত্রের অহঙ্কারী কবি আমর বিন্ কুলছুম বলিয়াছেন,

ملانا البر حتى ضاق عنا -
وموج البحر تملؤه سفينا

আমরা সৈন্যের দ্বারা স্থলভাগ এরূপ পূর্ণ করিয়া দিলাম যে, মাঠ অসঙ্কুলান হইয়া উঠিল এবং সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গকেও আমরা জাহাজে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলাম।

অপর একজন কবি স্বীয় গোত্র লকীজ এবনে আবদুল কয়ছের প্রশংসায় বলিয়াছেন,

لكيز لها البحران والسيف كله
وان ياتها باس من الهند كارب

(আমার গোত্র) লকিজের অধিকারভুক্ত উভয় সমুদ্র এবং তাহার উপকূলবর্ত্তী সমুদয় এলাকা। যদিও তাহারা ভারত সমুদ্র হইতে দুর্ভোগ পোহাইয়া থাকেন।

এই কবিতায় ভারত মহাসাগরের সহিত আরবদের, পূর্ব সম্পর্কও প্রতি-পন্ন হইতেছে।

জনৈক কবি সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন,

مؤاخر فی سماء الیم مقلعة
اذا علت ظهر موج ثم انحدرت

জাহাজগুলি সমুদ্রাকাশে পাল তুলিয়া অতিক্রম করে, একবার ঢেউয়ের উপরে উঠে আবার পরক্ষণেই নীচে নামিয়া আসে।

আরব ইতিহাসের বিশ্বস্ততম ও নির্ভরযোগ্য উপলক্ষ হইতেছে কোরআন মজীদ, যাহা চৌদ্দ শত বৎসর হইতে আজ পর্যন্ত সর্বপ্রকার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের হস্ত হইতে সুরক্ষিত রহিয়াছে। উক্ত মহাগ্রন্থে সমুদ্র এবং সমুদ্রযান সম্পর্কে এত অধিক উল্লেখ রহিয়াছে তাহা আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার আবশ্যক। সংক্ষিপ্ত কথায় বলা যায় যে, কোরআন মজীদের আঠাশটি আয়াতে জলযানের উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে তেইশ আয়াতে فلك 'ফুলকুন' দুই আয়াতে جوار জওয়ারিন্, এক আয়াতে سفينة অপর আয়াতে ذات الواح ودسر যাতে আল্‌ওয়াহিন ওয়া দুছুর' রূপে এবং অপর একটি আয়াতে جارية জারীয়াতুন শব্দে উহার উল্লেখ রহিয়াছে।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনানুসারে নৌকা বা জাহাজের ইতিহাস আরম্ভ হয় হযরত নূহ নবীর সময় হইতে।

হযরত নূহকে জাহাজ নির্মাণের নির্দেশ দিয়া কোরআনে বলা হইয়াছে,

واصنع الفلك باعيننا ووحينا الاية

হে নূহ আমাদের পরিদর্শনে ও আমাদের নিদে'শক্রমে তুমি জাহাজ নির্মাণ আরম্ভ করিয়া দাও (হুদ, ৩৭)।

উক্ত জাহাজটি কিসের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল তাহাও কোরআনের অপর আয়াতের ইঙ্গিতে বুঝা যাইতেছে। আল্লাহ বলিয়াছেন,

وحملناه على ذات الواح ودسر-

আর আমরা নূহকে-(স্বজনগণ-সহ)- আরোহণ করাইলাম তখ্‌তা ও কীলক নির্মিত জাহাজের উপর। (ছুরা কমর, ১৩)

আর্থাৎ নূহকে যে জাহাজে আরোহণ করান হইয়াছিল তাহা ছিল কীলক দ্বারা জড়ানো তখতা বিশিষ্ট। উহা এতই শক্ত ও মজবুত ছিল যে, প্রলয়ঙ্কর ছয়লাবের আকাশতুল্য মহাপ্রকাণ্ড উত্তাল তরঙ্গের আঘাতের পর আঘাতকে উপেক্ষা করিয়া প্রবলবেগে গন্তব্যস্থলের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। কোরআনে বলা হইয়াছে,

وهى تجرى بهم فى موج كالجبال -

এবং তাহাদের সকলকে নিয়া জাহাজ ভাসিয়া চলিল পর্বত পরিমাণ তরঙ্গের মধ্য দিয়া (ছুরা হুদঃ ৪২)।

কোরআন মজীদের অন্যান্য আয়াতে জাহাজের আকৃতি প্রকৃতি ও চলন পদ্ধতি প্রভৃতিকে আল্লার নিদ'শন বলিয়া উল্লেখ করতঃ তাহা দ্বারা মুছল্‌মান সমাজের প্রতি সাধারণভাবে আর আরববাসীদিগের প্রতি বিশেষভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে।

আল্লাহ বলিয়াছেন,

الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون -

আল্লাহ তিনি যিনি তোমাদের মঙ্গলের জন্য সাগরকে তোমাদের বশীভূত করিয়াছেন, যাহাতে জলযানগুলি তাঁহার নির্দেশক্রমে সঞ্চারিত হয় এবং যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ দান লাভ করিতে সচেষ্ট হইতে পার আর যাহাতে তোমরা তাঁহার শোকর-গোজারী করিতে থাক (জাছিয়া : ১২।)

যে উদ্দেশ্য নিয়া তৎকালে জাহাজগুলি পরিচালিত হইত এবং আরবেরা তাহা দ্বারা যে সব স্বার্থ সিদ্ধি করিতেন তাহার ব্যাখ্যা করিয়া কোরআনে বলা হইয়াছে—

وهو الذى سخر البحر لتا كلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون-

এবং সেই তো তিনি (আল্লাহ) যিনি সাগরকে তোমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তোমরা তাহা হইতে তাজা "গোশত" (মাছ) ভক্ষণ করিতে পার এবং ব্যবহার্য্য অলঙ্কার তাহা হইতে বাহির করিতে পার, আর তোমরা দেখিতেছ—সাগরের বুক চিরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে জলযানগুলি, যেন তোমরা (নৌবাণিজ্যের দ্বারা) তাঁহার রহমত লাভ করিতে পার এবং তোমরা যেন তাঁহার শোক্‌রগোজারী করিতে থাক (নহল : ১৪)।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে,

والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس'

এবং সেই জাহাজে আল্লার প্রচুর নিদর্শন রহিয়াছে যাহা মানুষের উপকারের সাজ ও সামান বহন করিয়া সমুদ্র গর্ভে সঞ্চারিত হইয়া থাকে (বকারাহ : ১৬৪)।

সমুদ্রগর্ভ হইতে মূল্যবান মণিমুক্তা ও মানুষের খাদ্যোপযোগী মৎস্য শিকার এবং জনসাধারণের উপকারী খাদ্যসামগ্রী বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী রফতানীর উদ্দেশ্যেই সমুদ্রযান পরিচালিত হইত। আরবের অবস্থিতি আর তথাকার ভূমি অনুর্বর হওয়ার স্বাভাবিকভাবে আরববাসীদিগকে নৌ-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, কোরআনের উল্লেখিত আয়াতগুলির দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আরবদের নৌ-চালনা এবং ইহাতে তাহাদের প্রতি বিশ্বস্রষ্টা আল্লার মহা অনুগ্রহ রহিয়াছে পবিত্র কোরআনে তাহারও বিশদ আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে—আলোচনার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা এখানেই ক্ষান্ত হইতেছি।

বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের অস্বাভাবিক উৎকর্ষের ন্যায় তৎকালে নৌ-যানগুলি ইঞ্জিনের সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত ছিল না, থাকা সম্ভবপরও ছিল না। সুতরাং আরববাসী নাবিকগণ বায়ুর উপর নির্ভর করিয়াই জাহাজ পরিচালনা করিতেন এবং গ্রহ-নক্ষত্র ও উপকূলের বিবিধ চিহ্ন দ্বারা আরব নাবিকগণ জাহাজের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করিতেন। বায়ুর গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল অসাধারণ।

সমুদ্রোপকূল এবং মরুভূমির অধিবাসী হওয়ায় ঝড়-বায়ুর নিদর্শন ও গতি-ধারা সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল।

অনুরূপভাবে আরব বণিকগণ গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও গতিবিধি সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকেফ ছিলেন। এ সম্বন্ধে পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা বিরাট বিরাট গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কীয় "কিতাবুল আন্ওয়া" স্বনামধন্য আবু হানিফা দয়নুরী কর্ত্তৃক ২৮২ হিজরীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়।

আরব বণিকেরা গ্রহ-নক্ষত্রের সাহায্যেই গভীর অন্ধকার রাত্রিতেও দিক নির্ণয় করতঃ দূর-দেশান্তরে জাহাজ পৌঁছাইতে অভ্যস্ত ছিলেন। এসম্বন্ধে আরবদের গভীর পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতা সর্বজনস্বীকৃত। কোরআন মজীদও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছে :—

والقى فى الارض رواسى ان تميد بكم وانهارا وسبلا
لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون

(আল্লাহ তিনি) যিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্ব্বতমালাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যেন তোমাদিগকে নিয়া ঝুঁকিয়া না পড়ে এবং তিনি জলস্থলের পথগুলিকে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তোমরা গন্তব্যপথে চলিতে পার এবং তিনি পথের চিহ্ন-গুলিকেও নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন আর তাহারা নক্ষত্রের সাহায্যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। (আনফাল ১৫-১৬)

শুধু আরবের জন্য নহে বরং বিশ্বের মানুষের জন্য দিকনির্ণয় ও নিজেদের গতিপথ নির্ধারণের উদ্দেশ্যেই নক্ষত্রের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া কোরআন মজীদ ঘোষণা করিয়াছে :—

وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر
والبحر قد فصلنا الايت لقوم يعلمون -

(তিনি আল্লাহ) যিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমরা জল ও স্থলের ভীষণ অন্ধকারে সঠিক পথ নির্ধারণ করিয়া চলিতে পার। জ্ঞানীদের জন্য আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছি স্পষ্ট নিদর্শনগুলি।

১৩শ অধ্যায়

প্রাগ-ইছলামিক যুগ হইতেই আরব জাতি বিভিন্ন কারণে নৌবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন এবং ইছলামের আবির্ভাবের পর তাহার চরম বিকাশও সাধিত হইয়াছিল। আরব জাতির প্রাচীন ইতিহাস, তাঁহাদের সাহিত্য এবং কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়া আমরা পূর্বে তাহা আলোচনা করিয়াছি।

আবিসিনিয়াতে আরববাসীরা শুধু সর্ব্বদা গমনাগমনই করিতেন না বরং তাঁহারা আবিসিনিয়াকে দ্বিতীয় আবাসস্থলে পরিণত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে লোহিত সাগরে সাধারণতঃ রুমীদের নৌ যান চলাচল করিত। ইছলামের অভ্যুদয়ের কিছুকাল পূর্বে রুমীদের একটি ব্যবসায়ী কাফেলা জেদ্দাতে উপনীত হয় এবং তাহাদের জাহাজ জেদ্দার নিকটবর্তী স্থানে ভাঙ্গিয়া যায়। মক্কার কোরায়শ গোত্রীয় লোকেরা উক্ত জাহাজের তক্তা ক্রয় করিয়া কা'বা গৃহের ছাদে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণের "অপরাধে" মক্কা নগরে যখন মুছলমানদের প্রতি চরম অত্যাচার সংঘটিত হইতে লাগিল, মুছলমানেরা সর্ব্বদিকে অত্যাচারিত, উৎপীড়িত হইয়া শত্রুদের আঘাতে জর্জরিত হইয়া পড়িলেন, তখন রাছুলুল্লাহ তাঁহাদিগকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিতে নির্দ্দেশ দিলেন।

নবুওতের পঞ্চম সালে এগার জন পুরুষ এবং চারিজন মহিলার একটি ক্ষুদ্র মুছলিম মোহাজের দল জেদ্দা হইতে দুইটি বাণিজ্যপোতের সাহায্যে আবিসিনিয়া গমন করেন। পরবর্ত্তী সময়ে আশি জন মুছলমানের একটি কাফেলা তথায় হিজরত করিয়া যায়। মক্কার লোকেরা তাঁহাদিগকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের দূত প্রেরণ করেন কিন্ত নাজাশী রাজের ন্যায়নিষ্ঠার ফলে তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

রাছুলুল্লার মদীনায় হিজরতের পর আবিসিনিয়া হইতে কতিপয় মুছলমান পুনরায় মদীনায় হিজরত করিয়া চলিয়া আসেন। হিজরী ৬ সালে রাছুলুল্লা কর্ত্তৃক ইছলামের দা'ওয়াত সম্বলিত চিঠি সহ আমর ইবনে উমাইয়া যুমরী আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজাশীর নিকট প্রেরিত হন। সেই সালেই নাজাশী ষাটজন বিশিষ্ট লোক দ্বারা গঠিত একটি প্রতিনিধি দল রাছুলুল্লার খেদমতে প্রেরণ করেন। যে জাহাজযোগে প্রতিনিধি দল রওয়ানা হইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়। * সপ্তম হিজরী সালে আবিসিনিয়ার কোরায়শী মোহাজের দল মদীনায় রাছুলুল্লার খেদমতে অবস্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মুছলিম কুলজননী উম্মে হাবিবাও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। নাজ্জাশী কর্ত্তৃক তাঁহারা দুইটি বিশেষ জাহাজে প্রেরিত হন। এই জাহাজদ্বয় মদীনার নিকটবর্ত্তী 'জার' (য়্যাম্ব) নামক বন্দরে উপনীত হয়। * এই বন্দরটি লোহিত

---

* তবারী ৩—১১৮২ পৃঃ। * ঐ (৩) ১৫৭১ পৃঃ।

সাগরের আরব উপকূলবর্ত্তী আয়লা বন্দর হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল, এখান হইতে মদীনা ন্যূনাধিক চব্বিশ ঘণ্টার রাস্তা। অনুরূপভাবে য়্যামনের আশআর গোত্রের বায়ান্নজন নওমুছলিম মদীনায় গমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু বিপরীতমুখী ঝড়ো বাতাসে তাহারা আবিসিনিয়ায় গিয়া পৌঁছেন। মক্কানিবাসী মুছলমান মোহাজের পূর্ব্ব হইতে তথায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা পথভ্রষ্ট মুছলমানদের অভ্যর্থনা করেন এবং সপ্তম হিজরীতে তাঁহারা জাহাজযোগে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। খয়বর বিজয়কালে তাহারা তথায় উপনীত হন। এই দলটি আহ্‌লে ছফীনা—নৌকাবাসী নামে খ্যাতি লাভ করেন।

ভূমধ্যসাগরেও আরবেরা সদাসর্ব্বদা নৌকা ও জাহাজ পরিচালনা করিতেন।

লগ্‌ম এবং জুযাম গোত্র সিরিয়া সীমান্তের অধিবাসী ছিলেন। রূমীদের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। ফলে রূমীদের প্রভাবে ইহাদের মধ্যে যাহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, হজরত তমীম দারী ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ইছলাম গ্রহণের পর যখন মদীনায় আগমন করিলেন, তখন তিনি নিজের পূর্ব্বকাহিনী নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, উপরোল্লিখিত গোত্রদ্বয়ের ত্রিশজন লোকসহ তিনি জাহাজে আরোহণ করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাঁহাদের জাহাজখানি দীর্ঘ এক-মাসব্যাপী সমুদ্রগর্ভে ভাসিয়া চলে, অবশেষে উহা ধ্বংস হইয়া যায়। আরোহীরা ছোট ছোট নৌকায় আরোহণ করিয়া জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করেন এবং প্রকাণ্ড ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া তাঁহারা গিয়া পৌঁছেন একটি অজানা দ্বীপে।

উল্লেখিত ঘটনা এবং আমাদের পূর্বালোচনা দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, আরব জাতি সামুদ্রিক এবং নৌ যান পরিচালনায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা যেমন পারদর্শী ছিলেন তেমনি ছিলেন নির্ভীক ও অসম সাহসী, কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ অথবা আরব বিদ্বেষের কারণে বিখ্যাত খৃষ্টান ঐতিহাসিক জর্জি জয়দান আত্তামাদ্দুনুল ইছলামী التمدن الاسلامي নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ইছলামের পূর্বে আরববাসী সামুদ্রিক ছফরে অভ্যস্ত ছিলেন না। হিময়র ও ছবাগোত্রীয় বাদশাহদের নিকট অবশ্য কিছু সংখ্যক নৌকা ছিল, যদ্দারা তাঁহারা জলে ও স্থলে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন কিন্তু হেজাযবাসী আরবেরা সর্বদা সামুদ্রিক ছফরকে ভয় করিতেন।" ইহা যে ভুল তত্ত্ব এবং দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণা, যে কোন শিক্ষিত লোকের পক্ষে তাহা অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য হইবেনা।

দ্বিতীয় খলিফা ওমরের খিলাফত কাল হইতে আরবদের নৌযান পরিচালনায় এক নূতন যুগের সৃষ্টি হয়। আরবী মুছলমানেরা একদিকে বিভিন্ন দেশে নৌ-অভিযান পরিচালনা করেন অপরদিকে তখন আরম্ভ হয় শান্তিপূর্ণ নৌ ভ্রমণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য।

নীল দরিয়া ও লোহিত সাগর সংযোজন

সেই সময় ঘটনাক্রমে আরবে ভীষণভাবে খাদ্য সমস্যা দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করার জন্য হজরত ওমর সুদূর মিসর হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু স্থলপথে উহা আমদানী করিতে অধিক বিলম্ব ঘটিবে; সুতরাং উনসত্তর মাইল দীর্ঘ একটি খাল খনন করিয়া নীল দরিয়াকে লোহিত সাগরের সহিত যুক্ত করা হয়। ইহা খননে প্রায় ছয় মাস সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রথম বৎসরেই বিশটি জাহাজ ন্যূনাধিক ষাট হাজার টন খাদ্যশস্য লইয়া আরব সাগর দিয়া মদীনার নিকটবর্ত্তী 'জার' বন্দরে নোঙ্গর করে। প্রথম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই খালটি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে উহার পতন ঘটে। অবশেষে অজ্ঞাত রাজনৈতিক কারণে আব্বাসী খলীফা মনছুর কর্ত্তৃক তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

অনুরূপভাবে হজরত ওমরের সময়েই সুয়েজ খাল খননের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু রাজনীতি-বিচক্ষণ খলিফা ওমর তাহা নিষিদ্ধ করিয়া দেন। মিসরের গভর্ণর আমর এবনে আছ-ই সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আবুল ফেদা স্বীয় ভুগোলে এবনে সাঈদের বরাতে লিখিয়াছেন,

عند الفرما يقرب بحر الروم من بحر القلزم حتى يبقى
بينها نحو سبعين ميلا قال وكان عمرو بن العاص اراد ان
يخرق ما بينها فى مكان يعرف بذنب التمساح فنهاه عمر بن
الخطاب وقال كانت الروم تخطف الحجاج -

"ফরমার নিকটে ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগর অতি নিকবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিল। উভয়ের মধ্যে মাত্র ৭০ মাইল ব্যবধান ছিল। আমর বিন আছ 'জাতুত্তিমছাহ' নামক স্থানে উভয় সমুদ্রের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে খাল খননের পরিকল্পনা করিলেন কিন্তু ওমর এবনে খাত্তার তাহা নিষেধ করিয়া দিলেন। তিনি আরও বলেন, রুমী দুর্বৃত্তরা হজ্জ গমনকারীদের রাস্তা হইতে ফুসলাইয়া লইয়া যায়।" *

পাশ্চাত্য বণিক জাতি বর্তমান সুয়েজ খালের সাহায্যে মধ্যপ্রাচ্যকে যে ভাবে গ্রাস করিয়াছিল তাহার আলোকে দূরদর্শী ওমরের প্রতিবন্ধকতার রহস্য উপলব্ধি করা যে কোন মোটাবুদ্ধি সম্পন্ন প্রাচ্যবাসীর পক্ষেও কঠিন হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আরবেরা নৌযান পরিচালনা করিয়া দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে ভ্রমণ করিয়াছেন, ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়া উপকৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের জাহাজসমূহ পারস্য উপকুল হইতে ভারত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সুদূর চীনদেশে গমন করিত। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত আরব পর্যটক সোলায়মান ছয়রাফী তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি পারস্য সাগর

---

* আবুল ফেদা ১০২ পৃষ্ঠা।

হইতে বাহির হইয়া ভারত সাগরে গমন করিয়া বঙ্গোপসাগর অতিক্রমকালে বাংলার বিখ্যাত বন্দর চট্টগ্রাম এবং সিলহেটের উল্লেখ বারংবার করিয়াছেন। সিলহেট যে তৎকালে বিখ্যাত বন্দর ছিল প্রাচীন আরবী ইতিহাস হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আরবেরা পাক-ভারতের যে যে বন্দরে অবস্থান করিয়া চীন পর্যন্ত গমন করিতেন মালাবারের আলোচনায় আমরা তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। এখানে পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই। বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিলে তাঁহাদের অবস্থান কেন্দ্র হইত সিলহেট—আরবদের ভাষায় سلاهط সেলাহাট এবং চট্টগ্রাম—سادجام ছাদযাম।

নৌবিজ্ঞানে আরবদের দান

সমুদ্রগর্ভে নৌযান পরিচালনার জন্য সর্বপ্রথম এবং সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইত নকশা বা মানচিত্রের। আরব নাবিকগণ সর্বদা মানচিত্র সঙ্গে লইয়া পরিভ্রমণ করিতেন। সামুদ্রিক মানচিত্রের জ্ঞান তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ববর্তীদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিতেন এবং নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা উহাকে পূর্ণতা দান করিতেন। তাঁহারা নৌপরিচালনার নিয়মপদ্ধতি ও নীতি নির্ধারণ করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা বিরাট বিরাট গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে নিম্ন বর্ণিত পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। "আল্ ফাওয়াইদ ফী ওছুলে ইলমিল বাহ্‌রে ওয়াল্ কাওয়াইদ"

২। হাবিয়াতুল ইখতিছার ফী ওছুলে ইলমিল বেহার

৩। কন্‌জুল মুআলেমা

ছোলায়মান মহ্‌রী কৃত—

৪। আল্ উমদাতুল মাহরীয়াহ ফী জব্‌তেল উলুমিল বাহরীয়াহ

৫। আল্ মিনহাজুল ফাখের ফী ইল্‌মিল বাহ্‌রিজ জাখের।

উপরোল্লিখিত গ্রন্থগুলিতে নৌযান পরিচালনা সম্পর্কে আবশ্যকীয় যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। দেশের অবস্থান ও দূরত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রহ নক্ষত্রের গতিধারা এবং বায়ু ও ঝড় ঝঞ্ঝার নিদর্শন ও মওসুমের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন দ্বীপের ও বৃহৎ বন্দরের অবস্থিতি নির্দেশ করা হইয়াছে।

আহমদ এবনে মাজেদ এবং ছোলায়মান কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলি দ্বারা শুধু আরবরাই উপকৃত হয় নাই বরং তুর্কী ও হিন্দী নাবিকগণও উহা দ্বারা লাভবান হইয়াছেন।

তুর্কী নৌবাহিনীর কমাণ্ডার সৈয়দ আলী ভারত সমুদ্রে এবং গুজরাট উপকূলে পর্তুগীজ নৌবাহিনীর সহিত মোকাবেলার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। তিনি তুর্কী নৌচালনা সম্পর্কে একটি মূল্যবান এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানার নাম দিয়াছেন মুহীত—সর্বব্যাপক। উক্ত গ্রন্থে তিনি এবনে মাজেদ ও

ছোলায়মানের রচিত গ্রন্থসমূহ হইতে বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি অকপট ভাবে উক্ত লেখকদ্বয়ের ভূয়সী প্রশংসাও করিয়াছেন।

আরব নাবিকগণ নৌ-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন, নৌযান পরিচালনার জন্য তাহারা নক্শা বা মানচিত্রের সঙ্গে একটি দিকদর্শন যন্ত্রও আবিষ্কার করেন। যাহাকে 'কুতুব নোমা বা কম্পাস Compas নামে অভিহিত করা হয়। "কুতুব নোমা চুম্বক প্রস্তর সম্বলিত একটি যন্ত্র; যদ্বারা দিক নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের আবিষ্কারের সঠিক সময় নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলেও বিনাদ্বিধায় ইহা বলা যাইতে পারে যে, আরবরাই সর্ব্বপ্রথম ইহার আবিষ্কারক ছিলেন। কম্পাস Compas নাম দেখিয়া পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত কোন লোকের এরূপ ধারণা জন্মানো বিচিত্র নহে যে, ইহার আবিষ্কারক ইউরোপবাসী। এ সম্বন্ধে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা একাদশ সংস্করণের ৭০৭ পৃষ্ঠায় কম্পাস সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে তাহা বিভ্রান্তিকর ও ভ্রমাত্মক। আরবরা রুমীদের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন বলিয়া উহার নাম কম্পাস Compas হয় নাই। বরং তাঁহারা প্রাথমিক যুগে সামুদ্রিক চিত্রকেই কম্পাস নামে অভিহিত করিতেন; যাহাতে সমুদ্র ও দ্বীপ উপদ্বীপ এবং স্থানের দৈর্ঘ প্রস্থ প্রভৃতির উল্লেখ থাকিত। পরবর্ত্তীকালে দিক দর্শন যন্ত্রকেই তাঁহারা উক্ত নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। নবম শতাব্দীর আরব সমুদ্রে আরব নাবিকগণ উহাকে দায়েরা এবং বয়তুল ইবরাহ নামে আখ্যাত করিতেন।

মুছিনলিবোঁ বলিয়াছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে যাহা প্রমাণিত হইয়াছে তাহা এই যে, পাশ্চাত্য সমাজ আরববাসীদের নিকট হইতেই কম্পাসের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। আরবরাই সুদূর চীনের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। আরবদের নিকট হইতে বহুদিনে পাশ্চাত্য-বাসীরা উহার ব্যবহার আয়ত্ব করিয়াছিলেন। কারণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে পাশ্চাত্য নাবিকেরা 'কুতুব নোমা' বা Compas ব্যবহার করেন নাই। অথচ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঐতিহাসিক ইদ্রিসী বলিয়াছেন, আরবদের মধ্যে তখন উহার ব্যবহার ব্যাপক ছিল। ১

ভারত সাগরে অন্ধকার রজনীতে জাহাজ পরিচালনাকারী নাবিকগণ মৎস্য সাদৃশ একটি চুম্বক প্রস্তর ব্যবহার করিতেন, কারণ আকাশ-মেঘাচ্ছন্ন থাকায় নক্ষত্রের সাহায্যে তখন দিক নির্ণয়ের কোন উপায় থাকেনা।

"They say that the Captains who navigate the Indian seas use, instead of the needle and splintes, a sort of fish made out of hollow iron, which, when thrown into the water, swims upon the surface, and points out the north and south with its head and tail."

ওয়াকেফ মহলের বয়ান এই যে, ভারত সমুদ্রে যে নাবিকগণ জাহাজ পরিচালনা করেন তাঁহারা সূঁচ ও কাষ্ঠখণ্ডের পরিবর্ত্তে মৎস্য সাদৃশ একটি যন্ত্র ব্যবহার করিতেন,

১) Encyclopaedia Briutannica (6) 11th Edition p. 807.

যাহা ফাঁপা লোহ নির্মিত ছিল। পানিতে ছাড়িয়া দিলে উহা ভাসিয়া চলে এবং মস্তক ও লেজ দ্বারা উত্তর-দক্ষিণের দিকে ইঙ্গিত করিয়া থাকে। ১

ঐতিহাসিক মাকরিযী (৭৬৬—৮৪৫ হিঃ) স্বীয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :—

وما برح المسافرون فی بحر الهند اذا ظلم عليهم الليل ولم يروا ما يهديهم من الكواكب الى معرفة الجهات يعملون حديدة مجوفة على شكل سمكة ويبالغون فی ترقيقها جهد المقدرة ثم يعمل فی فم السمكة شی من مقناطيس جيدا ويحک فيها بالمقناطيس فان السمكة اذا وضعت فی الماء دارت واستقبلت القطب الجنوبی بفمها واستدبرت القطب الشمالی وهذا من اسرار الخليقة فاذا عرفوا جهتی الجنوب والشمال تبين منهما المشرق والمغرب ـ

ভারত সাগরে পরিভ্রমণকারী নাবিকগণ অন্ধকার রাত্রিতে নক্ষত্রের সাহায্যে দিক নির্ণয়ে অক্ষম হইলে তাহারা অন্তর শুন্যফাঁপা মৎস্য সাদৃশ একটি যন্ত্র ব্যবহার করিতেন। যথাসম্ভব অতি ক্ষীণ আকারে উহা নির্মিত এবং উহার মুখভাগে চুম্বক লৌহখণ্ড স্থাপিত করা হইত। সেই মৎস্য পানিতে রক্ষিত হইলেই ঘুরিয়া উহার মুখ দক্ষিণে আর লেজ উত্তরের দিকে ফিরিয়া যাইত। ইহা একটি অভিনব আবিষ্কার বটে। যখন ইহাদ্বারা উত্তর দক্ষিণ নিশ্চিত হইয়া যাইত তখন সহজেই পূর্ব-পশ্চিম নির্ণয় করা যাইত। ২

আহমদ এবনে মাজেদ দাবী করিয়াছেন যে, দিক দর্শনের এই যন্ত্র (Compass) আরবরাই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,

ومن اختراعنا فی علم البحر تركيب المغناطيس علم الحقة بنفسه ولنا فيه حكمة كبيرة لم تودع فی كتاب انه لم يقابل الجاه الا سهيلية فميزوا فی هذه النكتة ـ

সামুদ্রিক আবিষ্কারের মধ্যে আমাদের অভিনব আবিষ্কার হইতেছে চুম্বক বাক্স নির্মাণ করা এবং ইহাতে আমাদের এরূপ দান রহিয়াছে যাহা ইতিপূর্বে কেহ দিতে সক্ষম হন নাই।

ইহা ছাড়াও আরবগণ নৌবিজ্ঞানে নূতন নূতন বহু আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বিখ্যাত পাশ্চাত্য নাবিক ভাস্কো-ডি-গামার সময় অর্থাৎ নবম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাশ্চাত্য

১) খুতুতে মিসর (১) ৩৩৯-৪০ পৃষ্ঠা, জাহাজরাণী ১৩০ পৃঃ।

২) ঐ, ঐ,

নাবিকেরা আরব জাতির আবিষ্কৃত জ্ঞানতত্ত্ব ও যন্ত্রের দ্বারা উপকৃত হইতেছিলেন। এন্সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হইয়াছে ঃ

Further, we learn from Osorio that the Arabs at the time of Gama "were instructed in so many of the arts of navigation, that they did not yield much to the portuguese mariners in the science and practice of maritime metters. Also the Arabs that navigated the red sea at the same period are shown by Varthema to have used the mariner's chart and compass.

উপরন্তু, ওসোরিওর বর্ণনা হইতে গামা র সমকালীন আরবীয়দের সম্পর্কে জানা যায় যে, "তাহারা নৌবিদ্যায় এতদূর পারদর্শীতা অর্জন করিয়াছিল যে, পর্তুগীজ নাবিক ও নৌচালক ব্যবহারিক নৌবিদ্যায় তৎতুল্য কিছুই করিতে পারে নাই। ভারথেমার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, লোহিত সাগরে চলাচলকারী আরব নাবিকগণ সামুদ্রিক ম্যাপ ও কম্পাস ব্যবহার করিতেন।

আরববাসীগণ বর্তমান যুগের ন্যায় তাঁহাদের সমুদ্রযানগুলিকে বিভিন্ন নামে আখ্যাত করিতেন অথবা মালিকদের নামানুসারে উহার পরিচয় প্রদান করা হইত। বিখ্যাত আরব পর্যটক মছউদী ৩০৪ হিজরীতে আবদুর রহীম এবনে জা'ফর ছয়রফীর ভ্রাতৃদ্বয় আহমদ ও আবদুছ ছমদের জাহাজে ছফর করিয়াছিলেন।

অপর বিখ্যাত পর্যটক ইব্নে বতুতা যে জাহাজযোগে সুদূর চীন দেশে ছফর করিয়াছিলেন তাহার নাম ছিল 'জাবার'। ইহার মালেক ছিলেন ইব্রাহীম নামীয় জনৈক ব্যবসায়ী। আরবগণ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বন্দরসমূহে জাহাজ নির্মাণের কারখানাও স্থাপন করিয়াছিলেন, সাধারণতঃ তাঁহারা উহাকে "দারুছছানাআহ্" (শিল্প কেন্দ্র) বলিতেন। পারস্য উপকূলবর্তী উব্লাহ ও ছারাফ বন্দরে জাহাজ নির্মাণের বিরাট কারখানা ছিল।

বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাস গোত্রের রাজত্বকালে উহা আরও উন্নতি লাভ করে এবং আরও বহু কারখানা স্থাপন করা হয়।

ফলকথা এই যে, বঙ্গ দেশের সহিত আরবদের প্রথম ও প্রধান যোগসূত্র এই সমুদ্রপথেই স্থাপিত হইয়াছিল এবং নৌবিজ্ঞানে আরবদের পারদর্শীতার জন্যই যে উহা সম্ভব হইয়াছিল এই কথাটি বুঝাইবার জন্য অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আরবজাতি ও নৌবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা কিছুটা আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি।

সাধারণতঃ পাক-ভারতে আরবদের আগমনের দুইটি রাস্তা বর্ণিত হইয়াছে। একটি জলপথ আর অপরটি স্থলপথ। এবং এই দুইপথ ধরিয়াই যে আরবরা বাংলা দেশেও আগমন করিয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই।

১৪শ অধ্যায়

বাংলার সমসাময়িক অবস্থা

মুছলিম ভারতের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বাংলার মুছলিম সমাজের সমসাময়িক অবস্থা আলোচনার জন্য যেসমস্ত উপাদানের উপর আমরা নির্ভর করিতে পারিতাম তাহার অধিকাংশই আমাদের পিতৃ পুরুষের অস্থি মাংসের মত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া বাংলার মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে। কীট পোকার উপদ্রব ও নানারূপ দুর্ঘটনার স্পর্শ বাঁচাইয়া অবশিষ্ট যেসমস্ত উপাদান অদ্যাবধি টিকিয়া আছে তাহার সব কয়টি সংগ্রহ করিয়া একত্রে সংগ্রথিত করা একটি অতি দুরূহ কাজ। এইজন্য প্রচুর অনুসন্ধান, নিরন্তর প্রয়াস, ব্যাপক অধ্যয়ন ও বিপুল আত্মত্যাগের প্রয়োজন। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মুছলিম বাংলার তরুণ সাহিত্যিকগণ এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব বহনের কাজে আজ পর্যন্ত অগ্রসর হইতেছেন না। সুতরাং এ সম্পর্কে ইউরোপীয় লেখকগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা মানিয়া লইয়া সন্তুষ্ট থাকা এবং বিনা প্রতিবাদে অধ্যাপকগণ যাহা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে আমাদের শিক্ষা দিয়া যাইতেছেন তাহা গলাধঃকরণ করা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নাই। তবে এ কথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যাইতে পারে যে, মুছলিম দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতঃ বহু অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তির পাশাপাশি এই সমস্ত ইউরোপীয় লেখকদের বর্ণনায় বহু উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক প্রচার ও দুরভিসন্ধিও রহিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সমস্ত প্রচারণা ও দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এখানে সম্ভব নহে।

হজরত উমরের সময়কাল হইতে সিন্ধু প্রদেশে মুছলমানদিগের বিজয় অভিযান শুরু হয় এবং সেনানায়ক মোহাম্মদ ইবনে কাসেম কর্তৃক ১৭১২ খৃষ্টাব্দে চূড়ান্তভাবে সিন্ধু বিজয় সমাপ্ত হয়, ইহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি।

আফগানিস্তান, মলাবার ও সিন্ধু প্রদেশের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, ইছলামের আদিযুগেই বাংলা দেশেও ইছলাম প্রচারের ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছিল। ১২০১ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খালজির আক্রমণের দ্বারা বাংলা দেশ সর্বপ্রথম রাজনৈতিকভাবে ইছলামের সংস্পর্শে আসে। এই সময় হইতে বাংলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উহার স্বাধীন অস্তিত্ব মুছিয়া যাওয়ার কাল অর্থাৎ ১২০১ হইতে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়টিকে আমরা এখানে নিম্নরূপে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করিয়া নিতেছি :—

প্রথম পর্যায়ে ১২০১ সাল হইতে ১৩৪০ সাল পর্যন্ত ১৪০ বৎসর। এই সময় বাংলা দেশ দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত ও তাঁহার আজ্ঞাবহ সুবাদার কর্তৃক শাসিত হইত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৩৪০ সাল হইতে ১৫৭৬ সাল পর্য্যন্ত ২৩৬ বৎসর। এই সময়ে স্বাধীন মুছলিম সুলতানগণ বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছেন। ১৫৪০ সাল হইতে ১৫৭৬ সাল পর্য্যন্ত সময়ে বাংলার কয়েকজন সুলতান ভারতের সম্রাট হইয়াছেন।

তৃতীয় পর্য্যায়ে ১৫৭৬ সাল হইতে ১৭৬৭ সাল অর্থাৎ আকবর কর্তৃক বঙ্গ-দেশকে তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত করার সময় হইতে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক বাংলার দেওয়ানী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে তুলিয়া দেওয়ার সময় পর্যন্ত ১৯০ বৎসর।

মুছলমানগণের ধর্মীয় ও সামরিক শক্তির উচ্ছেদ সাধন এবং ইংরেজ ও হিন্দুদের সাহায্যে মোগল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা, আকবরের শাসন নীতির এই দুইটি প্রধান লক্ষ্যের প্রতি আমরা পূর্বেই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। ইংরাজ ও হিন্দুর ষড়যন্ত্র ও সহযোগিতা মিলিয়া এই অসাধু নীতি যে চূড়ান্ত পরিণতি ডাকিয়া আনিয়াছিল সিরাজ ও কাসেমের তপ্ত বক্ষ-শোনিতে মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠাগুলিতে তাহার করুণ কাহিনী লিখিত হইয়াছে। ইহা ভাগ্যের পরিহাস অথবা প্রকৃতির প্রতিশোধ তাহা বিচারের ভার আমরা পাঠকদের উপরই ছাড়িয়া দিলাম।

উপরোক্ত তিনটি সময়কালের প্রথমটিকে আমরা তুলনামূলক ভাবে শান্তি ও নিরাপত্তার যুগ রূপে আখ্যায়িত করিতে পারি। মুছলিম বঙ্গের প্রকৃত বিপদ শুরু হয় দ্বিতীয় যুগে এবং মোগলদের অধীনে তৃতীয় যুগে ইহা চরম আকার ধারণ করে। এই বিপদের স্বরূপ ও মাত্রা অনুধাবন করিতে হইলে একদিকে আমাদের সেই সময়কার মুছলমানগণের নিজেদের চিন্তাধারা ও ক্রিয়াকাণ্ড এবং অপর দিকে হিন্দু বাংলার চিন্তাধারা ও কার্য্যকলাপের স্বরূপ কি ছিল তাহা ভাবিয়া দেখিতে হয়। দুস্থ আবহাওয়া ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে মানুষের প্রাণের প্রধান উৎস দেহে প্রবহমান রক্তের বলিষ্ঠ ও সুস্থ কণিকাগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। এই সমস্ত সুস্থ রক্ত কণিকার ধ্বংসের ফলে রক্তধারায় একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং সেখানে মানুষের জীবনের পক্ষে অতি বিপজ্জনক বিষাক্ত বীজানু জন্মের উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই সময়ে যদি কেহ বিষাক্ত বীজানুপূর্ণ আবহাওয়ায় পরিবৃত থাকে তাহা হইলে এই সমস্ত মারাত্মক বীজানু অতি সহজেই তাহার রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করিবে এবং অতি দ্রুত বংশ-বিস্তার করিয়া চলিবে। যে মুহূর্ত্তে সুস্থ কণিকা এবং বিষাক্ত বীজানুর বীজগাণিতিক যোগফল দাঁড়াইবে শূন্য অর্থাৎ যখন ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বীজানুর শক্তি হইবে সমান সমান ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে মৃত্যু হইল সঞ্জীবনকারী খাদ্যের অভাব ও বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক প্রভাবের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফল। ব্যক্তির বেলায় যাহা সত্য, সমাজের বেলায়ও তাহা সত্য। সুতরাং পাঠকদিগের নিকট ইহা বলার প্রয়োজন করেনা

যে, একটি সমাজ যখন একদিকে তাহার নিজস্ব ধ্যানধারণা ও আদর্শ দ্বারা নিজেকে আর পরিপোষণ করিতে সক্ষম হয়না এবং অপর দিকে একই সঙ্গে বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন তাহার পতন ঘটে। সমাজের বেলায় এই সমস্তই হইতেছে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিপদ।

উপরোল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে মুছলিম সমাজের আভ্যন্তরীণ বিপদ ছিল খুবই গুরুতর। প্রথমতঃ এই সময়ে অন্য কোন ভাষায় কোরাআনের তরজমা অধর্মের কাজ রূপে বিবেচিত হইত। তদুপরি একদিকে তুর্ক, তাতার, আফগান, ইরানী প্রভৃতি বিভিন্ন বহিরাগত মুছলমান এবং অপরদিকে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে ধর্মান্তরিত স্থানীয় মুছলমানের মিশ্রণের ফলে উদ্ভুত মোছলেম সমাজের ভাষ সমস্যাও ছিল তাহাদের বিপদের অন্যতম কারণ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, এই সময়ে ফারসী সাহিত্য বাংলা দেশে অতি জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং ব্যাপকভাবে এখানে ইহার অধ্যয়ন ও চর্চা হইত। তবে কোনরূপ বিতর্কের আশঙ্কা না করিয়াই একথাও বলা যাইতে পারে যে, এই ফারসী সাহিত্য মুছলমানগণের উপকার অপেক্ষা ক্ষতিই বেশী সাধন করিয়াছে। শেখ সাদীর গোলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ এবং এই সময়ে বহুল পঠিত চরিত্র গঠন বিষয়ক দুই একটি ফারসী পুস্তককে অবশ্য আমরা এই সাধারণ মন্তব্যের মধ্যে ধরিতেছি না। সর্বশেষে মুছলিম বাংলার দীর্ঘ ইতিহাসে ইছলামী ভাবধারা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং মুছলিম তাহজীব ও তমদ্দুনে বিশ্বাসী এরূপ একজন চরিত্রবান শাসনকর্তা, সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতার সাক্ষাৎ আমরা পাইনা, যিনি বাংলার মুছলমানদিগকে তাহাদের ব্যক্তিগত অথবা সমাজ জীবনে শক্তি ও সাহস অর্জনে প্রেরণা যোগাইতে সক্ষম ছিলেন। ইহাই ছিল মুছলিম সমাজের মানসিক খাদ্যের দুর্ভিক্ষ, যাহা উহাকে ভিতর হইতে ধ্বংস ও অধঃপাতিত করিয়া চলিয়াছিল।

যখন মুছলিম মানস সম্পূর্ণভাবে এছলামী ভাবধারা ও আদর্শ বিবর্জিত এবং উহার নিজস্ব তাহজীব-তমদ্দুনের সহিত পরিচয়-শূন্য হইয়া এমনিভাবে শয়তানের কারখানায় পরিণত হইতে চলিয়াছে, ঠিক সেই সময় বাংলার হিন্দুদের মধ্যে বুদ্ধি ও ধর্মের এক অভূতপূর্ব জাগরণ ও পুনরুজ্জীবন দেখা দেয়। আমাদের কল্পিত দ্বিতীয় যুগেই এই জাগরণ ও পুনরুজ্জীবন ঘটে। বলা বাহুল্য, হিন্দু বাংলার এই বুদ্ধির জয়যাত্রা ধর্ম ও পৌরাণিক সাহিত্যকে ভিত্তি করিয়াই শুরু হয়। বাংলার তথাকথিত উদার, মহানুভব ও বিদ্যোৎসাহী মুছলমান নবাব ও সুলতানগণ তাঁহাদের নিজস্ব ধর্ম গ্রন্থসমূহ ও সাহিত্য চর্চার প্রতি নজর দেওয়া অথবা একাজে কোন মুছলমানকে উৎসাহ দান ও পৃষ্ঠপোষকতা করার কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। সমসাময়িক সাহিত্য খুঁজিয়া বাংলার এই সমস্ত নবাব ও সুলতানগণের দরবারে কোনদিন কোরআন অধ্যয়ন অথবা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর জীবন-

চরিত ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার অনুষ্ঠান হইয়াছে এই ধরণের কোন আভাষ আমরা পাই না। অপর দিকে শত শত প্রাচীন পুস্তক ও পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের অনেকেরই দরবারে রামায়ন ও মহাভারত পাঠের নিয়মিত সাহিত্যিক আসরের অনুষ্ঠান হইতেছে। এই সমস্ত নবাব, সুলতান ও আমাদের স্বসমাজের মুছলমান কবিগণের বিষয় পরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে। কবি শ্রীকরনন্দী তাঁহার বাংলা মহাভারতের অশ্বমেধ স্বর্গে লিখিয়াছেন :—

পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভাখণ্ড মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পূণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনী কহিল সংহিতা॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৫৪ পৃষ্ঠা,)

উপরে আমরা হিন্দু সমাজের যে পুনরুজ্জীবনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, হিন্দু লেখকগণও তাহাকে হিন্দু ধর্মের পুনর্জ্জীবন রূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন লিখিতেছেন যে, হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের যে প্রচেষ্টা চলে তাহাই হইতেছে বাংলা ভাষার উন্নতির প্রথম এবং প্রধান কারণ। বলাবাহুল্য, বাংলা ভাষার এই উন্নতি যাহা হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন ব্যতীত কিছুই ছিল না— গৌড়ের মুছলিম সুলতানগণের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। ইহা একটি সর্বজন স্বীকৃত ঐতিহাসিক সত্য। কোন্ সালে এবং গৌড়ের কোন সুলতানের আমলে কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করেন তাহা লইয়া আমাদের যুগের হিন্দু সহিত্যিকেরা বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নানা অনুমান এবং অসম্পূর্ণ যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা দেখাইতে চাহেন যে, গৌড়ের যে অধিপতি কৃত্তিবাসকে রামায়ণ অনুবাদ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন তিনি মুছলমান ছিলেন না, হিন্দু ছিলেন। এই অনুমানকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য আমরা মোটেই ব্যগ্র নহি। কেননা সমসাময়িক মুছলিম সুলতানগণ এই ক্ষেত্রে তাহাদের অকৃপণ ও মুক্তহস্ত কার্য্যাবলীর দ্বারা এত বিপুল খ্যাতি ও কীর্তি অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, কৃত্তি-বাসী রামায়ণ অনুবাদের খ্যাতি ও কীর্তিকে ইহাতে যোগ না করিলেও মুছলিম বাংলার তাহাতে দুঃখ ও অনুশোচনার কোন বিশেষ কারণ থাকিবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ হিন্দু লেখকগণের এই সমস্ত অনুমানের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। সুতরাং কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন একজন মুছলমান সুলতান এই অনুমানকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ারও উপায় নাই।

রামায়ণ, মহাভরত ও অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য মুছলমান সুলতানগণ কিরূপ আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন, এখানে পাঠকদের অবগতির জন্য তাহার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ আমরা পেশ করিতেছি :—

(১) গৌড়ের সুলতান নাসির খান ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এই মহান সুলতান মহাভারতের একখানি বাংলা অনুবাদ করান। বিদ্যাপতি এইভাবে তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কীর্তন করিয়াছেন :—

"সে যে নসিরা সাহ জানে,
যারে হানিল মদন বাণে,
চিরঞ্জীব রহ পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি পতি ভণে।।"

(২) এই সময়কার ইতিহাসে হুসেন শাহের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার বাংলা মহাভারতের মুখবন্ধে হুসেন শাহ সম্পর্কে এইভাবে লিখিয়াছেন :—

"নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি।।
অস্ত্রশস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈব যেন কৃষ্ণ অবতার।"

বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণেও আমরা হুসেন শাহের অনুরূপ স্তুতি কীর্ত্তন দেখিতে পাই।

রূপ সনাতন ও পুরন্দর খান (১) যথাক্রমে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও সভাসদ ছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে হুসেন শাহ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা এবং আদেশক্রমেই মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। হুসেন শাহ ১৪৯৩ সাল হইতে ১৫১৮ সাল পর্য্যন্ত বাংলায় রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজকীয় পরিচয় ছিল সৈয়দ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ শরীফ মক্কী। হুসেন শাহ সম্পর্কে পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব।

(৩) পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান শ্রীকর নন্দীর দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অধিকতর বিস্তৃতভাবে অনুবাদ করান।

(৪) হুসেন শাহের পুত্র নাসির উদ্দিন নছরৎ শাহের আদেশে শ্রীখণ্ডের অধিবাসী কবি রঞ্জন বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন।

(৫) কবি মালাধর বসু ১৪৭৩—৭৪ সন হইতে ১৪৮০—৮৩ সন পর্য্যন্ত পূর্ণ সাত বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বিষয়ক 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নামক

---

(১) প্রথমোক্ত দুইজন পরস্পরের সহোদর ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁহারা চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তৃতীয় জন অর্থাৎ পুরন্দর খান একজন গোঁড়া বৈষ্ণব ও শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল কাব্যের রচয়িতা ছিলেন।

একখানি বাংলা মহাকাব্য রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বিষয়ে ইহাই প্রথম বাংলা মহাকাব্য।

কবি মালাধর বসু গৌড়ের সুলতান সম্পর্কে লিখিয়াছেন :—

"নির্গুণ অধম মুঞি নাহি কোন গ্রাম
গৌড়েশ্বর দিল নাম গুণরাজ খান।।"

গুণরাজ খানের গুণমুগ্ধ পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তিটি শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ ব্যতীত গৌড়ের অপর কোন সুলতান নহেন। কবি সম্ভবতঃ সুলতান রুকনুদ্দিন বারবাকের রাজত্বের শেষের দিকে তাহার কাব্য রচনা শুরু করেন এবং ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে তাহা সমাপ্ত করেন। (১) অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়মূলক দোল, রাস ও বৃন্দাবন লীলার ব্যাপক প্রচারে সহায়তা দানের কৃতিত্ব পিতা পুত্র উভয়েরই প্রাপ্য।

(৬) দ্বিতীয় যুগের আরেকটি কদর্য্য ব্যাপার হইতেছে সাপ ও বিষের দেবী রূপে বাংলা দেশে মনসার পুনরাবির্ভাব। মুছলমান সুলতানগণের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বিষয়ক প্রথম বাংলা পুস্তক, বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাসের 'মনসা মঙ্গল'ও তেমনি সর্পদেবী মনসার পূজা এবং বেহুলার ভাসান যাত্রা আমদানীকারক প্রথম বাংলা পুস্তক। এই দুইখানি 'মনসা মঙ্গল' কাব্য ১৫শ শতাব্দীর শেষ দশকে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের নির্দেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়। ইহার পরে সারা বাংলা দেশ মনসা মঙ্গলের পাঁচালী ও বেহুলার ভাসান গানের বন্যায় প্লাবিত হয়। শুধু হিন্দুরাই নহে, মুছলমানগণও এই প্লাবন হইতে মুক্ত থাকেন নাই। প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থ হইতে এইরূপ অসংখ্য নজীর তুলিয়া দেখানো যায় যে, এই সমস্ত পাঁচালী ও গানের প্লাবনে মুছলমানদের মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি ভাসিয়া গিয়াছিল। (২)

(৭) শ্রী চৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের প্রচার ও প্রভাবে এই সময়ে বৈষ্ণব ধর্মের পুনরুজ্জীবন শুরু হয়। চৈতন্যদেব ১৪৯৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ সনে

---

(১) কবি নিজেই লিখিয়াছেন "১৩৯৫ শকাব্দে শুরু হয় এবং ১৪০২ শকাব্দে সমাপ্ত হয়।" অতএব দেখা যাইতেছে, কাব্যটির রচনা ১৪৭৩ সালে শুরু হইয়া ১৪৮০ সালে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইউসুফ শাহ ১৪৭৪ সাল হইতে ১৪৮২ সাল পর্য্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন।

(২) মহাভারত ও দেবী ভাগবতে আমরা মনসার আংশিক বিবরণ দেখিতে পাই। তাহার জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও আমরা তাহাকে শিবের মানস-কন্যা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ভাষার শালীনতা রক্ষা করিয়া মনসার কাহিনী বর্ণনা করা সম্ভব নহে। মোদ্দা কথা জন্মের পর মুহূর্তেই তিনি পরিপূর্ণ যৌবনবতী হইয়া উঠেন। এবং শিব বা মহাদেব তাহাকে স্বগৃহে লইয়া যান। শিবের পত্নী চণ্ডী বা দুর্গা যে কারণেই হউক তাঁহাকে দেখা মাত্র আক্রোশে ফাটিয়া পড়েন। ফলে দুই দেবীর মধ্যে যে সংঘর্ষ

৪৮ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। (৩) তাঁহার মৃত্যুর অনেক পূর্বে বাংলা দেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব তিনি তাঁহার শিষ্য নিত্যানন্দের উপর অর্পণ করিয়া যান। এই কাজে নেড়া বা যবন হরিদাস (৪) তাঁহার সহকর্মী হন। সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে যে, গৌড়ের মুছলমান সুলতানগণ বিশেষতঃ সুলতান হোসেন শাহ এবং তাহার যোগ্য উত্তরাধিকারী সুলতান নছরৎ শাহই বাংলার মুছলমানদের এছলাম-বিশ্বাসে নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন।

বাধে তাহাতে মনসা তাহার একটি চক্ষু হারান। মনসা দুর্গার প্রতি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। শিবও তাঁহার রোষ হইতে বাদ পড়িলেন না। (সাপ নাচানো বর্ণনা এখানে আমরা বাদ দিতেছি।) মনসা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহার এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া তিনি ছাড়িবেন না। তাঁহার সহচরী নেত্রবতীর সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি শিব ও দুর্গা ভক্তদের মনসা পূজায় বাধ্য করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। এই উদ্দেশ্য লইয়া বাংলা দেশে তিনি এক বিশেষ রূপে আবির্ভূত হইলেন এবং অতি অল্পায়াসে ধীরে ধীরে রাখাল, জেলে ও গরীব মুছলমানদের তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন। (বাংলা সাহিত্যের কথা ১৬ পৃষ্ঠা) চাঁদ সওদাগরের স্ত্রী একজন মনসা-ভক্ত নারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী কোনক্রমেই মনসার পূজা করিতে রাজী হইলেন না। রাগান্বিত হইয়া মনসা তাহাকে নানা বিপদ ও ক্ষয় ক্ষতির মধ্যে ফেলিতে লাগিলেন। কিন্তু সাতটি সন্তান ও প্রচুর ধন সম্পদ সহ তাঁহার সমুদয় জাহাজ সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া সত্বেও চাঁদ সওদাগর নিজের মতে অটল রহিলেন। অবশেষে কঠোর সতর্কতা সত্বেও তাহার একমাত্র জীবিত পুত্র লক্ষিন্দর সর্পাঘাতে নিহত হয় এবং লখিন্দরের স্ত্রী বেহুলা তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও মনসার দয়ায় তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম হয়। চাঁদ সওদাগরের হারানো সকল পুত্র ও ধনৈশ্বর্য্য পুনরায় তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এই মনসা পূজা এবং ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বেহুলার ভাসান বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যায় যশোহর, খুলনা ও চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি অঞ্চলের মুছলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

(৩) শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচলে ছিলেন তখন একদিন তিনি সমুদ্রের নীল জলের মধ্য হইতে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণের রূপ মূর্তি দেখিতে পান। দৌড়াইয়া উহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া তিনি সমুদ্রে ডুবিয়া মারা যান। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, এই অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহারা চৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের একজন অবতার বলিয়া জ্ঞান করেন। আর এই কারণেই তাঁহাকে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহার জীবন চরিত্রের সকল অংশে আমরা এরূপ অসংখ্য প্রমাণ পাই যে, তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া মূর্তিপূজক।

(৪) যবন ম্লেচ্ছ ইত্যাদি শব্দ গালমন্দসূচক ও ঘৃণাব্যঞ্জক। শাস্ত্রকারগণ হইতে শুরু করিয়া আধুনিক হিন্দু কবি সাহিত্যিকগণ পর্য্যন্ত সকলেই মুছলমানদের এই সমস্ত বিশেষণে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

প্রথম পর্য্যায়ে বাংলা দেশে বৈষ্ণববাদের পুনরুজ্জীবন রূপেই এই নৈরাজ্য ও বিদ্রোহ-সম্ভাবনার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

(৮) আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, গোপীনাথ বসু ওরফে পুরন্দর খান তাঁহার ভ্রাতা মালাধর বসুর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বিষয়ে কৃষ্ণ মঙ্গল নামক একখানি মহাকাব্য রচনা করেন।

ধর্মীয় ভাবধারা ও আদর্শ এবং তামদ্দুনিক চিন্তাধারার সহিত সম্পর্কচ্যুত হওয়ার অব্যবহিত পরে মুছলিম ইতিহাসের এই দ্বিতীয় যুগে বাংলার মুছলমান সমাজ কিরূপ গভীরভাবে বহু ঈশ্বরবাদী সংস্কার, বিশ্বাস ও পৌত্তলিকদের চিন্তা-ধারায় প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল উপরোক্ত আলোচনা হইতে আশা করি পাঠকগণ সে সম্পর্কে একটা ধারণা লাভে সক্ষম হইবেন।

১৫শ অধ্যায়

মুছলিম বাংলার পতন

মুছলমান নবাব বাদশাহগণের পৃষ্ঠপোষকতা এবং হিন্দু কবি, সাহিত্যিক ও ধর্মপুরোহিতগণের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় যে পৌত্তলিকতাপূর্ণ আবহাওয়া এখানে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার অনিবার্য্য পরিণতি হিসাবে বাংলার মুছলমানগণ হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ক্রমে আকৃষ্ট ও বিশ্বাসী হইয়া উঠিতে থাকেন। তান্ত্রিকদের অশ্লীল ও অপরাধমূলক জঘন্য সাধন-পদ্ধতি, বামাচারীদের যৌনধর্মী ও নোংরা আচার অনুষ্ঠান, ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ সমাজের ক্ষতিকর সংস্কার, বিশ্বাস ও রীতিনীতি এবং বৈষ্ণবদের প্রেমলীলা ও অবাধ যৌন আচরণ সেই সময়কার হিন্দু বাংলায় ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছিল। ফলে একদিকে নিত্যনূতন দেবদেবীর জন্ম এবং অপর দিকে প্রাচীন দেব দেবীগণের অবতারের আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। আমাদের দুঃখের পেয়ালাটি পূর্ণ করিয়া তোলার জন্যই যেন এই সময়কার মুছলিম কবি-সাহিত্যিকগণের প্রায় সকলেই দ্বিতীয় যুগের হিন্দু কবিগণকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া হিন্দুদের দেবদেবীর স্তুতিমূলক পদাবলি, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা ও যৌন আবেদন-মূলক কীর্তন, মনসার ভাসান সঙ্গীত, দুর্গা ও গঙ্গার স্তোত্র এবং হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে বহু পুঁথি পুস্তক রচনা করেন।

বাংলার নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা অথবা উহার অন্যতম ব্যাখ্যাতা গোরক্ষ-নাথ ১১শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। শৈব ধর্মের ছদ্ম আবরণে বৌদ্ধ ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাই ছিল এই সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বর্তমানে ইহা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত সত্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, এই গোরক্ষ-নাথই কলিকাতার কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শেখ ফয়জুল্লা নামক এক ব্যক্তি গোরক্ষ-বিজয় বা মীন চেতন নামক একখানি মহাকাব্য রচনা করিয়া গোরক্ষনাথ ও নাথ মতবাদের স্তুতি কীর্তন করিয়াছিলেন। জাফর খান নামক জনৈক তুর্কী বীর প্রথমে ঘোর হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু পরে হিন্দু ধর্মের প্রতি তিনি এত বেশী অনুরক্ত হইয়া পড়েন যে, সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গাস্তোত্র রচনা করিয়া তিনি বিখ্যাত হইয়া উঠেন। তিনি ছিলেন ২৪ পরগণা এলাকার একজন শাসনকর্তা। (বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য, ১৩২ পৃষ্ঠা)

জাফর খানের গঙ্গাস্তোত্র পাঠের সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই, তবে গঙ্গার উপাসক অপর একজন তথাকথিত উদারপ্রাণ মুছলমান বিরচিত একটি দীর্ঘ স্তোত্রের সন্ধান আমরা পাইয়াছি যাহা অনুসন্ধান-কর্মীদের অনেকেই সম্ভবতঃ পাঠ করিয়া

থাকিবেন। সাধারণ পাঠকদের কৌতুহল নিবৃত্ত করার জন্য নিম্নে আমরা উক্ত স্তোত্রের প্রথম ও শেষ অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

বক্তাক্তং জননী গর্ণৈর্ষদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈ যস্মিন পায় দৃগন্ত-সন্নিপতিতে তৈঃ স্বর্ষ্যাতে শ্রীহরি ঃ।···

সুর ধুনি মুনিকণ্যে তারয়েঃ পুণ্য বন্তং, স তরতি নিজ পুনৈস্তত্র কিন্তে মহত্তম। যদিচ গতি বিহীনং তারয়ঃ পাপি নং মাং, তদিহ তব মহত্তং তম্মত্তম্ মহত্তং ॥ (১)

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে শাহজাদা শাহজাহানের সহিত সম্পর্কযুক্ত দরাফ খান নামক জনৈক প্রাদেশিক সুবাদারের উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই। এই দরাফ খান খানে খানান বৈরাম খানের প্রপৌত্র এবং খান খানান মীর্জা আব্দুর রহিমের পুত্র ছিলেন। সম্রাটের আদেশে ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে তাহাকে হত্যা করা হয়। অনেকে এই দরাফ খান ও গঙ্গা স্তোত্রের রচয়িতাকে একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করেন।

বাংলায় সেন বংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে কণৌজ দেশীয় ব্রাহ্মণেরা এদেশে আগমন করেন। ইহাদের প্রভাবের ফলে বাংলার উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা এখানকার সাধারণ শ্রেণীর লোক হইতে সম্পূর্ণভাবে আলাদা হইয়া যায়। যে অন্যায় ও উৎপীড়নের ফলে ভারত হইতে বৌদ্ধ ধর্মের নাম নিশানা মুছিয়া যায়, এই উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের প্রভাবে সেন রাজাদের যুগে তাহা চরম আকার ধারণ করে। এই সময়কার বৌদ্ধগণ নাথ মতবাদের ছদ্ম আবরণে নিজেদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে বুদ্ধকে 'ধর্ম-ঠাকুর' এই হিন্দু নামে আখ্যায়িত করিতে শুরু করেন। তাঁহাদের আসল নাম ত্যাগ করিয়া তাঁহারা নিজদিগকে 'সদ্ধর্মী' নামে পরিচিত করেন এবং হিন্দুদের নাম দেন 'পাষণ্ডী'। শূন্য পুরাণে এইরূপ লেখা হইয়াছে যে, বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সদ্ধর্মীদের নিকট তাহাদের সামর্থ্যের অধিক অর্থ দাবী করিয়া তাহাঁদের ঘর বাড়ী পুড়াইয়া দিয়া এবং নানাভাবে তাহাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন চালাইয়া এদেশে তাহাদের জীবন বিপন্ন করিয়া তোলে। নিরুপায় হইয়া বৌদ্ধগণ তাঁহাদের রক্ষা করার জন্য ধর্ম ঠাকুরের নিকট এইভাবে প্রার্থনা জানান···

···"হিন্দুরা বলিষ্ঠ হইল বড়, দশ বিশ হৈয়া জড়
সদ্ধর্মীরে করায় বিনাশ ॥
বেদে করে উচ্চারণ, বের্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিআ সবাই কম্পমান।
মনেতে পাইআ মর্ম, সভে বোলে রাখ ধর্ম,
তোমা বিনে কে করে পরিত্রান ॥

(১) নিত্য কর্ম কৌমুদী ২০৮—৯ পৃষ্ঠা।

যখন ব্রাহ্মণেরা অত্যাচারে উৎপীড়নে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব এমনি বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল তখন ইছলাম গ্রহণের মাধ্যমে তাহারা এই অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি লাভের একটা উপায় খুঁজিয়া পায় এবং বহু বৌদ্ধ এছলাম গ্রহণ করে। অনুরূপ কারণে অনেক নিগৃহীত হিন্দুও এছলামের ছায়াতলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ধর্মান্তকরণ ক্রমে ক্রমে এবং সম্ভবতঃ মুছলিম বাংলার ইতিহাসের আমাদের কথিত প্রথম যুগের সমগ্র সময়কাল ব্যাপিয়া চলিতে থাকে। আমাদের কথিত দ্বিতীয় যুগে মুছলিম জনসাধারণ বিশেষ করিয়া তাহাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এরূপ এক কলুষিত এছলাম-বিরোধী আবহাওয়ার মধ্যে অবস্থান করিতেছিল যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে ধর্মান্তরিত এই সমস্ত নও মুছলমানদের পক্ষে এছলামের সত্যকার শিক্ষা ও আদর্শের সহিত পরিচিত হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না। সুতরাং কোন সময়ে সরাসরিভাবে এবং কোন সময়ে আরবী ফারসী নামের আবরণে তাহারা হিন্দু ও বৌদ্ধদের দেব-দেবী এবং কুসংস্কার সমূহকেই তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে পায় এবং এই সমস্তই পুনরায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তদুপরি দ্বিতীয় যুগে বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে নবাব বাদশাহগণ যে সমস্ত মারাত্মক মত-বিশ্বাস প্রচারিত করেন তাহা অন্যান্য মুছলমানের মনকেও দ্বিধাহীনভাবে পুরাতন হিন্দু প্রতিমা পূজা, ক্ষতিকর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং যৌন উচ্ছৃঙ্খলতাকে বরণ করিয়া লওয়ার জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে। সৈয়দ জাফর শাহ বিরচিত কালীস্তোত্রের কথা অনেকেই জানেন। মুছলিম বাংলার পতন যুগের ইতিহাস পাঠ করিলে কালী ও গঙ্গার স্তোত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক গীত রচনা করিয়াছেন এরূপ বহু সৈয়দ, মীরজা ও পাঠান কবির সাক্ষাৎ আমরা পাইব। আকবর কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে স্থানান্তরিত একদল ধর্মদ্রোহী পীর ও ফকিরের আগমনের ফলে এই সময় অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

মুছলমান জনসাধারণ কিরূপ সরাসরিভাবে হিন্দুদের দেব-দেবীদিগকে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা দেখাইবার জন্য ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন বলিতেছেনঃ গাজী ও দক্ষিণারায়ের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ বিষয়ে রচিত "কালু গাজী ও চম্পাবতী" নামক পুঁথি এবং অনুরূপ অন্যান্য পুঁথি কাব্যে ব্যাঘ্র সম্পর্কিত গীতি কবিতা বা বাঘের পাঁচালীতে আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দু দেবী গঙ্গাকে গাজীর দাসী রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। "জেবুল মুলক শামা রুখ" কাব্যে দেখা যায় যে, মুছলিম কবি হিন্দু দেবদেবীগণকে মুছলমানের পীর রূপে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। (১)

ডঃ এনামুল হক এম, এ, পি, এইচ ডি এবং মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ "আরাকান রাজ সভায় বংলা সাহিত্য" নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইহার ভূমিকায় ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, সাহিত্য বিশারদকে দ্রোনাচার্য্য এবং ডক্টর

(১) শুধু পীরগণই নহে পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, হিন্দু দেবতাগণও আল্লাহ ও রছুলের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন।

The story of the boy Hussain once serving as a shepherd to a local Brahmin who, discovering in him supernatural signs of future greatness, sent him to Gaur and whom the king Hussain later rewarded with the zamindari of the village on the nominal revenue of one anna (Ekani Chandpara) is too much like the story of Hasan Gangu Bahmani's early life to merit unqualified acceptance, but his association in early life with this part of Murshidabad seems well-established."
History of Bengal, edited by: Sir Jadunath Sarker, Vol—11, Ch, Vii, Pages—142-43.

"…প্রায় সকল ঐতিহাসিক বিবরণেই তাঁহাকে একজন আরব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (১) এবং বলা হইয়াছে, তিনি তাঁহার পিতা ছৈয়দ আশরাফের সহিত এই সময়ের অল্প কিছুকাল পূর্ব্বে মাত্র বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম জীবনের ঘটনাবলী বহু উপাখ্যান ও লোক কাহিনীর বিষয়বস্তু হইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত উপাদান ও লোক-কাহিনীর অধিকাংশের ঘটনা-কেন্দ্র হইতেছে বর্তমানে 'একানি চান্দপাড়া' নামে পরিচিত মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার একটি গ্রাম। এই গ্রামে বেশ কিছু সংখ্যক প্রাচীন ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। জনশ্রুতি ও শিলালিপির নির্দেশ অনুযায়ী এই সমস্ত ভগ্নাবশেষ হোছেন শাহের আমলের (২)। ছৈয়দ আশরাফ তাঁহার দুই পুত্রসহ গৌড়ে গমনকালে চান্দপাড়া নামক একটি রাঢ় গ্রামে স্থানীয় কাজীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কাজী

(১) রিয়াজের লেখক (১২৯-৩১ পৃ:) তাঁহাকে ছৈয়দ শরীফ মক্কী নামে অভিহিত করিয়াছেন, এ সম্পর্কে ফিরিশতা (২য় খণ্ড, ৫৮৫ পৃ:) অপেক্ষা পূর্ববর্ত্তী বা অধিক নির্ভরযোগ্য কোন দলিল পেশ করা যায় না। দলিলের ধারণা, তাঁহার পিতা আশরাফ-উল-হোছেইনী সম্ভবতঃ মক্কার শরীফ ছিলেন কিন্তু তিনি দীর্ঘদিন হইতে তিরমিজে বসবাস করিতেছিলেন। যে সব আরব বণিক প্রথমে চট্টগ্রামে অবতরণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সিংহাসন দখল করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে জোয়াও ড বারোজ (joao de barros) হোছেনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বুকানন হামিলটন মার্টিনের ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া নামক পুস্তকে (৩য় খণ্ড, ৪৪৮ পৃষ্ঠা) রংপুর জেলার উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত হোছেন সম্পর্কিত জনশ্রুতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই জনশ্রুতি অনুযায়ী হোছেন ছিলেন উক্ত অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসী। 'গোবিন্দগঞ্জ হইতে ষোল মাইল দূরবর্ত্তী দেবনগর নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়, এবং লেখক (হামিলটন মার্টিন) কর্ত্তৃক পাণ্ডুয়ার আবিষ্কৃত একখানি নামহীন ইতিহাসের পাণ্ডুলিপির বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ধর্মান্তরিত হিন্দু রাজা জালালুদ্দিন কর্ত্তৃক বিতাড়িত গৌড়ের ছোলতান এবরাহীমের প্রপৌত্র ছিলেন। এই ঘটনা অর্থাৎ জালালুদ্দিন কর্ত্তৃক গৌড়ের সিংহাসন অধিকৃত হওয়ার পরে ছোলতান এবরাহীমের পরিবার কামতাপুরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার ৭৬ বৎসর পরে হোছেন তাঁহার পূর্বপুরুষের হৃত সিংহাসন উদ্ধারের এক সুযোগ লাভ করেন।

(২) জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৯১৭ খৃ:, ১৪৩—৫১পৃষ্ঠা, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে হোছেন শাহের রাজত্বকালের প্রথম দিককার কম পক্ষে ৪ খানি উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ জার্ণাল, ১৯১৭ খৃ:, ১৪৮—১৫০পৃ:, ১৯২১খৃ:, ১৪৯পৃষ্ঠা।

অতিথির সম্ভ্রান্ত বংশ-পরিচয় জানিতে পারিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হোছেনের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দেন এবং হোছেন তাঁহার শিক্ষালাভ সমাপ্ত করিয়া গৌড়ে গমন করেন ও তথায় মোজাফ্‌ফর হাবশী সরকারের অধীনে একটি নিম্নপদ গ্রহণ করেন—কোন অজ্ঞাত পরিচয় লেখকের রচিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার বরাত দিয়া সলিম এই ধরনের একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

হোছেন স্থানীয় একজন ব্রাহ্মণের অধীনে রাখালের চাকুরী করিতেন। হোছেন ভবিষ্যতে একজন বড়লোক হইবেন উক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার মধ্যে এইরূপ অলৌকিক লক্ষণ দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে গৌড়ে প্রেরণ করেন এবং হোছেন ছোলতান হইয়া পরবর্ত্তীকালে এই ব্রাহ্মণকে মাত্র এক আনা রাজস্বের বিনিময়ে উক্ত গ্রামের জমিদারী দান করেন বলিয়া যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা হুবহু হাছান গাঙ্গু বাহমনীর প্রথম জীবনের কাহিনীর অনুরূপ। কাজেই ইহাকে বিনা বিচারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তবে হোছেনের প্রথম জীবনের সহিত মুর্শিদাবাদ জেলার এই অংশের সম্পর্ক প্রায় অবিসম্বাদিতরূপেই সত্য বলিয়া অনুমিত হয়। এ সম্পর্কে আমরা নিম্নে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করিতেছি।

হোছেন শাহের পূর্ব্ব পরিচয় যাহাই হউক না কেন, তিনি যে জীবনের প্রথম ভাগেই মোজাফফর শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাবাদী সম্মত অভিমত। সব ইতিহাসেই বর্ণিত হইয়াছে যে, মোজাফফর শাহ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট আস্থাবান ছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত রাজস্বের সকল বিষয় পরিদর্শনের আম মোখতারের অধিকার সম্পূর্ণ তাঁহাকে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। এই অনুরক্ত ও বিশ্বাসভাজন হোছেন শাহ শেষে তাঁহার উজীরে আজমের সর্ব্বপ্রধান গৌরবজনক পদে, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পর তাঁহার মতিগতি পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই পরিবর্ত্তনের বাস্তব ফলাফল কি দাঁড়াইয়াছিল, পাঠক তাহা ফেরেশতা ও রিয়াজের লেখকগণের মুখে শ্রবণ করুন :—

(মোজাফফর শাহ) "রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর অতিশয় দায়িত্বহীন হইয়া পড়েন, আলেম ও আশরাফদিগের কতিপয় সৎ ও সাধু ব্যক্তিকে কতল করিয়া ফেলেন, এবং যেসব অমুছলমান সামন্ত ও প্রধান ব্যক্তি বাঙ্গলার ছোলতানদিগের শত্রুতায় সর্বদাই কোমর বাঁধিয়া থাকিতেন, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাইয়া তাহাদিগকে নিহত করেন। ধনভাণ্ডার সংগ্রহ করার প্রতি তাঁহার আগ্রহ বাড়িয়া যায়। তাহার পর—

چون سید حسین شریف مکی در ایام وزارت اخلاق جمیله با جمیع مردم مرعی داشته، همیشه بگوش خلایق میرسانید که مظفر شاه از یکے خسیس ودنی المزاج است،

قابل بادشاهی نیست هر چند که من اورا درباب رفاه سپاه و امرا ناصح شده مانع ازقبایح اعمال می شدم سودمند نیفتاد، بجمع کردن زر مشغول می شود- ازین امرا اورا مشفق ومهربان وغمخوار خود تصوری میکردند-

যেহেতু ছৈয়দ হোছেন মক্কী তাঁহার ওজারত কালে সকল লোকের সহিত সৎব্যবহার করিতেন, সে মতে তিনি সদাসর্বদা সর্বসাধারণের কর্ণগোচর করিতেন যে, "মোজাফফার শাহ হইতেছে অতিশয় নীচাত্মা মানুষ, বাদশাহ হওয়ার উপযুক্ত সে নহে। আমি তাঁহাকে কত কহিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছি—ছিপাই সৈন্যের এবং আমীর ওমরাদের অভাব অভিযোগের অবসানের উপদেশ দিয়াছি, কুকর্মগুলি হইতে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়াছি। কিন্তু তাহার কোন ফল হয় নাই। শুধু ভাণ্ডারে অধিক পরিমাণে স্বর্ণ সঞ্চয় করার চেষ্টায় সে সর্বদাই সম্মোহিত হইয়া থাকে। ইহার এইসব প্রচারণা চালাইবার ফলে আমীর ওমরারা তাহাকে নিজেদের প্রতি করুণাপরায়ণ, ও মেহেরবান এবং সহানুভূতিশীল বলিয়া মনে করিতেন। (রিয়াজ ও ফেরেশতা)।"

ইহা হইতেছে তাঁহার চরিত্রের একটি দিক। এখানে তাঁহার রাজনৈতিক প্রচারণার নিপুণতা সুস্পষ্টরূপে ভাস্বর হইয়া উঠিতেছে। অথচ উল্লিখিত ইতিহাস দুই-খানিতে দেখা যাইতেছে যে, যাঁহার কৃপায় তিনি আজ অতি সামান্য অবস্থা হইতে ছোলতান মোজাফফরের প্রধান উজীরে আজম পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই প্রভু ও প্রতিপালককে অনায়াসে নীচাত্মা ও কুকর্মরত মহাপাতকীরূপে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন—শুধু সিংহাসন লাভের স্বপ্নসাধকে বাস্তবে রূপায়িত করার উপলক্ষ্য হিসাবে। এই বিশ্বাসঘাতকতায় ও এই কৃতঘ্নতায় তাঁহার পবিত্র চরিত্রে একবিন্দুও দোষ স্পর্শ করিতে পারিতেছে না!

আমাদের কোনো কোনো পাঠক বোধ হয় শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, উজীরী পদ লাভের পর হইতে তিনিই ছোলতান মোজাফফারকে নানা প্রকার অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য অবিরতভাবে পরামর্শ দিয়া আসিতেছিলেন। ইতিহাস আজ অনাবিল ভাষায় মোজাফফর শাহ সম্বন্ধে ঘোষণা করিতেছে ঃ—

بتجویز سید حسین مواجب سوار وپیاده را کم کرده در تعمیر خزانه کوشید، ودر تحصیل خراج نیز سختگیریها پیش نهاد- لهذا عالمے از دست منادی شده متنفر گردید رفته رفته دل دگر گون کرد، تاکارے بجاے رسید که در سنه ۹۰۳ بسیارے از امراے کبار او بر گشته شده خروج کردند-

"ছৈয়দ হোছেনের পরামর্শ অনুসারেই মোজাফফর শাহ ছওয়ার ও পদাতিক সৈন্যগণের অবশ্য প্রাপ্য বেতনাদি কম করিয়া দিয়া নিজের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করার

চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং 'খাজনা' আদায় সম্বন্ধে (প্রজাবর্গের) প্রতি নানাপ্রকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এই কারণে বিপুল সংখ্যক লোক মোজাফফর শাহের প্রতি এমন ভাবে বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়িল যে, ৯০৩ সালে, প্রধান প্রধান ওমরা ও সামন্ত রাজাগণ বিমুখ হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং সামরিক অভিযান আরম্ভ করিয়া দিল।" (ঐ, ঐ)।

বিদ্রোহী বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন ছৈয়দ হোছেন স্বয়ং। এই আক্রমণের মোকাবেলা করার জন্য মোজাফফর শাহ পাঁচ হাজার হাবশী এবং তিন হাজার পাঠান ও বাঙ্গালী সৈন্য নিয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময় অভ্যন্তর ভাগে ও বহিরাঞ্চলে সংঘাত সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়া যায়। এই সময়কার নিহতদের সংখ্যা চার হাজারে পৌঁছিয়া যায়। মোজাফফর শাহ অবশেষে দুর্গদ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন এবং লোকলশকরসহ ছৈয়দ হোছেনের মোকাবেলায় ময়দানে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষের বিশ হাজার সৈন্য নিহত হইল। অবশেষে বিদ্রোহী দল জয়যুক্ত হইল এবং নিজের অন্তরঙ্গ ও বিশিষ্ট বন্ধু বান্ধবসহ মোজাফফর শাহ کشتۂ شد در میدان—যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হইলেন। হাজী মোহাম্মদ কান্ধারীর বর্ণনা মতে, ঐ সময় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত সংগ্রাম-সংঘর্ষে এক লাখ বিশ হাজার মুছলমান ও অমুছলমান নিহত হইয়াছিল। ছলিম এখানে জানাইতেছেন যে, নেজামুদ্দিন কৃত ইতিহাসের মতে, মোজাফফরের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব বিরূপ হইয়া যাওয়ার পর ছৈয়দ শরীফ মাক্কী ইহাকে সুবর্ণ সুযোগ বলিয়া মনে করিলেন এবং পাইকদের ছর্দারদিগকে নিজের মতে আনিলেন। ইহার পর একরাত্রে তেরজন পাইককে সঙ্গে লইয়া মোজাফফরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিলেন। (ঐ, ঐ)।

আমি শেষোক্ত মতের সমর্থন করিতে পারিতেছি না। কারণ, মোজাফফর শাহ বিদ্রোহীদের উত্থানের পূর্বে নিহত হইয়া থাকিলে দীর্ঘ সময়ব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহের আর কোনো দরকারই ছিল না। ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, মোজাফফর নিহত হওয়ার পরেই ছৈয়দ হোছেন শাহ তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিয়া নিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, হোছেন যে মোজাফফরকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা অবিসম্বাদিত সত্য।

হোছেন শাহ তখ্‌তে আরোহণ করিবার পর নিজকে "ছৈয়দ ছোলতান আলাউদ্দীন হোছেন শাহ, শরীফে মক্কা" নামে জাহির করিয়াছিলেন। হোছেন শাহ প্রকৃতপক্ষে ছৈয়দ ছিলেন কিনা, তাহা আমাদের জানা নাই, জানার কোনো দরকারও আমাদের নাই। তবে নিজেকে "শরীফে মক্কা" বলিয়া দাবী করার কোনো অধিকার তাঁহার ছিল না। মক্কার শরীফরা নিয়োজিত হইতেন তুর্কী ছোলতানদিগের দ্বারা। মক্কা শরীফের সম্ভ্রমের প্রতি লক্ষ রাখিয়া ছোলতান মোছলেম জগতের খলিফা হিসাবে, "শরীফ" নিযুক্ত করার অধিকারী ছিলেন। ইহা আমাদের 'গভর্ণর' প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তিগত উপাধি, গোত্রগত পদবী নহে।

১৭শ অধ্যায়

উপরে হোছেন শাহের পরিচয় অতি সংক্ষেপে দেওয়া হইল। ঐতিহাসিকগণ তাঁহার সম্বন্ধে যে সব বিবরণ দিয়াছেন, সে সব পরস্পর-বিরোধী ও প্রধানতঃ অনুমানমূলক। পক্ষান্তরে কোনো কোনো লেখক নিজ নিজ মানসিকতা অনুসারে তাঁহার সঙ্কলিত তথ্যগুলিকে সোজাসুজিভাবে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত না করিয়া, দরকার মত পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া নিয়াছেন। অবশ্য একথাও এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের অনেকে পূর্ববর্ত্তী লেখকগণের পুথি পুস্তকে—সাধারণতঃ ঐগুলির ইংরাজী অনুবাদে সন্তোষজনকভাবে কোন সঙ্গত তথ্যের সংবাদ না পাইয়া স্থানে স্থানে নিজেদের অনুমানের উপর নির্ভর করিতেও বাধ্য হইয়াছেন। সে যাহা হউক, তাঁহারা সকলেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। কারণ, তাঁহারা ঐ তথ্যগুলি সঙ্কলন করিয়া না রাখিলে আমাদের পক্ষে সেগুলি সম্বন্ধে বিচার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অধিকতর কষ্টসাধ্য হইত। আলোচনার সুবিধার জন্য বিশ্বকোষ সম্পাদকের প্রদত্ত তথ্যগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:

"আলাউদ্দীন হুসেন শাহ স্বীয় প্রতিপালক ও প্রভু হাবশী বংশীয় রাজা মুজঃফর শাহকে নিহত করিয়া বঙ্গ সিংহাসন অধিকার করেন। রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া 'ছৈয়দ হুসেন আলাউদ্দীন শরীফ মক্কা' নাম ধারন করেন।" ইহার পর তিনি রিয়াজুছ ছালাতীনের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছেন:—

"গৌড়ের স্তম্ভ খোদিত লিপিতে তাহার হুসেন শাহ নাম বিদ্যমান আছে। অনুমান হয় তাঁহার পিতা বা তদ্বংশীয় কোনো পূর্বপুরুষ (!) মক্কার সেরিফ ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই বংশ গরিমা স্মরণ করিয়া তিনি ঐ নাম প্রকাশ করিয়া থাকিবেন।"

বিশ্বকোষ প্রণেতা আরও বলেন:

"তিনি পূর্ববর্তী সুলতানগণের ন্যায় হীনজাতীয় ছিলেন না। ইসলাম ধর্ম্ম প্রবর্তক হজরত মহম্মদের বংশে তাঁহার জন্ম। আরবের মরুভূমি ত্যাগ করিয়া তিনি সৌভাগ্যান্বেষণে বাঙ্গলায় উপনীত হন। গৌড়পতি তাঁহার আভিজাত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার কার্যদক্ষতায় ও বিনয়-নম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া সুলতান তাঁহাকে রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম উজিরপদ দান করেন। মন্ত্রিপদে অবস্থানকালে তিনি সকল শ্রেণীর ওমরাহ ও সামন্তদিগের প্রতি যেরূপ সদয়-ব্যবহার করিতেন এবং সকল কার্যে যেরূপ দক্ষতা দেখাইতেন, তাহাতে সকলেই তাঁর প্রতি প্রীত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিল। অদৃষ্ট-চক্রে পাশব প্রকৃতি মুজঃফরের অসহনীয় অত্যাচার তিনি শির পাতিয়া বহন করিতে বাধ্য হন। অবশেষে বিশেষ সঙ্কটে পড়িয়াই তিনি রাজ বিদ্রোহী হন। সৌভাগ্যবশে পরিচালিত হইয়া অতঃপর তিনি বঙ্গালার রাজ

সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সকল শ্রেণীর মুসলমান সামন্ত এবং হিন্দুরাজগণ তাঁহাকেই রাজসিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তিনিও পক্ষান্তরে তাঁহাদের মনোরঞ্জনার্থ নির্দ্দিষ্ট সময় মত গৌড়-রাজধানী লুণ্ঠনের আদেশ দেন। ঐ সময়ে গৌড় নগরের অনেক ধনশালী হিন্দু প্রজা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।"

পূর্ব্বোক্ত নগর-লুণ্ঠন-ব্যাপার উপর্যুপরি কয়দিন অবাধে চলিতে লাগিল। সুলতান ইসলাম ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া হিন্দুর এই সর্ব্বনাশ দেখিয়াও দেখিলেন না। কিন্তু অচিরেই দীনহীন প্রজার আর্ত্তনাদে তাঁহার ধর্ম্ম-প্রাণ বিগলিত হইয়া উঠিল। তিনি হিন্দুর প্রতি চিরন্তন বিদ্বেষ ভুলিয়া লুণ্ঠন বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। লুব্ধ সর্দ্দারবৃন্দ ও সৈনিক সম্প্রদায় এবং অন্যান্য মুসলমানগণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তখন রাজাদেশ লঙ্ঘন করিল। তাহাদের পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইল না। রাজ্য ক্রমশঃই অরাজক ও দস্যুপ্রধান হইয়া দাঁড়াইল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সুলতান সৈয়দ হুসেন শাহ অত্যাচারী মুসলমানদিগের শিরচ্ছেদের আদেশ দিলেন। দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ সহস্র মুসলমান নিহত হইল এবং রাজাজ্ঞায় তাঁহাদের সংগৃহীত অর্থরাশি রাজকোষে সমাহৃত হইল।"

"অতঃপর যখন আলাউদ্দিন দেখিলেন যে, হাবসী সৈন্য ও দেশীয় পাইকগণই দেশে যাবতীয় রাজকীয় গোলযোগের একমাত্র কারণ; তখন তিনি তাহার প্রতিবিধানে উদ্যোগী হইলেন; তদুদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি হাবসীদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন এবং পাইকদিগকে বাঙ্গালার পশ্চিম দক্ষিণ সীমায় অল্প নিকর ভূমি দিয়া বিপক্ষের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন।"

"আলাউদ্দিন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই হাবসী নির্ব্বাসনরূপ এই দেশহিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। হাবসী ও খোজাদিগের অত্যাচার হইতে হিন্দু প্রজাদিগকে রক্ষা করায় তিনি সাধারণের পূজনীয় হইয়া পড়েন। অত্যাচারক্লিষ্ট হিন্দুগণের মলিন মুখ সন্দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব্ব দয়ার উদ্রেক হয়, তদবধি তিনি অপত্য নির্ব্বিশেষে ও বিশেষ ন্যায়পরায়ণতার সহিত বঙ্গরাজ্য শাসন করেন। তিনি হিন্দু মুসলমানে বিশেষ প্রভেদ রাখিতেন না।"

"এই সময়ে তিনি একডালা দুর্গের সংস্কার করিয়া তথায় রাজপ্রাসাদ মনোনীত করেন এবং তথা হইতে রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যবস্থা আজ্ঞা করিতেন। উচ্চবংশীয় ও সম্ভ্রান্ত সৈয়দ, মোগল ও পাঠানদিগকে তিনি রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া আপনার রাজ্যভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব হিন্দুদিগকেও যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া তাহাদিগকে রাজানুগ্রহ দান করিতেন। নানা শাস্ত্রবিশারদ ও বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীরূপ ও সনাতন তাঁহার মন্ত্রী হইয়াছিলেন।"

(বিশ্বকোষ, ১৭শ খণ্ড, ৪৪০—৪৪১ পৃষ্ঠা)

বিশ্বকোষ সম্পাদকের বর্ণিত এই বিবরণ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৌড়-রাজ্যের মুছলমান সামন্ত ও হিন্দু রাজাদিগের সহিত হোছেন শাহের একটা গুরুতর রকমের ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। এই ষড়যন্ত্রের একপক্ষ ছিলেন হোছেন শাহ এবং অন্য পক্ষ ছিলেন মুছলমান সামন্ত ও হিন্দু রাজা রাজড়ার দল। এ বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে সাব্যস্ত হয় যে—(১) এই সামন্তবর্গ সকলে সমবেতভাবে হোছেন শাহকে রাজসিংহাসন লাভের একমাত্র অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিবেন, (২) আলাউদ্দীন সিংহাসন লাভের পর একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য শহরে লুটতরাজ চালাইবার অনুমতি বা আদেশ প্রদান করিবেন। (৩) শহরে লুটতারাজ চালাইবার অনুমতি দেওয়া হইবে "ষড়যন্ত্রকারী মুছলমান সামন্তদিগের ও হিন্দু রাজন্য বর্গের মনোরঞ্জন" করার উদ্দেশ্যে। তাহাদিগের মনোরঞ্জন করার এই দায়িত্ব হোছেন শাহ গ্রহণ করিয়াছিলেন, গৌড় রাজ্যের সিংহাসনের বিনিময়ে।

বিশ্বকোষ সম্পাদকের মতে হোছেন শাহের পূর্ব্ববর্ত্তী ছোলতানগণ সকলেই হীন-জাতীয় ছিলেন, কিন্তু হোছেন ছিলেন ইছলাম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদের বংশধর। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি সৈয়দ ও খাঁটি আরব। সৌভাগ্য অন্বেষণে তিনি বঙ্গদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সব দাবীর কোনো প্রমাণ সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত করেন নাই। মোজাফফর শাহকে তিনি পামর বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন, অথচ আভিজাত্যগর্ব্বিত ছৈয়দ কুলতিলক হোছেন শাহ দীর্ঘকাল ধরিয়া এই পামরের পরিচর্য্যায় অতিবাহিত করিয়াছেন, ইহার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া "প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব" মহাশয় এক কথায় বলিয়া দিতেছেন—"অদৃষ্ট চক্রে"। কিন্তু যাঁহারা নিরপেক্ষ মন নিয়া আলোচ্য "তথ্য"গুলির বিচার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইহা অ-দৃষ্ট চক্রের নহে, বরং সুদৃষ্ট চক্রান্তের ফল।

লুটতরাজের কাজ কয়েকদিন ধরিয়া অব্যাহতভাবে চলিতেছিল, কিন্তু এই সর্ব্বনাশ দেখিয়াও হোছেন ইহার প্রতিকার চেষ্টা করেন নাই—"ইছলাম ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া"। পূর্ব্বে তিনি ছিলেন একজন মহানুভব উদার হৃদয় বিশ্বৈব-কুটুম্ব-কম শ্রেণীর ভদ্রলোক। শহর লুণ্ঠনের আদেশ দেওয়ার সময়ও তাঁহার এই মহানুভবতার কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কিন্তু "অচিরে" এমন এক বিস্ময়কর পরিস্থিতির উদ্ভব হইল যে, হোছেনের অন্তর "ধর্ম্মপ্রাণ দীনহীন প্রজার আর্ত্তনাদে বিগলিত হইয়া উঠিল এবং তিনি হিন্দুর প্রতি চিরন্তন বিদ্বেষ ভুলিয়া লুণ্ঠন বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন।" ঐতিহাসিক তথ্যের ন্যায় এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক গ্রন্থকারের মানসিক-তারও পরিচয় উপরের উদ্ধৃতাংশে বেশ কিছুটা পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া ঐ মন্তব্যগুলি সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইতেছি। একই হোছেন শাহ কএকদিনের মধ্যে কত প্রকার পরস্পর বিরোধী বিশেষণে বিভূষিত হইতেছেন,

পাঠকগণ ঐ মন্তব্যগুলি হইতে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন। ইহার মধ্যে যে অদৃষ্টচক্র বা সুদৃষ্ট চক্রান্ত নিহিত আছে, আমরা উপরে তাহার আলোচনা করিয়াছি। এখানে মাত্র আর একটি মন্তব্যের উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

ছোলতান হোসেন শাহ শহর লুণ্ঠনের অনুমতি দিয়াছিলেন কাহাদিগকে, বিশ্বকোষ সম্পাদকের অসঙ্গত মন্তব্যগুলি হইতে সে সম্বন্ধে একটা জিজ্ঞাসা এখানে উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার স্বীকারোক্তি হইতেই স্পষ্ট ভাবে জানা যাইতেছে যে, চক্রান্তকারী সামন্তবর্গের মনস্তুষ্টির জন্যই এই লুটতারাজের আদেশ ও অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলিত অর্থ এই যে, গৌড়ের রাজসিংহাসন এখানে কেনা বেচার ব্যবস্থা করা হইতেছে। হোছেন সিংহাসন লাভ করিবেন, এবং তাহার বিনিময়ে লুণ্ঠিত ধনসম্পদ প্রাপ্য হইবে সামন্তদিগের। বৈষয়িক ব্যাপার ছাড়াও আর যেসব প্রতিশ্রুতি হোছেন শাহ অন্য পক্ষকে প্রদান করেন, তাঁহার ভাবী কার্য্যকলাপ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

প্রথমতঃ, (বিশ্বকোষের বর্ণনা মতে) হোছেন শাহ কঠোর শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া লুটেরাদিগের নিকট হইতে প্রায় সমস্ত ধনসম্পদ উদ্ধার করিয়া তাহা দ্বারা সামন্তবর্গের মনোরঞ্জন না করিয়া তিনি নিজেই দখল করিলেন এবং সুরক্ষিত রাজ-ভাণ্ডারে তাহা সঞ্চিত হইল। ইহার ফলে চক্রান্তের অন্যপক্ষ স্বাভাবিক ভাবে অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া পড়িলেন। "তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ছোলতান সৈয়দ হোসেন শাহ আততায়ী মুসলমানদিগের শিরোচ্ছেদের আদেশ দিলেন, দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ সহস্র মুসলমান নিহত হইল এবং রাজাজ্ঞায় তাহাদের সংগৃহীত অর্থরাশি রাজকোষে সমাহৃত হইল।"

ইহা হইতে জানা যাইতেছে, শহর লুটের আদেশ বা অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল কেবল মুছলমান দিগকে, এবং লুটতরাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিল কেবল গৌড়-নগরের মুছলমান সমাজ। অথচ লুটতরাজের ব্যবস্থা করা হয় স্থানীয় সামন্ত-বর্গের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। এই দ্বাদশ সহস্র মুছলমানের কর্ত্তিত শির ধুলায় লুণ্ঠিত দেখিয়া আমাদের উদার হৃদয় ঐতিহাসিক মহাশয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আলাউদ্দিনের অন্যান্য রাজনৈতিক কুকর্ম্মের বিবরণ দিতেছেন:—হাবশীদিগকে তিনি "স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেশান্তরিত করিলেন, নীচ জাতীয় মুসলমানদিগকে সকল প্রকার রাজকর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিলেন এবং বাছিয়া বাছিয়া উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদিগকে তাহাদের স্থলে নিযুক্ত করিলেন।"

উপসংহারে আমরা এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, ছোলতান হোছেন নামে পরিচিত এই ভদ্র লোকটীর জাতি, ধর্ম্ম, পূর্ব্বাসন এবং তাহার উপাধি সম্বন্ধে

কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বহু অনুসন্ধান সত্ত্বেও আমরা এপর্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই।

এই প্রসঙ্গে কএকটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার আছে :—

(১) হোছেন শাহের পিতা ভাগ্য অন্বেষণের অভিপ্রায়ে, মক্কার বসবাস ও 'শরীফে মক্কার' পদ ত্যাগ করিয়া গৌড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন, এইটুকু তথ্য প্রকাশ করিয়াই ইতিহাস লেখক বা কিংবদন্তী সঙ্কলকগণ, তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ দিতেছেন না। ইহার কারণ কি? হোছেন শাহ ২৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই সময় তাঁহার পিতা কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছিলেন, কুত্রাপি ঘুনাক্ষরেও তাহার কোনো আভাস ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে না। হোছেন শাহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্বন্ধেও এই অবস্থা।

(২) হোছেন শাহ বামনী বলিয়া আর এক হোছেন শাহের সংবাদ পাওয়া যায়। "তিনি মুছলমান হইলেও" একজন ভদ্রলোক ছিলেন বলিয়া পূর্ব্বকালের স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছিল। এই দুই হোছেন কি একই ব্যক্তি? এক ব্যক্তি স্বীকার করা অসম্ভব, কারণ উভয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যগত অনেক পার্থক্য দেখা যায়। অথচ আমাদের কিংবদন্তী সঙ্কলক ইতিহাসকারেরা এই দুইটি ব্যক্তিজীবনকে একত্র মিশাইয়া এমন একটা জগাখিঁচুড়ি পাকাইয়া দিয়াছেন যে, আলোচ্য বিষয়-গুলিকে ইতিহাস বলিয়া কোনো মতেই স্বীকার করা যায়না।

পুকুর কাটার কাজে কিছু ত্রুটি ঘটার ফলে যে ব্রাহ্মণ ঠাকুর, হোছেন শাহকে একদিন বেতপিটা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি মাত্র বাৎসরিক এক আনা খাজনায় একটা মউজা বা তালুক মৌরূশী মোকররী সত্তে পাট্টা করিয়া দিতেছেন, অন্যদিকে নিজের পিতার বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্য কিছুমাত্র ব্যবস্থা করিতেছেন না, ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

(৩) এই প্রসঙ্গে সবচাইতে বিভ্রান্তিকর বিষয় হইতেছে—শরিফে মক্কার আমদানী! "মক্কার শরীফ" সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, সেকালে শরীফরাই ছিলেন হেজাজ প্রদেশের শাসন পরিচালনের সর্ব্বময় কর্ত্তা, প্রকৃতপক্ষে ঐ দেশের একচ্ছত্র অধিপতি বা বাদশাহ; বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, অতুলনীয় রাজপ্রাসাদের মালেক। ভাগ্য তাঁহার বা অধীন সহকারী শরীফদিগের প্রতি যথেষ্ট অনুকূল ছিল, এবং সে অবস্থায় "ভাগ্য অন্বেষণের জন্য" তাঁহাদের মক্কা হইতে জঙ্গীপুর বা রঙ্গপুর পর্যন্ত ছফর করার আদৌ কোনো দরকার ছিল না।

মক্কার শরীফগণের অধিকার ও বৈষয়িক সংস্থান সম্বন্ধে কএকটা সন্দেহাতীত প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

الشريف—يلقب شريف مكة بسيد الجميع تميزاله من بقية الا شراف و هو الحاكم الذى لا ينازع فى امر ولا يرد له قول ينفى من شاء و يحبس من شاء و يعاقب من شاء بيده عقد الامور و حلها و كل الحكام بمكة طوع اشارته - من كبرهم احمد راقب باشا المشير الى صغيرهم - فان عارضه واحد منهم عزل فى الحال لان الشريف له يد قوية فى الدولة فاى الامور طلب اجيب اليه بل غالب الشكايات منه ترد اليه ليفصل فيها بما شاء من شرع او هوى ولا معقب لحكمه فالويل كل الويل لمن شكا -

অর্থাৎ মক্কার শরীফ অপর শরীফগণ হইতে আলাদা ভাবে পরিচয়ের উদ্দেশ্যে ছৈয়দ-প্রধান বা সকলের ছৈয়দ (سيد الجميع) বলিয়া খ্যাত হইতেন।

শরীফ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হাকিম। শরীফ-প্রধানের কোন নির্দেশ কেহ অমান্য করিতে পারে না। তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। যাহাকে ইচ্ছা তিনি স্বপদে বহাল রাখেন, যাহাকে ইচ্ছা পদচ্যুত করিয়া দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন। যাবতীয় বিষয়ের একচ্ছত্র অধিকারী একমাত্র তিনি। অন্যান্য সকল অফিসার তাঁহার আজ্ঞাবহ, তাঁহার ইংগিতে পরিচালিত হইয়া থাকেন। তৎকালীন শরীফ-প্রধান ছিলেন আহমদ রাকেব পাশা।

শরীফের সহিত অন্য কাহারও বিরোধ বাধিলে তিনি তৎক্ষণাৎ অপসারিত হন। কারণ, প্রধান শরীফ রাষ্ট্রের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। সকলকে তাঁহার নিকট জবাবদেহি করিতে হয়। জটিল সমস্যাসমূহ মীমাংসার জন্য তাঁহার নিকট পেশ করা হয় এবং তাঁহার ফয়ছালা চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকৃত—তারপর আর কোন আপীল নাই।১

ইংরেজী ভাষাতেও আরবী শরিফ (Sherif) শব্দের (শেরিফ নহে), যথেষ্ট প্রচলন আছে :—

Sherif—The Chief Magistrate of Mecca.

Sherif—The Chief Adminstrative officer of a Shire or County, Charged with the conservation of the peace and the executive of the mandates of Courts of record within his country, and usually invested with limited or incidental judicial functions.

অর্থাৎ—শরীফ—মক্কার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট্।

শরীফ্—আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা ও আদালতের দলিলপত্র সংক্রান্ত নির্দেশ কার্যকরী করার দায়িত্বপ্রাপ্ত শায়ার বা কাউন্টির প্রধান শাসন কর্মচারী। সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ পরিমাণে অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় কর্তব্য পালনের দায়িত্বও তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে। ২

(১) মেরাআতুল হরমায়ন, ১ম খণ্ড, ৬৪ পৃঃ।

(২) New Standard Dictionary· Page—2254.

১৮শ অধ্যায়

হোছেন শাহ ও শ্রীচৈতন্য

ছোলতান হোছেন শাহের জীবন-ইতিহাসের বাহিরের দিকের আনুমানিক তথ্যগুলির পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁহার কর্ম্মজীবনের বিভিন্ন কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অতঃপর কিছু আলোচনা করার আবশ্যক আছে। কারণ, ইহাই হইতেছে তাঁহার আসল পরিচয় বরং ঐতিহাসিক পরিচয়। প্রসঙ্গতঃ চৈতন্যদেব সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু আলোচনার দরকার আছে। কারণ, তাঁহারা উভয়ই হইতেছেন সমসাময়িক লোক। অধিকন্তু চৈতন্যদেবের সহিত ছোলতানের সম্বন্ধ ছিল অতিশয় ঘনিষ্ঠ।

হিন্দু লেখকগণের মতে হোছেন শাহের সিংহাসন আরোহণ হইতে গৌড়দেশে 'রামরাজ্য' আরম্ভ হইয়া যায়। মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় এই বিষয়ের ভূমিকা হিসাবে বলিতেছেন:—"মুছলমানগণ ইরাণ, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণ বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দু প্রজামণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মছজিদের পার্শ্বে দেব-মন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, মহরম, ঈদ, শবেবরাত প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোল উৎসব চলিতে লাগিল···।" এহেন পরিস্থিতির মধ্যে ছোলতান হোছেনের অভ্যুদয় ঘটিল। তিনি রাজকীয় ঝামেলা হইতে মুক্ত হইয়া খুব সম্ভব সর্ব্বপ্রথমে চৈতন্য দেবের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ভক্ত শ্রেণীভুক্ত হইয়া গেলেন। "চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে যে, ইনি (হোছেন শাহ) চৈতন্যের একজন ভক্ত হইয়াছিলেন।" ১ হোছেন শাহ তাঁহার যোগ্য সেনাপতি পরাগল খাঁ এবং তস্য পুত্র ছুটি খাঁ রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি কতকগুলি হিন্দু শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করাইয়া স্থানীয় পণ্ডিত সমাজে যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করেন। ইহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সমসাময়িক বৈষ্ণব সাহিত্যের রচয়িতাগণের কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে:—

> "শাহ হুসন, নৃপতি ভূষণ সেহ এহি রস জানে।
> পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশোরাজ খানে।"

"কবীন্দ্র পরমেশ্বর ইহাকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন" (ঐ, ঐ)।

"চৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবতে দৃষ্ট হয়, তিনি চৈতন্য প্রভুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।···যে গুণে আকবর ভারত ইতিহাসের কণ্ঠে কণ্ঠহার হইয়া আছেন সেই গুণে হোছেন শাহ বঙ্গের ইতিহাসের উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া গণ্য হইবেন।" (ঐ, ১৪৭ পৃঃ)

---

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশ সেন, ১১৬ পৃষ্ঠা।

চৈতন্য ও ছোলতান হোছেন একই সময়ের লোক হওয়ায় এবং ই'হাদের কর্ম-জীবনের বহু সাধনা ও সিদ্ধি বহুক্ষেত্রে, পরস্পর সমন্বয় থাকায় প্রাসঙ্গিক ক্রমে চৈতন্য দেবের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধেও আলোচনা এখানে বিশেষভাবে আবশ্যক হইয়া দাড়াইয়াছে।

চৈতন্যের আবির্ভাব

চৈতন্যদেবের আত্ম-প্রাকাশের প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল, বিশ্ব-মানবের মঙ্গল ও মুক্তির জন্য কি পয়গাম তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, বৈষ্ণব সাহিত্য ও তাঁহাদের কার্য্য-কলাপের সম্যক অনুশীলন না করিয়া সে সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। তবে তাঁহার অবতার জীবনের মূল বা প্রধান লক্ষ্য যে কি, দয়া করিয়া চৈতন্যদেব নিজেই তাহা আমাদিগকে প্রকাশ্যভাবে ও অনাবিল ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন। ভক্তদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন :—

"পাষণ্ডী সংহারিতে মোর, এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারী ভক্তি করিমু প্রচার॥" ১

যে চৈতন্যদেবের কার্য্যকলাপের বিচার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি যে সাধারণ মানুষ ছিলেন না এবং তিনি যে অন্য কোনো দেবতা পুরুষের, খুব সম্ভব শ্রী কৃষ্ণের, অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন—পাষণ্ডী নামক দেশের একটা মনুষ্য সমাজকে সংহার করিবার উদ্দেশ্যে। এই ভাবই এখানে ব্যক্ত হইতেছে।

এখানে পাষণ্ডী বলিতে কাহাদিগকে বুঝাইতেছে, তাহা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলিতেছেন :—

When the Muslems Conquered Bengal, Buddhuism disapeard from the Land· মুছলমানরা যখন বাংলা অধিকার করে, বৌদ্ধ মতবাদ তখন দেশ হইতে উধাও হইয়া গিয়াছিল (৩৭৪ পৃষ্ঠা)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধদিগের সংহার করার কোনো সম্ভাবনাই তখন দেশে বিদ্যমান ছিল না। পক্ষান্তরে উল্লেখিত ঐতিহাসিকের মত অনুসারে, "যে বিপুল সংখ্যক লোককে ব্রাহ্মণগণ নিজের ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিতে অস্বীকার করিয়াছেন, তাহারা অবিলম্বে বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশ করিল।" সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করার আর কোনো কারণই ছিল না। এখন বিবেচ্য এই যে, বৌদ্ধরা দেশ হইতে অপসারিত হইয়া গিয়াছে, নিম্নশ্রেণীর উৎপীড়িত হিন্দুদের মুছলমান হইয়া যাওয়ার আর বিন্দুমাত্র আশঙ্কা থাকিতেছে না, এ অবস্থায় চৈতন্যদেব পাষণ্ডী বলিয়া সংহার করিতে যাইতেছেন কাহাদিগকে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে পাষণ্ডীশব্দের প্রকৃত অর্থ এবং পরম্পরাগত ব্যবহারিক তাৎপর্য্যগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১) চৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা, ১২০ পৃষ্ঠা।

অভিধানকারগণ বলিতেছেন :—

ত্রয়ী ধর্ম্ম অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম পালন করিলে তাহাকে "পা" কহে, যাহারা এই পা (বেদাচার) খণ্ডন করে তাহাদিগকে পাষণ্ড বলা হয়। বিভিন্ন অভিধান ও ধর্মগ্রন্থ পাঠে জানা যায়, বৌদ্ধ প্রভাবের সময়, "বৌদ্ধ ধর্মে অবিশ্বাসীদিগকে পাষণ্ডী বলা হইত। পরে বৈষ্ণবগণ অন্য ধর্ম অবলম্বীদিগের প্রতি এই (পাষণ্ডী) শব্দের প্রয়োগ করিতে থাকেন।" মনুর মতে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অহিন্দু মাত্রই এই পর্য্যায়ভুক্ত (সরল বাংলা অভিধান)। আভিধানিক সুবলচন্দ্র মিত্র, তাঁহার Bengali-English Dictionary-তে পাষণ্ডী শব্দের অর্থে বলিতেছেন—Not conforming himself to the tenets of the Vedas : Atheistic ; Jaina or Bouddha, a non-Hindu, বেদ অমান্যকারী, অন্য বর্ণের চিহ্নধারী এবং অহিন্দু, পাষণ্ডীর এই তিনটী বিশেষণ সর্ব্বত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের পাষণ্ডী সংহার সম্বন্ধে উপরে সংক্ষেপে যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, চৈতন্যের সময় মুছলমান সমাজ ব্যতীত বেদ অমান্যকারী ও অহিন্দু অন্য কোনো সমাজ দেশে বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং যুক্তির হিসাবে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মোছলেম জাতির সংহার সাধনের জন্যই তিনি অবতার হিসাবে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

চৈতন্যের অবতার রূপ গ্রহণের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বিশ্ব-কোষের সম্পাদক বলিতেছেন : "যখন বৌদ্ধগণের প্রবল প্রভাবে ভারতের বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম নির্ব্বাণ হইয়া আসিতেছিল...তাহার অনতিকাল পরেই বঙ্গদেশে তান্ত্রিক মতের সূত্রপাত হয়...ইহাদের দলবৃদ্ধি ও প্রবল পরাক্রান্ত যবন রাজগণের অত্যাচারে ভারতের ধর্মভাব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। ধর্মপ্রাণ সাধু ব্যক্তিগণের অসহ্য সহৃদয় বিদারক ভীষণ মনস্তাপ হইতে লাগিল। (তখন তাঁহারা) নীরস, ভিত্তিহীন ক্রিয়া কাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া...বৈষ্ণব ধর্মের পক্ষপাতী হইলেন। ইহার অনতিকাল পরেই চৈতন্য অবতীর্ণ হইলেন, ইত্যাদি।" এই বিবৃতি হইতেও জানা যাইতেছে যে, প্রবল পরাক্রান্ত যবন রাজগণের মারণ উচ্চাটনও তাঁহার ধরাধামে অবতরণ করার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।

এখানে হয়তো এই সংশয় উপস্থাপিত করা হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ছিলেন বিশ্বজনীন প্রেম ও ভক্তির অবতার, হিন্দু-মুছলমান বলিয়া কোনো প্রকার ভেদ জ্ঞান তাঁহার অন্তরে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং "মোছলেম জাতির সংহারের জন্য তিনি অবতার রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন" এরূপ কথা বলা অন্যায়।

আমাদের মতে, এই উক্তিটি সমস্ত যুক্তি ও ঐতিহাসিক তথ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। চৈতন্যের নিজের উক্তি হইতেও জানা যাইতেছে যে, সমসাময়িক মুছলমান সমাজ সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। মুছলমানদিগের সম্বন্ধে তাঁহার ও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মুখে যবন ও ম্লেচ্ছ বিশেষণ সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া

যাইত। নিম্নে একটা উদাহরণ দিতেছি। চৈতন্য ন্যাড়া হরিদাসকে একদিন জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—

একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁরে লঞা গোষ্ঠী তাঁহারে পুছিলা॥
হরিদাস! কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণ হিংসা করে মহা-দুরাচার॥
ইহা সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার।
তাহার হেতু না দেখিয়ে, দুঃখ অপার॥
হরিদাস কহে প্রভু! চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি, দুঃখ না ভাবিহ॥
যবন সকলের মুক্তি, হবে অনায়াসে।
'হারাম'। 'হারাম'! বলি কহে নামাভাসে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে, 'হারাম! হারাম!
যবনের ভাগ্য দেখ, লয় সেই নাম!
যদ্যপি অন্যত্র সংকেতে হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥

কলিকালের যবন, অর্থাৎ মুছলমান সমাজ যে মহা দুরাচার, ইহা চৈতন্যের উক্তি। তিনি ইহাদের সংখ্যা ও শক্তিকে 'অপার' বলিতেছেন এবং তাহাদের নিস্তার সম্বন্ধে নিজের পেটওয়া শিষ্য হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। চৈতন্য মুছলমান সমাজের বিরুদ্ধে আন্তরিক বিদ্বেষ পোষণ করিতেন, তাঁহার উল্লিখিত উক্তিগুলি হইতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

চৈতন্য স্বয়ং "ঈশ্বরের অবতার" ছিলেন. সুতরাং মুছলমানদিগকে নিস্তার করার উপায় কি হইতে পারে না পারে, তাহা তাঁহার অবিদিত থাকার কথা নহে। তবু হরিদাসকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছেন এবং তাঁহার সু-উত্তর শুনিয়া শান্তি লাভ করিতেছেন। গ্রন্থকার হরিদাসের উক্তির সমর্থনে এখানে "নৃসিংহ-পুরাণের" শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন:—

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহত ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ। উক্তাপি মুক্তিমাপ্নোতি, কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়াগৃণন। ২

অর্থাৎ:—"দাঁতাল শুকরের দন্তাহত হইয়া ম্লেচ্ছ যখন বারংবার হারাম হারাম শব্দ উচ্চারণ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক রাম শব্দ উচ্চারণ করিলে যে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, ইহাতে অসম্ভব কি আছে। টিকাকার বলিতেছেন— যবনেরা প্রচলিত শূকরের অপবিত্র শব্দের পরিবর্ত্তে যে হারাম শব্দ বলে, তাহা হা-রাম

এই উচ্চারণ হওয়াতেও ঐ নাম নামাভাস হইল, এই নামাভাসেই যবনগণ অনায়াসে মুক্ত হইবে। (চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৫৭৩, ৭৪ পৃ:।)

এই শ্লোকের প্রথম প্রতিপাদ্য হইতেছে যে, যবন ও ম্লেচ্ছ অর্থাৎ মুছলমান জাতির লোকেরা সচরাচর দাঁতাল শুকরের দন্তাঘাতে আহত হইয়া থাকে এবং আহত হওয়ার পর হারাম হারাম বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া বলা হইতেছে যে, ভক্তি শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে, অনিচ্ছাসত্বে আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া হারাম হারাম বলিয়া চীৎকার করার ফলেও যখন ম্লেচ্ছরা মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, তখন নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত রাম রাম উচ্চারণ করিলে' তাহারা যে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু ন্যায় ও বিচারের দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিজ্ঞার প্রথম অংশটা, একটা অমূলক ও অনৈতিহাসিক কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মুছলমানরা সচরাচরই বন্য বরাহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং আহত হওয়ার পর হারাম হারাম বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে, এত বড় একটা হিমাচলী মিথ্যাকে যাহারা খেয়ালখুশীমত ইতিহাসে পরিণত করিতে, এমন কি নিজেদের ধর্মশাস্ত্রে স্থান দান করিতে পারেন, তাঁহাদের অকহনীয় ও অকরণীয় কিছুই নাই। আজও মোছলেম শিশু মার খাইয়া কান্দে আল্লাহ ওআল্লা বলিয়া। "ওআল্লা তুই আমার পায়ে ব্যথা দিলি কেন; আমার ব্যথা সারিয়ে দে"—নিশীথ রাত্রে মোছলেম বালিকার মুখে এই ফরয়াদ শুনিতে পাওয়া যায়। আজও 'প্রখর রৌদ্রে শ্রান্ত-ক্লান্ত রাখাল বালকের মুখে শোনা যায়—আল্লাহ, মেঘ দে, পানি দে গান। দুঃখের বিষয়, শত শত বৎসর মুছলমানের সঙ্গে বাস করার পরও তাঁহারা মুছলমানকে চিনিতে পারিলেন না।

প্রকৃত কথা এই যে, বৌদ্ধ সমাজ ও বৌদ্ধ ধর্মকে তাহাদের মাতৃভূমি হইতে সমূলে উৎপাত করার পর তাঁহাদের নেকনজর পড়িয়াছিল মুছলমান সমাজের উপর। তাই যুগপৎভাবে তাহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন "যবন রাজদিগকে" রাজনৈতিক কৌটিল্যের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতে। পক্ষান্তরে ধর্ম্মের নামে একটা মোহজাল বিস্তার করিয়া মুছলমান সমাজকে আত্মবিস্মৃত ও সম্মোহিত করিয়া রাখিতে! পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহাই ছিল তৎকালের অবতার ও তাঁহার ভক্ত ও সহকারীদের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। চৈতন্যদেবের মুরীদ ছোলতান হোছেনের সত্যপীর আমদানী করার এবং রূপ ও সনাতনকে গৌড় রাজ্যের শাসন পরিচালনের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বদানের একমাত্র উদ্দেশ্য।

সত্যপীর প্রসঙ্গ

সমসাময়িক স্তাবক কবিরা হোছেন শাহকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বানাইয়া দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এই হোছেনই যে হিন্দু মুছলমানের বিভেদ বিদূরিত করার মহান উদ্দেশ্যে সত্যপীরের প্রতিষ্ঠা এবং তাহার পূজা পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন আধুনিক

ঐতিহাসিকগণের অনেকে ইহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের বর্ণনা হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে, স্কন্দ পুরাণে সত্যনারায়ণের পূজা পদ্ধতির উল্লেখ আছে (রেবাখণ্ড)। দেবতাবিশেষ বলিয়া হিন্দু সমাজে "প্রায় প্রতি গৃহে এই ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।" সঙ্গে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, "কেহ কেহ ইহাকে সত্যপীরের সিন্নিও কহে।" সত্যনারায়ণের পূজার জন্য "যে আসন নির্ম্মিত হইয়া থাকে, চলিত ভাষায় তাহাকে মকাম কহে।" অধিকন্তু এ ব্যবস্থাও রহিয়াছে যে, "এইরূপ মকাম প্রস্তুত করিয়া **শালগ্রাম শিলা** সেই স্থানে আনিয়া তাহার সমক্ষে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে।"

এই গোলক ধাঁধার সমাধান করার জন্য ঐতিহাসিককে দেখিতে হইবে স্কন্দ পুরাণের ও হোছেন শাহের রাজত্ব কালের মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ ব্যবধান কত দিনের? কিন্তু আমাদের শাস্ত্রী মহাশয়গণের পুঁথিপুস্তক হইতে সময় ও তারিখ ইত্যাদি উদ্ধার করার মত কোনো প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া খুবই দুষ্কর, একরূপ অসম্ভবই। আমরা যতদূর জানি, হিন্দু সমাজের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের অপ্রাচীনতা প্রদর্শন করার স্বনামখ্যাত মনীষী, পরলোকগত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় প্রসঙ্গতঃ স্কন্দ পুরাণের আলোচনায় বলিতেছেন:—"পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ স্কন্দ পুরাণের খণ্ডবিশেষ বলিয়া প্রচলিত আছে। উৎকল খণ্ডে, পুরুষোত্তম খণ্ডে ও ব্রহ্মোত্তর খণ্ডে ক্ষেত্র ও ভুবনেশ্বর শিবের মন্দিরাদির বর্ণনা আছে। এই দুই মন্দির সপ্তম ও দ্বাদশ শতাব্দীর অপেক্ষাও আধুনিক বলিয়া স্বীকার করতে হয়।" (ভাঃ উপাসক সম্প্রদায়, ২য় খণ্ড, উপক্রমণিকা, ২১৩ পৃঃ)।

স্কন্দ পুরাণের গঠন ও সম্পাদন সম্বন্ধেও কএকটা বিষয় আলোচনা করার আছে। এই পুরাণখানা কম বেশী ৮০ খণ্ডে বিভক্ত। এই খণ্ডগুলি লিখিত হইয়াছিল বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিভিন্ন লেখকগণের দ্বারা। সত্যপীরের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করার জন্য প্রথমে দরকার হইতেছে, এই বিরাট ও বিক্ষিপ্ত পুরাণখানার কোন্ খণ্ডে সত্যপীরের বা সত্যনারায়ণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অবগত হওয়া। বিশ্বকোষে এই খণ্ডগুলির দীর্ঘসূচী দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে কুত্রাপি সত্যপীরের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। স্কন্দ পুরাণ আমাদের কাছে নাই। ফলতঃ এ সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বলিতেছেন:—"ঐ দুই মন্দির দ্বাদশ ও সপ্তম শতাব্দী অপেক্ষাও আধুনিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।" কেন করিতে হয়, দত্ত মহাশয় তাহা বলিয়া দিতেছেন না। সুতরাং আমরা এ প্রসঙ্গের আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিতেছি।

উপরে ঐতিহাসিকগণের বরাত দিয়া বলা হইয়াছে যে, ছোলতান হোছেন শাহ-ই হইতেছেন সত্যপীরের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু জিজ্ঞাসা আসিতেছে, তাহা হইলে সত্যনারায়ণের প্রতিষ্ঠা হইল কাহার দ্বারা? হিন্দু লেখকগণ সকলেই উভয়কে অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ

করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দিতেছেন যে, হিন্দু ও মুছলমানের বিভেদ ও বিচ্ছেদের কারণগুলি দূর করিয়া, উভয়কে একই ধর্ম্মের অনুসারী করার জন্য এই উদার ও মহান পদ্ধতির সৃষ্টি করা হইয়াছিল। অথচ হিন্দুদের লেখা সত্যনারায়ণের পুথি ও পাচালীর কোনো স্থানে "সত্যপীর" নামের উল্লেখ করা হইতেছে না, সর্ব্বত্র "সত্যনারায়ণ" নাম দেখা যাইতেছে। সর্ব্বত্র রাম, হরি ও কৃষ্ণ নামের জয় জয়কার করা হইতেছে, মুছলমানের আল্লাহ, খোদা বা নবী ও রছুলের উল্লেখ কোথাও দেখা যাইতেছে না, ইহার কারণ কি?

আমাদের ধারণা, পৌরাণিক সত্যনারায়ণের পূজা অর্চনা ব্যাপকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া "সত্যনারায়ণকে" মুছলমানদিগের মধ্যেও প্রবর্ত্তিত করার উদ্দেশ্যে ইহার সূচনা করা হয়। কিন্তু মুছলমান সমাজ "নারায়ণকে" গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই। সেই চরম দুর্য্যোগের দিনেও হয়তো ২।৪ জন মর্দ্দে মোমেন মুছলমান বাঁচিয়া ছিলেন, যাহারা মুক্ত কণ্ঠে এই অনাচারের প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমাদের এই ধারণার সমর্থন দুই এক জন বিশিষ্ট হিন্দু লেখকের তৎকালীন রচনা হইতেও পাওয়া যাইতেছে। সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, নারায়ণের নামে "সিন্নি" দিতে মুছলমানরা অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে পীরের নাম থাকিলে হিন্দুরা পূজা দিতে সম্পূর্ণ নারাজ—ইহাই দাঁড়াইয়াছিল প্রকৃত অবস্থা। রামেশ্বর বলিতেছেন:—

সত্য পীরের নামের তাৎপর্য্য শুন আগে।
মিথ্যার বিনাশ হেতু সত্য পীর ভাগে॥
নারায়ণ নামে সিন্নি না হয় সম্ভব।
পীর হলে প্রাণ গেলে না পূজে হিন্দব॥
অতএব পীর ও নারায়ণ নাম।১

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের এই বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে যে, হিন্দু ও মুছলমান জাতিকে এক ধর্ম্মের অনুসারী ও এক দেবতার পূজারী করার জন্য, ভক্তি ধর্ম্মের নামকরণে, যে অসাধু প্রচেষ্টা আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে একটা ব্যর্থ বিড়ম্বনায় পরিণত হইয়া যায়। মুছলমান সমাজ তাহার প্রতি দৃকপাত করেন নাই এবং হিন্দু সমাজ তাহাদের চিরন্তন মোছলেম বিদ্বেষের প্রচণ্ড পরিচয় দিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। বস্তুতঃ স্বয়ং চৈতন্য ও তাঁহার প্রধান শিষ্য রূপ, সনাতন প্রভৃতি এই সময় মুছলমানদিগকে যবন ও ম্লেচ্ছ বলিয়া ধিক্কার দিতে কোনোদিন বিরত হন নাই। আমার মতে, বঙ্গীয় মোছলেম সমাজের ধর্ম্মীয় বা সামাজিক ইতিহাসে সত্যপীরের ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনো কারণ নাই। বরং ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, আলোচ্য সময় চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার মুছলমানকে বিভ্রান্ত করার জন্য—সম্ভবতঃ ছোলতান হোছেনের সহায়তায়—এতদিন যে সব ষড়যন্ত্র পূর্ণ উদ্যমে চলিয়া আসিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে মোছলেম বঙ্গের অন্তরদেশে একটা প্রচণ্ড রকমের প্রতিক্রিয়ার সূচনা আরম্ভ হইয়া যায় এই সময় হইতে।

১। বংলা ভাষার অভিধান, ১৩৬৮।

আমাদের দেশের কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনাকে আমরা সাধুবাদ জানাইতেছি। কিন্তু তাঁহাদের কেহ কেহ এই উপলক্ষে আমাদের জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে এমন একটা স্থায়ী কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে মুছলমানের অতীত ইতিহাসকে হতাশাব্যঞ্জকরূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। এজন্য তাঁহারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া কএকজন অজ্ঞ মুছলমানের রচিত নিকৃষ্ট শ্রেণীর কএকখানা পুথির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। বলা আবশ্যক যে, এসব পুথি লেখক পরবর্ত্তী যুগের লোক এবং ইহাদের মধ্যে এমন সব কবিও রহিয়াছেন, যাহারা নিজেদের নামও শুদ্ধ করিয়া লিখিতে সমর্থ ছিলেন না, ইছলাম ধর্ম্ম ও মোছলেম ইতিহাসের পরিচয় লাভ তো বহু দূরের কথা।

উপরোক্ত লেখকগণের মধ্যে বিশ্বকোষ সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব ও বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের লেখক দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের নাম এই প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যার্ণব মহাশয় বলিতেছেন, সত্যপীরের প্রতিষ্ঠা মোছলেম প্রভাবের ফল। দীনেশ বাবু মুছলমান কবিদের পুথিপুস্তক হইতে হিন্দু দেবদেবীর আরাধনার উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া, মুছলমানদিগকে তাঁহাদের অতীত সম্বন্ধে শ্রদ্ধাহীন করিয়া ফেলারই চেষ্টা পাইয়াছেন। অথচ আমরা এই সমস্তকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আজও কোনো প্রকার দ্বিধা বোধ করিতেছি না! অবশ্য, জনাব নাজিরুল ইছলামের "বাংলা ভাষার নূতন ইতিহাস" ইহার শুভ ব্যতিক্রম। এজন্য তাঁহাকে আমরা মোবারকবাদ জানাইতেছি।

আমাদেরও এ সম্বন্ধে বলার কথা আছে। কিন্তু উপস্থিতের মত তাহার আলোচনা স্থগিত রাখিয়া, "পঞ্চগৌড় অধিপতি" ছোলতান হোছেন শাহের প্রতিক্রিয়া, শ্রীচৈতন্যদেবের আত্মলীলা এবং হোছেন শাহের প্রধানমন্ত্রী রূপ ও সনাতন গোস্বামীর উপাখ্যান ভাগ সমাপ্ত করিয়া ফেলিতে চাহিতেছি।

রূপ ও সনাতন

এ প্রসঙ্গে প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, সমসাময়িক ইতিবৃত্তের লেখক ফেরেশ্তা অথবা রিয়াজ-লেখক ছলীম উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ঘূর্ণাক্ষরেও কোনো আভাস ইঙ্গিত প্রদান করেন নাই। অথচ হোছেন শাহ বা তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের ন্যায্য সমালোচনা করিতে, অর্থাৎ তাঁহাদের গুণের প্রশংসা ও দোষের নিন্দা করিতে তাঁহারা কদাচ অবহেলা করেন নাই। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, জনসাধারণের দৃষ্টির অগোচরে অতি সঙ্গোপনে এমন সব ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছিল যে, মুছলমান ঐতিহাসিকগণও তাহার কোনো তথ্য অবগত হইতে পারেন নাই।

ইহা শুধু অনুমানের ব্যাপার নহে। রূপ ও সনাতন গৌড় রাজ্যের শাসন পরিচালনের সর্ব্বের অধিকার লাভ করার পর, হোছেন শাহের সর্ব্বনাশ করার জন্য সদাসর্ব্বদা সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। যে ঘটনার গুপ্ততথ্য আমরা এখন

ব্যক্ত করিতে যাইতেছি, বৈষ্ণব সাহিত্যকারগণ তাহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, এবং পূর্ব্ব সতর্কতা হিসাবে নিজেদের পূর্ব্ববর্ত্তী উক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত শ্লোক রচনা করিতেও আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে তাঁহারা বলিয়াছিলেন :—(১) চৈতন্য ভাগবতে দৃষ্ট হয়, তিনি (হোছেন শাহ) চৈতন্য প্রভুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

(২) যে গুণে আকবর ভারত ইতিহাসের কণ্ঠে কণ্ঠহার হইয়াছিলেন, সেই গুণে হুছেন সাহ বঙ্গের ইতিহাসের উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) যে সভার রূপ, সনাতন ও পুরন্দর খাঁ একত্র হইয়া হিন্দু শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন……।

(৪) সাহ হুসন, জগৎ ভূষণ, সেহ এহি রস জানে,
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর ভণে যশোরাজখানে।

(৫) নৃপতি হুসেন সাহ হয়ে মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্রশস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হইল যেন কৃষ্ণ অবতার॥

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশ সেন)

যে গোপন তথ্যের কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রকাশ্য আভাস আরম্ভ হয় একটা ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে, গৌড়ের সর্ব্বাধিকারী রাজমন্ত্রী মহাশয়ের অন্তরে আকস্মিক ভাবে প্রচণ্ড বৈরাগ্য ভাবের উদয় হইয়া যাওয়ার ফলে। "কথিত হইয়া থাকে যে, একদা বাদশাহ সকাল বেলায় সনাতনকে ডাকিয়া পাঠান, তখন বৃষ্টি হইতেছিল। সনাতন রাজআজ্ঞা পালনের জন্য সেই অবস্থায় পথ চলিতেছেন। এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন পথিপার্শ্বস্থ এক বৃদ্ধা ভিক্ষুকীর ও তাহার ভিক্ষুক স্বামীর কথোপকথন। বৃদ্ধা স্বামীকে বলিতেছে, সকাল হইয়াছে, পথে লোক চলাচল করিতেছে। এখন উঠিয়া ভিক্ষা করিতে যাও। আজ যে গৃহে কোন সম্বল নাই। বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিল—এরূপ অভ্রার শিয়াল কুকুরও বাহির হয় না। তবু পোড়া পেটের জন্য আমাকে এখনই পথে বাহির হইতে হইবে, আমি ইহা পারিব না। বৃদ্ধের এই বাক্য শুনিয়া সনাতন ভাবিতে লাগিলেন, আমি তো এই বৃদ্ধ ভিখারী হইতেও অধম। পেটের দায়ে যবনের হুকুম তামিল করার জন্য এই বৃষ্টি মাথায় আমি ছুটিয়াছি রাজদরবারে।"

তাঁহার এই মানসিক অবস্থার কথা ভক্তের দল জানিতে পারিয়াছিলেন। রাজ কার্য্যে সনাতনের যে অনেক প্রকার দোষ ত্রুটি ঘটিতেছিল, ইহা তাঁহারাও স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করিয়া জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহিতেছেন, এসব ঘটিয়াছিল তাঁহার বৈরাগ্যের ফলে।

কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, উভয় রূপ ও সনাতন দেশে চরম অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিলেন। বিলম্ব হইলেও হোছেন শাহ এই সব সংবাদ যথাসময়ে

অবগত হইলেন। ফলে তিনি দৃঢ়তার সহিত ইহাদের অপকর্ম্মগুলির তদন্ত-তদারকে প্রবৃত্ত হন। ভক্ত মুখেই প্রকাশ, একদা ছোলতান হোছেন, সনাতনকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব বহু মারি কৈল চাকলা ছারখার।
হেথা তুমি কৈলে আমার সর্ব্বনাশ।"

(বিশ্বকোষ, ২১, ১৩৭ পৃষ্ঠা)।

এই নরহন্তা দস্যুবৃত্তিধারী জ্যেষ্ঠ গোস্বামী মহাশয়ও বৈরাগ্যের তাড়নায় এমনি ব্যাকুল হইয়া পড়েন যে, কনিষ্ঠ সনাতনের পলায়নের সুব্যবস্থা হওয়ার পূর্ব্বে তিনি চৈতন্য প্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এদিকে সনাতন গোস্বামী নিজের ধন দওলত পাচার করিবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হইয়া রহিলেন। এমন সময় ছোলতান হোছেন তাঁহাকে পাকড়াও করার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সনাতন নানা টাল বাহানা করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে থাকেন। এই সময়কার একদিনের ঘটনার বিবরণ পাঠকগণ ভক্ত কবিদের মুখে শ্রবণ করুন :—সনাতন রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া আছেন। ছোলতান ডাকিয়া পাঠাইলে তিনি অসুখের ভান করিয়া রাজাজ্ঞা অমান্য করেন। ছোলতান তাঁহার চাতুরী বুঝিতে পারিয়া রাজ বৈদ্যকে পাঠাইয়া সনাতনের পীড়ার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার চেষ্টা করিলেন। অতঃপর :—

"একদিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোসাই সভাতে কৈল আগমন॥
পাতশা দেখিয়া সভে সম্ভ্রমে উঠিল।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া পাতশায় বসাইল॥
পাতশা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে নহে ব্যাধি সুস্থ দেখিল॥
আমার যেসব কার্য্য তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি ঘরে তুমি রহিলা বসিঞা॥
মোর যত কাজ কাম সব কৈলা নাশ।
কি তোমার হৃদয় হয় কহ মোর পাশ॥"

সনাতন তখন উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ছলচাতুরী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কুকীর্ত্তি কলাপ বাদশাহ সমস্তই অবগত হইয়াছেন। তখন অবিলম্বে রেহাই পাওয়ার জন্য বাদশাহকে বলিয়া দিলেন—আমার দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালনা করা সম্ভব হইবে না, আপনি অন্য লোক দেখুন। বাদশাহ পূর্ব্ব হইতে সতর্ক ছিলেন। সনাতন যে, যে কোনো মুহূর্ত্তে উধাও হইতে পারেন, এবং ভ্রাতা ও চৈতন্যের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁহাদের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবগত হওয়ার পর বাদশার তাহা বুঝিতে বাকী

ছিল না। তিনি তখনই তাঁহাকে বন্দী করার আদেশ দিলেন, এবং সে আদেশ অনতিবিলম্বে প্রতিপালিত হইয়া গেল। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া গৌড় রাজ্যের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতার পদে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে, তিনি বাদশাহকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের উপায় পূর্ব্ব হইতে সুস্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার সুযোগ করিয়া নিতে তাঁহার যে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

উদ্যোগ পর্ব্ব

শ্রীকৃষ্ণের প্রধান লীলাভূমি ছিল "শ্রীবৃন্দাবন।" বাদশাহের মতিগতি দেখিয়া চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্যদ্বয় (হোসেন হোছেনের প্রধানমন্ত্রী ও দবীরে খাছ) পূর্ব্ব হইতে বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। অবশেষে নিজেদের অনাচারগুলির প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্তিলাভের জন্য, তাহারা গৌড় রাজ্যের এলাকা ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সকল প্রকার প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের যাত্রা পথের প্রথম ষ্টেশনরূপে নির্দ্ধারিত হইল—মালদহ জেলার রামকেলি গ্রাম। এই উদ্যোগ পর্ব্বের প্রাথমিক অবস্থায় শিষ্য সনাতন চৈতন্যদেবকে উত্তেজিত করার জন্য বলিতেছেন—

ইহা হইতে চল, ইহ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড় রাজ॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি—॥

মহাপ্রভু বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করিয়াছেন দেখিয়া মহান শিষ্য শ্রীরূপের বৈরাগ্য প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিল। মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তিনি বৃন্দাবনের পথে ধাবিত হইলেন। অবশ্য, বৈরাগ্য প্রচণ্ড পর্য্যায়ে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বেই নিজের অন্যায়ভাবে সঞ্চিত ধন-সম্পদের সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সনাতনের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই, সম্ভবতঃ কিছু সময় রাজাদেশে কারাগারে আবদ্ধ থাকার ফলে। বলা আবশ্যক, এই সংসার বিরাগী মহান গোস্বামী মহাশয়, কারা-রক্ষককে নগদ সাত হাজার টাকা ঘুষ দিয়া বন্ধন মুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিরূপ ষড়যন্ত্রের মধ্যদিয়া এই মুক্তিলাভ সম্ভব হইতে পারিয়াছিল, নিম্নে সংক্ষেপে তাহার আভাস দেওয়া হইতেছে।

যাত্রা পর্ব্ব

সনাতন কারাগারে বন্দী হইয়া নানা প্রকার হা-হুতাশ করিতেছেন :—

"হেন কালে এক জনে অলখিতে সনাতনে
পত্রী দিল রূপের লিখন।
এ রাধা বল্লভ দাসে মনে হৈল আশ্বাসে
পত্রী দিলা করিয়া গোপন।

চৈতন্য চরিতামৃতেও এই পত্রের কথা লিখিত আছে। ফলতঃ এই পত্র পাইয়া সনাতন বন্ধন মুক্তির উপায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। চৈতন্য চরিতামৃতের ভাষাতেই তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে—

"পত্রী পাইয়া সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবন রক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা॥
তুমি এক জিন্দা পীর মহাভাগ্যবান।
কিতাব কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান।
এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজ ধর্ম্ম দেখিয়া।
সংসার হৈতে মুক্তি তারে করেন গোসাঁঞা॥
পূর্ব্বে তোমার আমি করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার।
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব কর অঙ্গীকার।
পুণ্য, অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার॥"

ইহা শুনিয়া রক্ষকের মন কিঞ্চিৎ দ্রব হইল বটে, কিন্তু সে বলিল, আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি, কিন্তু রাজদণ্ডের ভয় বলবৎ রহিয়াছে। সনাতন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, রাজা দক্ষিণে গিয়াছেন, ফিরিয়া আসিতে বিলম্বও আছে। সনাতন তাহাকে সময়ে উচিৎ বুদ্ধি প্রদান করিবেন ও উপস্থিত তাহাকে সাত হাজার মুদ্রা প্রদান করিলেন। ইহাতে যবনরক্ষক সম্মত হইয়া সনাতনকে ছাড়িয়া দিল। সনাতন মুক্তি পাইলেন এবং ঈশান নামক একটি ভৃত্যকে লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশ্যে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হইলেন।" (বিশ্বকোষ, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ১৪০)

শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে—

"ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিলা তার অর্দ্ধধনে।
এক চৌঠি ধন দিলা কুটুম্ব-ভরণে॥
দণ্ডলাগি চৌঠি সঞ্চয় করিলা।
ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিলা॥

এতদ্ব্যতীত তিনি এক বণিকের নিকট আরও দশ সহস্র মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া সংসার বন্ধন মোচনের উপায় করিতে লাগিলেন। (ঐ, ঐ, পৃঃ ১৩৭)

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপ গোসাই দস্যুবৃত্তি দ্বারা যে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া ছিলেন, তাহা নিয়া পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছিলেন। সনাতন গোসাঁই বৈরাগ্য অনুরাগে আত্মহারা হইয়া যখন পলায়নের আয়োজন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় ছোলতান হোছেনের আদেশে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত এবং কারারক্ষীকে নানা স্তোক বাক্যে বিমোহিত করিয়া ও নগদ সাত হাজার টাকা ঘুষ দিয়া কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া; বৃন্দাবন ধামের দিকে ধাবিত হইলেন—একজন ফকীর দরবেশের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া। এই

প্রত্যেক পুরুষকে শিব কল্পনা করিয়া পুরুষের বেলায়, অহং ভৈরব ত্বং ভৈরবঘ্য বায়ুবস্তু সঙ্গমঃ এবং নারীর বেলায়, অহং ভৈরব ত্বং ভৈরবহ্যা বায়ুবস্তু সঙ্গমঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবেই সঙ্গমে লিপ্ত হইতে পারে। ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গম শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু বামাচারিগণ তাহাদিগকে অর্থাৎ রজস্বলা স্ত্রীলোক-দিগকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে......।

বামাচারীদের শাস্ত্র "রুদ্র মঙ্গল তন্ত্রে" বলা হইয়াছে: "রজস্বলা পুষ্করং তীর্থং চণ্ডালী তু স্বয়ং কাশী, চর্মকারী প্রয়াগ: স্যুদ্রজকী মথুরা মতা অযোধ্যা পুক্কসীয় প্রোক্তা।" অর্থাৎ, রজস্বলার সহিত সঙ্গম পুষ্করে স্নানতুল্য, চণ্ডালী সঙ্গম কাশী যাত্রার তুল্য, চর্মকারীর সহিত সঙ্গম প্রয়াগে স্নানের তুল্য, রজকী সঙ্গম মথুরা যাত্রার তুল্য এবং ব্যাধ কন্যার সহিত সঙ্গম অযোধ্যা তীর্থ পর্যটনের তুল্য।

যখন বামাচারীরা ভৈরব চক্রে (নির্বিচারে অবাধ যৌন সম্ভোগের জন্য মিলিত নরনারীদের একটি চক্র) মিলিত হয় তখন ব্রাহ্মণ চণ্ডালের কোন ভেদ থাকেনা। ...একদল নরনারী অন্য লোকের অগম্য একটি নির্জন স্থানে মিলিত হইয়া ভৈরবী চক্র নামে একটি চক্র রচনা করিয়া উপবেশন করে অথবা দণ্ডায়মান হয়। এই কামুক দলের সকল পুরুষ একজন স্ত্রীলোককে বাছিয়া লইয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার পূজা করে। অনুরূপ সকল নারী একজন পুরুষকে বাছিয়া বাহির করে এবং তাহাকে উলঙ্গ করিয়া পূজা করে। পূজা পর্ব শেষ হওয়ার পর শুরু হয় উদ্দাম মদ্য পানের পালা। মদ্য পানের ফলে যৌন-উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইলে পরিধানের সকল বস্ত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া তাহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া পড়ে এবং যাহাকে যাহার ইচ্ছা তাহার সহিত এবং যত জনের সঙ্গে সম্ভব তত জনের সঙ্গে অবাধ যৌন সঙ্গমে মাতিয়া উঠে—যৌন-সঙ্গী যদি মাতা, ভগ্নী, অথবা কন্যাও হয় তাহাতেও তাহাদের কিছু যায় আসে না। "বামাচারীদের তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, একমাত্র মাতা ব্যতীত যৌন সঙ্গম হইতে অবশ্যই অন্য কোন নারীকে বাদ দিবে না, এবং কন্যা হউক অথবা ভগ্নীই হউক আর সকল নারীর সঙ্গেই যৌনকার্য্য করিবে।" (৪) কিন্তু বামাচারীদের মাতঙ্গী মতবাদের অনুসারিগণ বলে যে, "যৌন সঙ্গম হইতে তোমরা তোমাদের মাতাকে পর্য্যন্ত অবশ্য বাদ দিবে না; মাতরমপি ন ত্যজেৎ।"

স্বামীজী তান্ত্রিকদের অন্য একটি সম্প্রদায় চোলমার্গী সম্পর্কে বলিতেছেন:

"চোলমার্গীরা কোন গুপ্ত স্থানে অথবা ভূমিতে এক গুপ্ত স্থান নির্মাণ করে। সেই স্থানে সকলের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, ভগ্নী, মাতা ও পুত্রবধূ প্রভৃতিকে একত্র করিয়া সকলে মিলিয়া ও একত্র হইয়া মাংস ভোজন ও মদ্য পান করত: একটি স্ত্রীকে বিবস্ত্র করিয়া সকল পুরুষে উহার গুপ্তেন্দ্রিয়ের পূজা করে ও তাহার নাম দুর্গা দেবী রাখে। এইরূপে সকল স্ত্রীলোকে এক পুরুষকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার গুপ্তেন্দ্রিয়ের পূজা

৪) জ্ঞান সংকলনী তন্ত্র: "মাতৃযোনিং পরিত্যাজ্য বিহারেৎ সর্ব যোনিষু।"

করে। যখন উপর্যুপরি মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়ে তখন সকল স্ত্রীলোকের বক্ষবস্ত্র অর্থাৎ কাঁচুলি একত্র করিয়া একটি বড় গামলায় রাখিয়া এক এক পুরুষ উহাতে হস্ত দিয়া যাহার বস্ত্র প্রাপ্ত হইবে সে মাতাই হউক, ভগ্নীই হউক, কন্যাই হউক অথবা পুত্রবধুই হউক, সেই সময়ে সে তাহার স্ত্রী হইয়া যাইবে। তাহারা পরস্পরে কুকর্ম করে এবং উন্মত্ততা অধিক হইলে জুতা প্রহরাদি করিয়া কলহও করে। প্রাতঃকালে একটু অন্ধকার থাকিতে গৃহে চলিয়া যায় এবং তখন যে যাহার মাতা, কন্যা, ভগ্নী অথবা পুত্রবধু সে তাহাই হইয়া থাকে। বামমার্গী স্ত্রী পুরুষেরা সঙ্গমের পর জলে বীর্য্য নিক্ষেপ করিয়া পান করে। এই পামর লোকসকল এই সকল কর্মকে মুক্তির সাধন মনে করে এবং বিদ্যা বিচার এবং সজ্জনতা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।" (৫)

মহাভারত খ্যাত কুরু পাণ্ডব যুদ্ধ এবং সৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ শক্তির সহিত সংঘাতের প্রতিক্রিয়া রূপে ভারতীয় সমাজ জীবনে যে ব্যাপক অধঃপতন সূচিত হয় উপরোল্লিখিত জঘন্য আচার অনুষ্ঠানাদি তাহারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সকলেই জানেন যে, শৈব, শাক্ত বা বামাচারীগণ এবং বৈষ্ণবগণ যথাক্রমে শিব, শক্তি বা দুর্গা এবং বিষ্ণুর পূজারী। কিন্তু পতন যুগের উপরোক্ত ধ্বংসকর পথ ও মত, বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানাদির ক্রম-বর্দ্ধমান প্রসারের সাথে সাথে এই তিনটি ধর্ম মত ও উহাদের অনুসারিগণ একই ধর্ম মত ও সম্প্রদায় রূপে পরিচিত হইতে থাকে। "অন্তঃশাক্ত, বহির শৈবঃ সভা মধ্যে চ বৈষ্ণব", অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব, এবং সভায় বৈষ্ণব', সংক্ষেপে ইহাই ছিল সেই যুগে ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী। অবশ্য বাংলা দেশে এই হাস্যকর একীকরণ সত্ত্বেও উপরোক্ত তিন দেবতা ও ধর্মমতের মধ্যে বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ধর্ম মতেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় আর বিষ্ণুর স্থলে তাঁহার অবতার রূপে শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও ভক্তিই এখানে অধিক প্রসার লাভ করে। এই শ্রীকৃষ্ণ আর গীতায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ এক নহেন, ইনি পুরাণে কীর্ত্তিত বৃন্দাবনের গোপিনীর সহিত রাস লীলার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। বাংলা দেশে এই পরিবেশ সৃষ্টি ও উহার উন্নতিতে দ্বিতীয় যুগের কতিপয় নবাব বাদশাহ ও তৃতীয় যুগের মুছলিম সাহিত্যিকগণের অবদান নেহায়েৎ কম ছিল না। ভাগবত, পদ্মপুরাণ, গৌর সংহিতা এবং বিশেষতঃ শ্রীমহৎমহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রাস ও প্রেম লীলার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের জন্ম কথা খণ্ডের ১৫শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের বিভিন্ন লৌকিক কীর্তি এবং একই খণ্ডের ২৮শ, ২৯শ, ৫২, ও ৫৩শ অধ্যায়ে তাঁহার যৌবনের প্রেমলীলার বিবৃত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ ও পদ্মপুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা সম্পর্কিত এক নিবন্ধে মিঃ হীরেন্দ্র নাথ দত্ত লিখিয়াছেন:

"আমরা দেখিয়াছি যে, ভাগবতের বর্ণনা অতিমাত্রায় যৌন আবেদন মূলক। কিন্তু

৫) সত্যার্থ প্রকাশ, ১১শ সমুল্লাস।

তথাপি উহাতে রাধার নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভাগবত হইতে আমরা যখন ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণে আসিয়া পৌছি তখনই মাত্র আমরা রাধার প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করি এবং এই দুইটি পুরাণে ভাগবতের যৌন ভাবের চরম বিকাশ দেখিতে পাই। ইহা উন্মত্ত প্রেমকাহিনী ব্যতীত আর কিছু নহে। সেখানে রাধা আছে, চন্দ্রাবলি আছে আয়ানও (রায়ান) আছে এবং এক কথায় আছে প্রেম তথা যৌন উন্মাদনার উদ্দাম লীলা খেলা—কাম দেবতা কন্দর্পের তাণ্ডব নৃত্য।" (৬)

এই উদ্দাম লীলাখেলার নমুনা আমরা ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ হইতেই পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"হে বৎস! আমার আজ্ঞানুসারে আমার নিয়োজিত কার্য্য করিতে উদ্‌যুক্ত হও। হে মুনে! জগদ্বিধাতা, ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাধা কৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে দেবী রাধিকা সহাস্যবদনে সকটাক্ষ-নেত্রে হরির বদনমণ্ডল বারংবার দর্শন করতঃ লজ্জায় মুখ আচ্ছাদন করিলেন। ১২৫—১৩০। অত্যন্ত কামবাণে পীড়িতা হওয়াতে রাধিকার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল; তখন তিনি ভক্তি পূর্ব্বক হরিকে প্রণাম করতঃ তাঁহার শয়নাগারে গমন করিয়া কস্তুরী কুঙ্কুম মিশ্রিত চন্দন ও অগুরুর পঙ্ক কৃষ্ণের বক্ষে বিলেপন করিলেন ও স্বয়ং ললাটে তিলক ধারণ করিলেন। তৎপরে সুধা ও মধুপূর্ণ রত্নপাত্র হরিকে প্রদান করিলেন; হরি তাহা সাদরে গ্রহণ করতঃ ভোগ করিতে লাগিলেন। রাধিকা কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বূল কৃষ্ণকে প্রদান করিলেন, হরি সাদরে তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাধাও সম্মত হইয়া হরিপ্রদত্ত সুধারস তাম্বূল হরির সমক্ষেই চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ আনন্দে চর্ব্বিত তাম্বূল রাধাকে প্রদান করিলেন। রাধা তাহা পরম ভক্তির সহিত ভোজন করতঃ মুখকমল পান করিতে লাগিলেন। মধুসূদন রাধার চর্ব্বিত তাম্বূল যাচ্‌ঞা করাতে রাধিকা তখন হাস্য করতঃ বলিলেন, সে বিষয়ে আমাকে ক্ষমা কর। তাহার পর মাধব রাধিকার সর্ব্বাঙ্গে চন্দন অগুরু কস্তুরী কুঙ্কুম প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য লেপন করিলেন। কাম নিয়ত যাঁহার চরণকমল চিন্তা করে, অদ্য তিনিই রাধিকার সন্তোষের নিমিত্ত সেই পরানত কামের বশীভূত হইলেন। হে নারদ! যাঁহার ভৃত্যের ভৃত্য-সমীপে কাম পরাজিত হয়, অদ্য সেই কাম ভগবান স্বেচ্ছাময় বলিয়া তাঁহাকে কৌতুকে পরাজয় করিতে লাগিল। তৎপরে কৃষ্ণ রাধিকার কর ধারণ করিয়া স্বীয় বক্ষে স্থাপন করতঃ চতুর্ব্বিধ চুম্বনপূর্ব্বক তাঁহার বস্ত্র-শিথিল করিলেন। হে মুনে! রতিযুদ্ধে ক্ষুদ্রঘণ্টিকা সমস্ত বিচ্ছিন্ন হইল, চুম্বনে ওষ্ঠরাগ, আলিঙ্গনে চিত্রিত পত্রাবলি, শৃঙ্গারে কবরী ও সিন্দুরতিলক এবং বিপরীতবিহারে অলক্তাদির প্রভৃতি দূরীভূত হইল। ১৫১—১৫৩। রাধিকার সরসঙ্গমবশে সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল; তিনি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন; তাঁহার দিবারাত্রি জ্ঞান থাকিল না;

---

৬) পরিচয়, আশ্বিন, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ। মিঃ হীরেন্দ্র নাথ দত্ত হিন্দুধর্মের স্তম্ভস্বরূপ ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

কামশাস্ত্রপারদর্শী কৃষ্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গদ্বারা রাধিকার প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গন করতঃ অষ্টবিধ শৃঙ্গার করিলেন। পুনর্ব্বার সেই বক্রলোচনা রাধিকাকে আকর্ষণ করিয়া হস্ত ও নখদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তখন শৃঙ্গারসমরোদ্ভূত কঙ্কণ কিঙ্কিণী মঞ্জীর প্রভৃতির মনোহর শব্দ হইতে লাগিল। তৎপরে কামশাস্ত্র বিশারদ কৃষ্ণ, নির্জ্জনে কৌতুক বশতঃ রাধিকাকে বসন, কবরী ও বেশভূষাদি হইতে বিযুক্তা করিলেন। রাধিকাও তাঁহাকে চূড়াবিহীন এবং বেশ বস্ত্রাদি বিমুক্ত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই কার্য্য-কুশল বলিয়া তাঁহাদিগের সেইরূপ ভাব কোন ক্ষতিকর হইল না। মাধব রাধার হস্ত হইতে তাঁহার রত্নদর্পণ হরণ করিলেন, রাধিকাও মাধবের হস্ত বলপূর্ব্বক মুরলী গ্রহণ করিলেন। মাধব, রসপ্রসঙ্গে রাধার চিত্র অপহরণ করিলেন, রাধিকাও তাঁহার মন হরণ করিলেন। হে মুনে! সেই কামযুদ্ধ বিরত হইলে বক্রলোচনা রাধিকা হৃষ্টমনে প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে মুরলী প্রদান করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও রাধিকাকে উজ্জ্বল দর্পণ ও ক্রীড়াকমল প্রদান করিয়া তাঁহার মনোহর কবরীভার বন্ধক করিলেন ও ললাটে সিন্দুর দ্বারা তিলক প্রদান করিলেন। ১৫৪—১৬০।
হরি, রাধিকার যেরূপ বেশ ও বিচিত্র পত্রাবলি প্রভৃতি রচনা করিলেন, সেইরূপ রচনা করিতে সখীগণ দূরে থাকুক, বিশ্বকর্ম্মা পর্য্যন্তও অক্ষম। রাধিকা যখন কৃষ্ণের বেশবিন্যাস রচনা করিতে যত্ন করিলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহার কৈশোরভাব পরিত্যাগ করতঃ শিশুরূপ ধারণ করিলেন। সেই সময়ে রাধিকা দেখিলেন, সেই বালক ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া রোদন করিতেছেন এবং যে ভাবে নন্দ প্রদান করিয়াছিলেন তাদৃশ ভীরু। তখন রাধিকা ব্যথিতহৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ ইতস্ততঃ কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া না পাওয়াতে বিরহাতুরা ও শোকাকুলা হইলেন এবং কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া অতি করুণস্বরে কাকুক্তিতে বলিলেন, হে মহেশ! মাদৃশ দাসীজনের প্রতি এরূপ মায়া বিস্তার করিতেছেন কেন? এই কথা বলিয়া রাধা রোদন করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইলেন, কৃষ্ণও পূর্ব্ববৎ রোদন করিতে লাগিলেন। তখন এই দৈববাণী হইল "রাধে! তুমি রোদন করিতেছ কেন? কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ কর, যত দিন রাসমণ্ডপ বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তুমি এই স্থানে আগমন করিবে এবং ছায়ামাত্র গৃহে রাখিয়া স্বয়ং এই রাসমণ্ডলে আগমন করতঃ হরির সহিত নিত্য ঈপ্সিত রতি ভোগ করিবে, আর রোদন করিও না। হে সুন্দরি! এই বালকরূপী মায়েশ্বর প্রাণ-পতিকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া শোক পরিত্যাগ করতঃ নিজ মন্দিরে গমন কর।" এই দৈববাণী শ্রবণে রাধিকা প্রবোধযুক্তা হইয়া বালককে ক্রোড়ে ধারণ করতঃ সেই পুষ্পোদ্যান, বন ও রত্নমণ্ডপ প্রভৃতি সমস্ত দর্শন করিলেন। ১৬৪—১৭৩
হে নারদ! তৎপরে মনের ন্যায় বেগগামিনী রাধিকা শীঘ্র তথা হইতে নিমেষার্দ্ধে ? নন্দভবনে গমন করিলেন। আরক্তলোচনা রাধিকা উন্মুক্তবসনা হইয়া তাঁহার নয়নাম্বুসিক্ত সুস্নিগ্ধ শিশুকে যশোদাকরে অর্পণ করতঃ এই কথা বলিলেন, এই শিশু, অত্যন্ত স্থূল বলিয়া দুর্ব্বহ এবং ক্ষুধাতুর হইয়া নিয়ত ক্রন্দন করিতেছে; তোমার স্বামী গোষ্ঠে আমার হস্তে এই বালককে প্রদান করিয়াছিলেন; ইহার জন্য পথিমধ্যে আমি অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিয়াছি, ইহাকে

তুমি গ্রহণ কর! মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে দিন অত্যন্ত মন্দ হইয়াছে, অনবরত বৃষ্টিধারা পড়াতে বসন সকল আর্দ্র হইয়াছে; এইজন্য সেই পিচ্ছিল দুর্গমপথে ইহাকে বহন করিতে অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিয়াছি। ভদ্রে! এই বালককে গ্রহণ কর এবং স্বীয় স্তন্য প্রদান করিয়া ইহাকে তুষ্ট কর। আমি অনেকক্ষণ হইল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। অতএব এইক্ষণ গৃহে গমন করি, তুমি স্ব-গৃহে অবস্থান কর। সতী রাধিকা এই বলিয়া বালা প্রদান করতঃ স্বগৃহে গমন করিলেন। যশোদা বালককে ক্রোড়ে করিয়া স্তন প্রদান করতঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। রাধিকা স্বগৃহে গৃহকর্ম্মাদিতে বাহ্যিক নিবিষ্টা রহিলেন; কিন্তু প্রতিদিন সেই বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে হরিসহ রতিক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বৎস! তোমার সমীপে সুখপ্রদ মোক্ষদ ও পবিত্র শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বিষয় বর্ণনা করিলাম, অপর বিষয় তোমাকে বলিতেছি। ১৭৪—.৮১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

(পণ্ডিত পঞ্চাননতর্করত্ন সম্পাদিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পৃঃ ৪৫৯—৬১)।

দূরদর্শী হিন্দু সমাজেও এই সর্ব্বনাশের অনুভূতি কিরূপ তীব্রভাবে জাগ্রত হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে উদ্ধৃত মন্তব্য হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

আর্য্য মিশন ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত পঞ্চনন ভট্টাচার্য্য অতিমাত্রায় বিচলিত ও মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার সংকলিত শ্রীমৎ ভাবগত গীতার (৩১শ সংস্করণের) ভূমিকায় লিখিতেছেন: "আমাদের সকল শাস্ত্রীয় গ্রন্থই বোধক···এই গ্রন্থে (ভাগবত) শ্রীকৃষ্ণের হাস্যপরিহাস ও ষোল সহস্র গোপিনীর সহিত তাহার প্রেমলীলার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বর্তমান যুগের মানুষের মন আর কোন কিছু অন্ধভাবে বিশ্বাস করিতে রাজী নহে। সুতরাং যদি তাহারা এই সকল কাহিনীকে শুধুমাত্র শব্দ অর্থে গ্রহণ করে এবং এই সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থকে অশ্লীল ও কদর্য বলিয়া ঘৃণা করে তাহা হইলে ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই।···যদি দুষ্কৃতিকারীগণকে তাহাদের পাপ কার্য্যের জন্য ধর্ম ও শাস্ত্রের কথা তুলিয়া ভর্ৎসনা করা হয়, সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা উত্তর দেয় "তোমরা শাস্ত্র ও ধর্ম শিকায় তুলিয়া রাখ. ষোল হাজার গোপিনীর সহিত প্রণয়লীলা খেলিয়াও যদি শ্রীকৃষ্ণ নিষ্পাপ থাকিতে পারেন তাহা হইলে তাহার চাইতে অনেক কম পাপ করিয়াও কেন এই নশ্বর মানুষ পাপী হইবে।' যদি শব্দগত অর্থই আমাদের ধর্মশাস্ত্রের একমাত্র অর্থ হয়, তাহা হইলে হিন্দু ধর্মে কিছুই নাই। এই সমস্ত অশ্লীল ও তুচ্ছ বিষয়বস্তু লইয়া ধর্ম শাস্ত্র হইতে পারে কি করিয়া?"

অবশ্যই তাহা হওয়া উচিৎ নয়, তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাই হইয়াছে এবং কমপক্ষে দুই হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ নর নারী পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে অতি পুণ্য কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া এই সমস্ত যৌন অনাচার মূলক সাধন-ভজন ও অশ্লীল আচার অনুষ্ঠানাদি পালন করিয়া আসিতেছে।

অধিকতর দুঃখের কথা এই যে, বিভিন্ন শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মাধ্যমে মুছলিম

বাংলার লক্ষ লক্ষ লোকও এই সমস্ত ঘৃণ্য ও নোংরা আচার অনুষ্ঠান, অবাধ যৌন আচার, প্রেমমূলক মরমীবাদ এবং পুরাণে বর্ণিত রাধা কৃষ্ণের অশ্লীল প্রেমলীলাকে তাহাদের জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া শত শত বৎসরের জন্য অভিশাপগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

মুছলমান সমাজের উপর ইহার প্রভাব

বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলে হিন্দু সনাতন সমাজের কি সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার নৈতিক ও ধর্মীয় জ্ঞান-বিশ্বাসে কি জঘন্য অধঃপতন ঘটিয়াছে উপরের উদাহরণগুলি হইতে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

তৃতীয় যুগ তথা পতন যুগের শেষ দশকগুলির সমাপ্তির দিকে উপরে বর্ণিত কলুষিত পরিবেশের প্রভাবে বাংলার মুছলিম সমাজ নৈতিক অধঃপতন ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার এক অতি শোচনীয় স্তরে নামিয়া যায়। এই অধঃপতনের নজীর হিসাবে আমরা এখানে মুছলমান মারফতী ফকির বা নেড়ার অর্থাৎ মরমীবাদী ভিক্ষুকদের কয়েকটি মত-বিশ্বাস ও সাধন পদ্ধতির উল্লেখ করিতেছি। এই সমস্ত ফকিরের দল বিভিন্ন সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল—যাহা আউল, বাউল, কর্তা ভজা ও সহজিয়া ইত্যাদি হিন্দু বৈষ্ণব অথবা চৈতন্য সম্প্রদায়ের মুছলিম সংস্করণ ব্যতীত কিছু ছিল না!

(১) মদ্যপান ব্যতীত আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করা সম্ভব নহে সুতরাং আধ্যাত্মিক সাধনাও ইহা ব্যতীত সম্ভব হয় না। যে ব্যক্তি মদ্যপান ও গাঁজা ইত্যাদি সেবন করে সে অনতিকালের মধ্যেই মা'রেফতে এলাহী বা আল্লাহর জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়, আল্লাহর সান্নিধ্য হইতে দূরে রাখার জন্যই শয়তান মানুষকে মদ্যপানে নিষেধ করে। এই শয়তানের প্ররোচনায়ই মুছলিম শাস্ত্রবিদ বা শরিয়তী আলেমগণ মদ্যপান এবং অন্যান্য নেশা সেবনকে পাপ বলিয়া ফতোয়া দিতে শুরু করিয়াছেন। (পাঠকগণ এখানে এই বিশ্বাসের সহিত তান্ত্রিকদের পঞ্চতত্ত্বের একটি তত্ত্বের কিরূপ মিল রহিয়াছে তাহা অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন।)

(২) বাউলগণ যৌন সঙ্গমকে যৌন পূজা বা প্রকৃতি পূজা রূপে জ্ঞান করে। তথাকথিত এই প্রকৃতি পূজার 'চারিচন্দ্র ভেদ' নামে তাহাদের একটি অনুষ্ঠান রহিয়াছে। বাউলগণ ইহাকে ভক্তি ও উপাসনার একটি অতি পবিত্র অনুষ্ঠান বলিয়া বিবেচনা করিলেও সাধারণ মানুষের নিকট ইহা অতি বীভৎস ও পৈশাচিক বলিয়া মনে হইবে। তাহারা বলে যে, মানুষ এই চারিচন্দ্র বা মানব দেহের নির্য্যাস যথা রক্ত, বীর্য্য, মল ও মূত্র পিতার অণ্ডকোষ ও মাতার গর্ভ হইতে লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং চারিচন্দ্র বাহিরে নিক্ষেপ না করিয়া পুনরায় দেহে গ্রহণ ও রক্ষা করা কর্তব্য।[১] মুছলিম বাউল বা নেড়ার ফকিরগণ এই "চারিচন্দ্র ভেদে'র ন্যায় 'পঞ্চরস সাধন'ও করিয়া থাকে। ইহাদের নিজস্ব উদ্ভট ও নোংরা ভাষায় এই পঞ্চরসের নাম হইতেছে কালো,

১) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২৩৩ পৃষ্ঠা।

সাদা, লাল, হলুদ ও মুর্শিদ বা গুরুর বাক্য। চারিটি বর্ণ মন্ত্র, শুক্র ,রজঃ ও মলের অর্থজ্ঞাপক। স্বীয় স্ত্রী অথবা পরস্ত্রীর সহিত যৌন সঙ্গম করিয়া এই 'রস সাধন', 'রতি সাধন', 'লাল সাধন', ও গুটি সাধন করিতে হইবে। তান্ত্রিকদের অন্ধ অনুকরণে ইহার এক স্বর বিশিষ্ট বহু অনুনাসিক তন্ত্রমন্ত্র রচনা করিয়াছে আর অন্যান্য প্রকারের তন্ত্রমন্ত্রও ইহাদের যথেষ্ট রহিয়াছে। ২ তাহাদের পৈশাচিক সাধনপদ্ধতির বিভিন্ন পর্য্যায়ে এই সমস্ত তন্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। এই সমস্ত সাধনের প্রকৃতি এত কদর্য্য ও অশ্লীল যে, আমরা এখানে তাহার কোন একটির উদাহরণ পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছি।

(৩) কোরআন মজিদের বিভিন্ন শব্দ ও মূল তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা এই সমস্ত শয়তান নেড়ার ফকিরের দল দিয়াছে তাহাও অদ্ভুত। "হাওজে কাওসার" বলিতে তাহারা বেহেশ্‌তী সঞ্জীবনী সুধার পরিবর্তে স্ত্রীলোকের রজঃ বা ঋতুস্রাব বুঝে। যে পূজা পদ্ধতিতে এই ঘৃণ্য ফকিরের দল বীর্য্য পান করে—তাহার সূচনায়—'বীজ মে আল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ বীর্য্যে অবস্থান করেন এই অর্থে তাহারা "বিসমিল্লাহ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। তাহাদের মনের মদিনায় কোরানের বিশুদ্ধ ১০ পারা সদা জীবন্ত অবস্থায় বিদ্যমান। এই জন্যই শরীয়তিদের কোরানের কৃত্রিম ৩০ পারা তাহারা অনুসরণ করে না। তাহাদের এই শয়তানী মতবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে এছলামের নিষেধ বা হারাম সমূহকে পুণ্য কর্মরূপে মানিয়া চলা এবং ফরজ বা আদেশ সমূহকে পাপ রূপে প্রত্যাখ্যান করা।

(৪) এই মুছলিম ভিক্ষোপজীবি নেড়ার ফকির দলের পুরোহিত বা পীরেরা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপিনীদের বস্ত্র হরণের অনুরূপ এক অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যখন পীর তাহার মুরিদানের গ্রামে তশরিফ আনেন তখন গ্রামের সকল যুবতী ও কুমারী উত্তম বসনে সজ্জিতা হইয়া বৃন্দাবনের গোপিনীদের অনুকরণে একটি গৃহ কক্ষে পীরের সহিত মিলিত হয়। নাটকের প্রথম অঙ্কে এই সকল স্ত্রীলোক নৃত্য গীত শুরু করে। নিম্নে এই সখীসঙ্গীতের গদ্যরূপ প্রদত্ত হইল:

> "ও দিদি, যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতে চাও
> আর আত্মপ্রতারণা না করিয়া শীঘ্র আস
> দেখ, প্রেমের দেবতা আসিয়াছে
> আঁখি তোল, তাহার প্রতি তাকাও
> গুরু আসিয়াছে তোমাদের উদ্ধারের জন্য
> এমন গুরু কোথাও আর পাইবে না,
> হাঁ, গুরুর যাহাতে সুখ
> তাহা করিতে লজ্জা করিও না।"

গানটি গীত হইলে পর এই সমস্ত নারী তাহাদের গাত্রাবরণ খুলিয়া ফেলিয়া

---

২) উদাহরণ: আং ভিং সং ঙেঁ ঙেঁ ইত্যাদি।

সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া পড়ে এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। পীর এখানে কৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনিও তদ্রূপ এই সমস্ত উলঙ্গ নারীর পরিত্যক্ত বস্ত্র তুলিয়া লইয়া গৃহের একটি উঁচু তাকে রক্ষা করেন। এই পীর-কৃষ্ণের যেহেতু বাঁশী নাই, তাই তিনি নিম্নোক্তভাবে মুখে গান গাহিয়াই এই সব উলঙ্গরমণীগণকে যৌন-ভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলেন :

"হে যুবতীগণ, তোমাদের মোক্ষের পথ ভক্তকুলের পুরোহিতকে অর্ঘ্য স্বরূপ দেহদান কর।"

কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ না করিয়া পীরের যৌন লালসা পরিতৃপ্ত করাই ইহাদের প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। আর এই যৌন আবেগ পূর্ণ পরিবেশে পীরের সহিত ইহাদের যথেচ্ছ যৌন মিলনে কোনরূপ বাধা থাকিবে না তাহাও সহজেই অনুমেয়।

(৫) এই নেড়ার ফকিরদের আউল, অথবা আওলে আওলিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয় যে, তাহারা তাহাদের বিবাহিতা স্ত্রীদের সহিত সীমাবদ্ধ যৌন সঙ্গমকে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভের পক্ষে যথেষ্ট মনে করে না। তাহাদের যৌন লালসার পূর্ণ পরিতৃপ্তির জন্য প্রকাশ্য ও গোপনে যত অধিক সংখ্যক বারাঙ্গনা অথবা কুলনারীর সহিত তাহাদের ইচ্ছা ততজনের সহিত যৌন সঙ্গম তাহাদের এই নিগূঢ় সাধন পদ্ধতিতে প্রয়োজন হয়। অতএব তাহাদের স্ত্রীদের সহিত অন্য কোন পুরুষকে যৌন মিলনে লিপ্ত হইতে দেখিলে তাহারা কোনরূপ অসন্তোষ অথবা ঈর্ষা বোধ করে না। অন্যদিকে নারী পুরুষ উভয় পক্ষ হইতে এই ধরনের যৌন মিলনে কোনরূপ ঈর্ষার প্রশ্রয় না দেওয়াকে তাহারা আত্মশুদ্ধি ও আত্মিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য বিবেচনা করে।[১]

(৬) এই ভিক্ষোপজীবী ফকিরগণের 'ইচ্ছা পূরণ ভজন' নামে এক বিশেষ প্রকারের গোপন সাধন রীতি রহিয়াছে। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট হইতেছে—ইহাতে কোন পুরুষ বা নারী তাহার নিজেদের বা দলের অপর কাহারো যৌন আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত করিতে ইতস্তত: বা কোনরূপ লজ্জা বোধ করিবে না। এই উদ্দেশ্যে হতভাগ্য এই ফকির দলের নারী পুরুষ সকল ভক্ত "আখড়া" নামে একটি বিচ্ছিন্ন স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়া নানা দ্রব্য সেবন করে এবং যাহাকে যাহার ইচ্ছা তাহার সহিত যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হইয়া তাহাদের নিগূঢ় সাধনা চালাইয়া যায়। যদি দলের কোন নারী বা পুরুষ অন্য কোন পুরুষ বা নারীর যৌন কামনা চরিতার্থ করিতে আপত্তি জ্ঞাপন করে তাহা হইলে তাহাকে মহাপাপী বলিয়া অভিযুক্ত করা হয়। তান্ত্রিকদের মাতঙ্গী সম্প্রদায়ের 'মাতরমপি ন ত্যজেৎ' সূত্রের ন্যায় এই মুছলিম ফকিরের দলও নিম্নোক্ত সূত্র উদ্ভাবন করে :—

১) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২৩৭ পৃষ্ঠা।

"যখন তুমি তোমার পিতার মস্তিষ্কে ছিলে তখন যে নারীকে তুমি 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছ সেই নারীর স্বামী ছিলে।"

"একাধারে মাতা ও পত্নীর দৃষ্টান্ত হর-পার্বতীর মধ্যে প্রত্যক্ষ কর। যদিও হর পার্বতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, পার্বতীর স্বামী হন। আদম তাঁহার নিজ কন্যা বিশ্বজননী হাওয়াকে অপহরণ করেন (এবং তাঁহাকে তাঁহার পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।) যখন কৃষ্ণ ষোল সহস্র গোপিনীর সহিত প্রেমলীলা করেন তখন নারী গঙ্গা স্বরূপিণী এবং পুরুষ তাহাতে স্নানার্থী তীর্থযাত্রী। যখন তাহারা সঙ্গমে মিলিত হয় তখন তাহারা এক ও অভিন্ন। গঙ্গা স্নানে কাহারো ইতস্ততঃ করার কারণ নাই।"১

পতনযুগে মুছলিম বাংলার অধঃপতনের কার্যকারণ সম্পর্কে এই বর্ণনা আপাততঃ এখানেই আমরা শেষ করিতেছি। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এই তৃতীয় যুগের শেষ অধ্যায়ে আমরা সেই কুখ্যাত মীর জাফরের উল্লেখ দেখিতে পাই। ধর্মীয় এবং সামাজিক অর্থেও তাহার দাম্পট্য ছিল অত্যন্ত শঙ্কারজনক। কথিত আছে, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে যখন তাঁহার শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয় তখন স্বজন বান্ধবেরা তাহাকে হিন্দুদেবী কীরিটেশ্বরীর পদোদক (দেবী মূর্তির পদ ধৌত পানি) পান করিতে দেয়। এই ঘটনা হইতেও সেই সময়কার মুছলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অধঃপতনের চিত্রটি পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

---

১) মৌলবী রিয়াজ উদ্দিন আহমদ কৃত "বাউল ধ্বংস ফতোয়া," ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। এমনকি ঐ সময় বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলায় এই সমস্ত বীভৎস সাধন রীতি ও আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব অব্যাহত ছিল। উক্ত পুস্তকে অশ্লীল আচার অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

২০শ অধ্যায়

সামাজিক জীবনের মারাত্মক ব্যাধি

আমরা ইতিপূর্বে যে সব অনাচার ও কদাচারের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেছে সমাজ জীবনের বাহিরের দিক। তাহা যতই ঘৃণ্য ও যতই জঘন্য হউক না কেন, তাহা সুসাধ্য না হইলেও, একেবারে দুঃসাধ্য রোগ নহে। অভিজ্ঞ ও সহৃদয় চিকিৎসকের উপদেশ লাভের সুযোগ ঘটিলে এবং সেই উপদেশকে উপেক্ষা না করিলে, যথাসময় তাহার সম্পূর্ণ উপশম হইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু অতঃপর যেসব আধিব্যাধির উল্লেখ করিতে যাইতেছি, তাহা যুগপৎ ভাবে মারাত্মক ও সংক্রামক। সে রোগের আক্রমণস্থল হইতেছে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ মানুষের হৃৎপিণ্ডের উপর এবং তাহার মস্তিষ্কের উপর। এ রোগের বিষক্রিয়ায় মানব দেহের প্রত্যেক শোণিত বিন্দু, তাহার শরীরের প্রত্যেক রন্ধ্র পর্যন্ত আড়ষ্ট ও বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে, এবং অবস্থা বিশেষে তাহার বংশধরগণকে পর্যন্ত এই ব্যাধির অভিশাপ বহন করিয়া মরিতে হয়।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে, মোছলেম বঙ্গের—বাংলার মুছলমান সমাজের সামাজিক ইতিহাস। অর্থাৎ আমরা এমন একটি জাতির সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইতেছি, যাহার সমাজ দেহের প্রাণ-বস্তু হইতেছে এছলাম ধর্ম। এছলাম ধর্ম বলিতে আমরা বুঝি, আল্লার প্রেরিত ও তাঁহার রাছুলের প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে। কিন্তু এই আলোচনার প্রারম্ভে, আমি পাঠকবর্গকে চরম দুঃখের সহিত জানাইয়া রাখিতেছি যে, আল্লার প্রেরিত ও তাঁহার রাছুলের প্রবর্তিত এছলামের সন্ধান এদেশে খুব কমই পাওয়া যাইবে। বরং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কতকগুলি সংস্কার, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানই তাহার স্থলে এছলামের ছদ্মবেশে মোছলেম সমাজের মন ও মস্তিষ্কের উপর প্রবল প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া রহিয়াছে। নিম্নের বিবরণগুলিতে ইহারই মাতম আমাকে করিতে হইতেছে।

কোনো জাতি যখন আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে, এবং সেই সঙ্গে তাহার মরণকামী বৈরীশক্তি যখন নিজের দুষ্ট প্রতিভার সকল প্রকার উপাদান উপকরণ লইয়া তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে, তখন তাহার অবস্থা শোচনীয়তার নিম্নতম স্তরে উপনীত হইয়া যায়, আমাদের দেশের হতভাগ্য অনার্য্য জাতির ইতিহাসকে তাহার উদাহরণ স্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণচর্ম্ম অনার্য্য জাতিকে তাহাদের জন্মভূমি হইতে সমূলে উচ্ছিন্ন করার জন্য দেশের পণ্ডিত পুরোহিতরা বহু দেব দেবীর স্তুতিস্তব রচনা করিয়াছেন এবং সেই নিষ্ঠুর স্মৃতিকে

জাগ্রত করিয়া রাখার জন্য বহু পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আমাদের দেশের দুর্গোৎসব তাহারই মধ্যকার একটা প্রধান অনুষ্ঠান। অনার্য্য জাতির হত্যা সাধন কল্পে এই ধরাধামে দেবীর আগমন ঘটিল দশ প্রহরণ ধারিণী, সিংহবাহিনী দুর্গতিনাশিনী দুর্গা রূপে। এই উপাখ্যানকে চমৎকার করার জন্য মহিষ নামে একজন অসুরের কল্পনা করা হইয়াছে একটা অতি জঘন্য উপাখ্যানের মাধ্যমে।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, অনার্য জাতির নিপাত করার উদ্দেশ্যেই দেবীর বোধন করা হইয়াছিল এবং অনার্য্য-নিধন চেষ্টার সাফল্যকে উপলক্ষ করিয়াই বৎসর বৎসর হিন্দু বাংলার পল্লীতে পল্লীতে মহাধুমধামে এই উৎসব প্রতিপালিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিশোধ এই যে, সেই অনার্য্য জাতির লোকেরাই হইতেছে এই উৎসবের মেলা জমাইবার সর্বপ্রধান উপকরণ এবং দেবীবিসর্জনের বাহন ও বাজকর। তাহাদের জাতীয় অভিমানকে, তাহাদের অতীত গৌরবের ঐতিহ্যকে, এবং তাহাদের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানের শেষ অনুভূতিকে, অনুস্বর বিসর্গ কণ্টকিত শ্লোক ও সমাসের সম্মোহন উচ্চাটন ও বশীকরণ মন্ত্রগুলি দ্বারা এমন শোচনীয়ভাবে নস্যাৎ করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ভারতের সেই আদিম বীর ও সভ্য জাতির উত্তরাধিকারীরা তাহাদের নিজেদের মুক্তির কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে—এমন কি, তাহাদের অনেকে মুক্তিলাভের চেষ্টাকে পর্য্যন্ত মহাপাপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে।

আমাদের উপরও আত্মবিস্মৃতির ও হীনমানসিকতার এই ধরনের "আইয়ামে জাহেলিয়ৎ" নামিয়া আসিয়াছিল একদিন—যেদিন আমরা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সুতরাং কোরআনের বর্ণনা অনুসারে তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমরা আল্লাহকেও ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এছলাম ধর্ম্মের প্রাণবস্তু "তাওহীদ"কে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হই নাই- এমন কি, মোছলেম কুলে জন্ম গ্রহণ করাকেও আমাদের কোনো কোনো কবি প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করিয়া অনুশোচনা করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই। একটা উদাহরণ দিতেছি:—

ভক্ত কবি লাল মামুদ বৈষ্ণব সংশ্রবে আসিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি গভীরভাবে আস্থাবান হইয়া পড়েন। 'তিনি হিন্দুর মত আচার ব্যবহার করিতে থাকেন।...একটী বট বৃক্ষ মূলে তুলসী বৃক্ষ স্থাপন করিয়া রীতিমত সেবা পূজা করিতে থাকেন।"...যেদিন গোস্বামী প্রভু লালুর আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেদিন তাহার পাড়া হইতে নিম্নলিখিত গানটি গাহিয়া লাল মামুদ সকলকে কাঁদাইয়া দিয়াছিলেন:—

দয়াল হরি কৈ আমার,—
আমি পড়েছি ভব কারাগারে, আমায় কে করে উদ্ধার॥
ষড়রিপুর জ্বালা প্রাণে, সহ্য হয় না আর।
শত দোষের দোষী বলে, জন্মদিলে যবন কুলে
বিফলে গেল দিন আমার।

আমি কুলধর্ম্মে পরম ধর্ম্ম বলে, মত করলাম কদাচার ॥
যদিও তুমি আল্লা খোদা, তুমি লক্ষী, তুমি সারোদা,
সত্ত্ব রজঃ ত্রিগুণের আধার—
তবু হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ বলে ডাকতে প্রাণ কাঁদে আমার।
মনের খেদে বলতেছি এবার
হরি বলে প্রাণ যায় যেন আমার ॥

ভক্ত কবি লাল মামুদ দেবতার কোপে পড়িয়া "যবন কুলে" জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় ঘৃণিত যবন কুলে অবস্থান করার ফলে তিনি অনেক কদাচারও নিশ্চয় করিয়াছেন। এইসব কারণে কবিবর যাহার পর নাই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তাই অবশেষে "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ" জপ করিয়া সেই সব পাপ হইতে মোক্ষলাভের জন্য ব্যাকুল। হীন মানসিকতার এই কুৎসিত দৃশ্য আমরা উপরে দেখিয়াছি।

ভক্ত কবিদের মায়াময় প্রেম পিপাসা ইহাতে তৃপ্ত হইতে পারে নাই। কবি মোহাম্মদ আকবরের বন্দনা গীতের উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে (৪র্থ অধ্যায়ে) বিস্তারিতভাবে করিয়াছি।

আল্লাতাআলা কোরান মজীদের বিভিন্ন স্থানে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার যে মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, কবিবর তাহাকে যথেষ্ট মনে না করিয়া তাঁহাকে অবতারের মর্য্যাদা দিতে চাহিয়াছেন! তিনি আলোচ্য বন্দনা গীতিতে বলিতেছেন:—

হজরত রছুল বন্দি প্রভু নিজ সখা।
হিন্দু কুলে অবতারি,, চৈতন্যরূপে দেখা॥

শুনিয়াছি, কোনো এক বৃদ্ধা, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বদান্যতায় অতিমাত্রায় পুলকিত হইয়া, দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল—সাহেব, খোদা তোমাকে দারোগা করুন। আলোচ্য সময় বাংলার মুছলমান সমাজ বিভিন্ন বৈষ্ণব চক্কর-মক্করে পড়িয়া কিভাবে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল, আমাদের উদ্ধৃত উদাহরণ হইতে পাঠকগণ তাহা সহজে অনুধাবন করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি। শ্রী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের শ্রীচরণ-মাহাত্ম্যে শান্তিপুর ডোল ডোব হইয়াছিল, তাহার মহিমায় নদীয়া ভাসিয়া গিয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু ইহা নির্ভয়ে বলিতে পারি যে, বেদ-উপনিষদের শিক্ষা ও নীতিধারগণের সব উপদেশ অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য ভাসিয়া গিয়াছিল, আর মুছলমান সমাজ দীর্ঘ সময় ধরিয়া তাহার ভোলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল।

মুছলমান সমাজের সকলেই যে এই সর্ব্বনাশা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, এমন কথা বলার কোনো সঙ্গত কারণ নাই। সেই সাময়িক দুর্যোগের মধ্যে পড়িয়া সাধারণতঃ

মোছলেম সমাজ যে কিরূপ সম্বিতহারা ও কর্ত্তব্য-বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করার জন্যই আমাদের এই প্রসঙ্গের অবতারণা। এই চিত্রের অন্যদিকও আছে এবং তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

সম্পূর্ণ বিষয়টি স্পষ্ট করার মানসে আরো কতিপয় নমুনা পাঠকগণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

লালন শাহ গাহিতেছেন :—

পার কর চাঁদ গৌর আমায়—বেলা ডুবিল,
আমার হেলায় হেলায় অবহেলায় দিন তো বয়ে গেল।
আছে ভব-নদীর পাড়ি
নিতাই চাঁদ কাণ্ডারী।
কূলে বইসে বোধন করি
ও চাঁদ গৌর এইসেছে, ও চাঁদ গৌর হে কূলে বইসেছে।
আরও কুল-গৌরবিনী যাঁরা কূলে থাকে তারা
ও কুল ধুইয়া কি জল খাইব?
ও চাঁদ গৌর যদি পাই, ও চাঁদ গউর হে,
কূলে দিয়ে ছাই—
ফকির লালন বলে—শ্রীচরণের দাসী হইব।।

মুরশিদ, খোদা, ও নবী সম্পর্কীয়

মুরশিদ বিনে কি ধন আছে এই জগতে।
আপনে খোদা আপনে নবী,
আপনি সেই আদম ছবি।
আপ্ত রূপে করছে ধারণ
কে জানে তার লীলা কারণ।
নিরাকার হয় হাকিম নিরঞ্জণ—
মুরশিদ রূপ ভাবনা তাইতে।।
মুরশিদের চরণ সুধা পান করিলে যাবে ক্ষিদা,
ছাড়োবে মন মনের গিদা
ভজ এই নাম হৃদয়ে বইসে।...ইত্যাদি।

খোদা, নবী ও আদম ছবি :

ও পারে কে যাবি রে নবীর নৌকাতে আয়—
পুরু কাঠের নৌকাখানি—ও তার নাই
... ডুবাবার ভয়। ...

অজানী মাঝি যারা ডুবিয়া মরিবে তারা,
কেতাবে তাই কয়।
আবার ডুবিয়া মরিবে তারা,
ও সেই নৌকার ধাক্কায়।
যেমনি পোদা তেমনি নদী, তেমনি সেই আদম ছবি
জানিও নিশ্চয়।
লালন কয় আমি ও কই না,
ও আদি কোরানে তাই কয়।
—পারে কে যাবিরে নদীর নৌকায় আয়।।

অবতার সম্পর্কীয়

আল্লা নবী দুই অবতার
এক নূরেতে মিশকাত করা।
ঐ নূর সাধিলেন নিরঞ্জনকে
অমনি তাকে যাবে ধরা। ইত্যাদি।

কালা বা শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কীয়

কালা বইলে দিন ফুরাইল ডুবে আইল বেলা
সদায় বলো কালা।
... ...
যেতোরে নিঠুর কালা, নাইকা তার বিচ্ছেদ জ্বালা
আবার চক্ষু বুঁজে জপমালা নাম
'লা-শারিকাল্লা' সে কালা ।।

কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কীয়

কৃষ্ণপ্রেম করব বলে ঘুরে বেড়াই জনম ভরে
সে প্রেম করবো বলে গোলখানা
—এক রতির সাধ মিটল নারে।
রাধা রাণীর ঋণের দায়—
গৌর এসেছে নদীয়ায়,
বৃন্দাবনের কানাই আর বলাই—
নৈদে এসে নাম ধরেছে গৌর আর নিতাই।

অতঃপর গিজির সম্পর্কীয় পাগলা কানাইয়ের গান তুলিয়া দেওয়া হইল :

দেওয়ান খেজের চাঁদ—ও আমায় দেও আসি আছান।
পাগল কানাই ডাকে তোমায়—সামনে দেখি তুফান॥
ও তোমার নামের মহিমা আল্লা কোরানে বলে
আমি দেশ বিদেশে ফিরত্যাছি ওই নামেরই বলে।
ওরে খেজের নামের জোরে যেমন আগুন হয় পানি
পানিতে সমুদ্রে বিপদে হয় আছানি…ইত্যাদি।

(উদ্ধৃত গানগুলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হারামণি পঞ্চম খণ্ড হইতে লওয়া হইয়াছে)।

২১শ অধ্যায়

মোছলেম ভারতের চরম বিপর্যয়কাল

মোছলেম জাতির বিগত চৌদ্দশত বৎসরের ইতিহাস স্বভাবতঃ পৃথিবীর যে কোন জাতির ইতিহাসের ন্যায়ই বিভিন্ন প্রকারের বহু বিস্ময়কর ঘটনায় পূর্ণ। এই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সুখ সমৃদ্ধি, শান শওকত, আনন্দ উদ্দীপনা ও পৃষ্ঠপোষকতার বহু গৌরবময় কাহিনীর বিধৃতি অবশ্যই রহিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে দুর্বলতা, লজ্জা কলঙ্ক এবং ধ্বংস বিপর্যয়ের অনেক বেদনাদায়ক কাহিনীতেও ইহার পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হইয়া আছে। আমাদের মতে তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমানের শোকাবহ মৃত্যু বা শাহাদাৎ নিঃসন্দেহে মোছলেম জাতির ইতিহাসের প্রথম এবং বৃহত্তম দুর্ঘটনা। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরও জনৈক আততায়ীর হস্তে আহত হইয়া শাহাদৎ বরণ করেন। কিন্তু অভিজ্ঞ পাঠকেরা এ বিষয়ে সম্ভবতঃ আমার সহিত একমত হইবেন যে, তাঁহার এই শাহাদৎ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আরব কবির সুরে সুর মিলাইয়া হজরত ওছমানের শাহাদতের জন্য আমরা এই ভাবে শোকপ্রকাশ করিতে পারি :—

ما كان هلک قیس لهلک واحد

و لا كنه بنیان قوم تهد ما

(মা-কানা হাল্‌কো কায়ছেন লাহাল্‌কুন ওয়াহেদুন্
অলাকেন্নাহু বুনয়ানো কওমেন্ তাহাদ্দামা।)

কায়সের ধ্বংস, একটি একক ধ্বংস মাত্র ছিল না। এই একটি মাত্র ধ্বংসের ফলে একটি জাতির বুনিয়াদ চুরমার হইয়া গিয়াছিল।" এই ঘটনার পশ্চাদ ভূমিতে মোছলেম জাতিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য যে সমস্ত পাপ ও দুর্বলতা জমিয়া উঠিতেছিল তাহাই ছিল পরবর্তীকালে কারবালার হৃদয় বিদারক হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ।

ইহার পর তাতার জাতির অভ্যুত্থান এবং স্পেন হইতে মুছলমানদের অপ্রত্যাশিতভাবে বিতাড়ন এই দুইটি ঘটনাকে আমরা মুছলমানদের জাতীয় বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণরূপে উল্লেখ করিতে পারি। এ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, অতীত ইতিহাসের এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত ও পীড়াদায়ক। কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য এই অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য্য। একটি জাতির ইতিহাস আলোচনার মূল্য এইখানেই।

মোছলেম জাতির চতুর্থ ও সর্বশেষ যে সংকট অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা হইতেছে ভারতে মোগলদের * সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং এই বংশে জালালুদ্দিন শাহ আকবরের অভ্যুদয়। সেই সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সহস্র বৎসর যাবত যে সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তি প্রকাশ্যে

---

*'মোগল সাম্রাজ্য' শব্দটি স্পষ্টতঃই বিভ্রান্তিকর···টার্কস ইন ইণ্ডিয়া, ২য় পৃষ্ঠা।

অথবা গোপনে এছলাম ও মুছলমানদের সমাজ জীবনের ধ্বংস সাধনে লিপ্ত ছিল, সম্রাট আকবরের নিকট তাহা সমর্থন ও উৎসাহ পাইল। তিনি এই সমস্ত ধিরুদ্ধবাদের ব্যাখ্যাতাদের প্রচুর সম্মান ও সমাদরের সহিত তাঁহার দরবারে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। মুছলমানদের তামদ্দুনিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল সম্পদ ও শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য ভারতে যে হিন্দু মানসিকতা নীরবে অথচ অব্যাহতভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছিল—ইতিহাসের লিখিত ও সর্ব্ব সম্মত রায় অনুসারে—সেই হিন্দু মানসিকতাকে জীবন ধারায় প্রাধান্য দেওয়ার জন্য কোনরূপ চেষ্টারই তিনি ত্রুটি করেন নাই—। বলা বাহুল্য, একদিকে মুছলমান চিন্তানায়কগণ যে তীব্র ভাষায় আকবরের শাসননীতির নিন্দা করিয়াছেন এবং অপরদিকে মোছলেম বিরোধী ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকগণ যে তাঁহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও মহান সম্রাটরূপে প্রশংসাবাদ দিয়াছেন, ইহাই তাহার যথার্থ কারণ। আকবর সম্পর্কে মুছলিম ও অমুছলিম চিন্তাবিদদের এইরূপ সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী মত পোষণের মধ্যে বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি ছিল না।

মুছলমানের নিকট আকবর হইতেছেন তাহাদের অধঃপতন ও ধ্বংসের শ্রেষ্ঠতম প্রতীক এবং মোছলেম ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রকৃত কারণ। অন্যদিকে মুছলমানদের এই অধঃপতিত অবস্থার মধ্যেই শুরু হয় অপর পক্ষের অগ্র যাত্রা, আকবরের সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য ব্যতীত তাহা কখনো সম্ভব হইত না। আকবর সম্পর্কে দুই পক্ষের ভিন্ন মত পোষণের কারণ ইহাই এবং ইহাই ছিল স্বাভাবিক। মোছলেম জগত বিশেষতঃ মোছলেম ভারতের অন্ধকার যুগে চাগতাই বংশের এবং বিশেষ করিয়া আকবরের রাজত্বকালীন মুছলমানদের প্রকৃত সামাজিক অবস্থা নিরূপণের ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সেই সময়কার একটি সঠিক রাজনৈতিক ইতিহাস সংকলনের প্রচুর মাল মসলা মওজুদ রহিয়াছে। যত শীঘ্র মোছলেম ভারতের চিন্তানায়ক ও অনুসন্ধানকারীগণ এই অতি আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইবেন মুছলমানের নব-বিজয় যাত্রার পথ তত সহজতর হইয়া উঠিবে। বিষয়টি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে এবং এই নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে তাহা সম্ভবও নহে। তবে নিবন্ধের মূল বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আকবরের আমলের কয়েকটি পাপ এবং বর্ত্তমান মোছলেম সমাজে তাহার প্রতিক্রিয়া বা পরিণাম সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা এখানে নেহায়েৎ প্রয়োজন। এই সমস্ত পুরাতন পাপের উত্তরাধিকার ভারতের মুছলমানদিগকে এত অধঃপাতে ঠেলিয়া দিয়াছে যে, পাকিস্তান দাবীর সাফল্যের মধ্যেই তাহাদের একমাত্র রক্ষা কবচ রহিয়াছে ভাবিয়া তাহারা আনন্দে উল্লাসিত ও কর্মচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। যদি এই সমস্ত পাপ মুছলমানদের সমাজ দেহ হইতে সমূলে উচ্ছেদ করা না যায় তাহা হইলে বৃহত্তর আদর্শ ও আশা আকাঙ্খার বাস্তবায়ন দূরের কথা এই সর্বশেষ রক্ষা কবচটিকেও রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর না হইলেও আকবর অবশ্যই শিক্ষিত ছিলেন না। সুশিক্ষার মতই সৎসংসর্গের কল্যাণেও তিনি ছিলেন বঞ্চিত। চাগতাই বংশের ইতিহাসে কোন

মহৎ ও বৃহত্তর আদর্শের চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অতি স্বাভাবিক ভাবেই আকবর এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। মদ্যপান ও ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য দুষ্কর্মের পাপের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্তি এবং এই সঙ্গে নিজের আশাতীত রাজনৈতিক সাফল্যের দরুণ তিনি তাঁহার চরিত্র সংশোধন সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পান নাই আর তাহার প্রয়োজনও অনুভব করেন নাই। কোন্ আবহাওয়ার মধ্যে আকবরের হীন চক্রান্ত স্বার্থের বন্ধ সংঘাতে কিরূপ বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে তাহা অজানা নাই। এই অস্বাভাবিক পরিবেশের বিচ্ছিন্ন কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া আকবরের অসুস্থ কিন্তু তীক্ষ্ণ প্রতিভা একটি গতিশীল শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে এবং এই জন্যই জীবনের সকল অধ্যায়ে তাঁহার চরিত্রে একটা অদম্য উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ ঘটিয়াছে।

নানা দুষ্ট-প্রভাবে বিপথে পরিচালিত হইয়া আকবর এছলাম ও মোছলেম জাতির যে ক্ষতিসাধন করিয়াছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধের সুদ্রপরিসরে সম্ভব নহে, এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা মাত্র পেশ করিতেছি :—

এছলাম মুছলমানকে বহুদেববাদী, প্রকৃতিপূজক ও পৌত্তলিকদের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস পাঠে যতদূর আমরা জানিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাতে দেখা যায় যে, আকবরই এছলামের এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেন। নিজের বিবাহিত মুছলিম পত্নীর প্রতি অতি নিষ্ঠুর উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া জয়পুরের রাজা বিহারী মলের কন্যাকে তিনি মহিষীরূপে গ্রহণ করেন। ইতিহাস পাঠে আরো জানা যায় যে, তিনি জনৈকা খৃষ্টান রমণীকেও স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার হিন্দু পত্নীগণকে মূর্তি পূজার এবং অন্যান্য ধর্মকর্ম ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের যাবতীয় সুযোগ সুবিধাই করিয়া দিয়াছিলেন। এবং এ ব্যাপারে যাহাতে কোন বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি না হয় তৎপ্রতিও তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

ইহা একটি সর্বজনবিদিত সত্য যে, সম্রাট আকবর ভারতের পাঠান শক্তি তথা ভারতের তদানীন্তন দুর্দ্ধর্ষ সামরিক জাতির ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। যদি দেখা যাইত যে, এই বিধ্বস্ত সামরিক জাতির স্থান গ্রহণ করার জন্য তিনি আর একটি মোছলেম সামরিক জাতি গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে রাজনৈতিক উপযোগিতার অজুহাতেও অন্ততঃ তাহার এই অপকর্মকে ক্ষমা করা যাইত। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তাহার পরিবর্তে সম্রাট আকবর শাহ গাজী ১ তাঁহার শঠতাপূর্ণ কূটনীতি ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে মোছলেম ভারতের সামরিক শক্তি পুনর্গঠনের সকল ভবিষ্যত সম্ভাবনা গোড়াতেই বিনষ্ট করিয়া দেওয়ার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। বাইরাম খান, আদহাম খান, মোয়াজ্জম খান প্রভৃতির হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আকবরের এই ধ্বংসাত্মক নীতির জঘন্য প্রকাশ ঘটিয়াছে। তাঁহার এই আত্মঘাতী নীতি মাত্র কয়েকজন প্রভাবশালী মুছলিম,

১) মডার্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্টরি, সরকার, ৬১ পৃষ্ঠা।

বিশ্বস্ত অনুচর ও স্বজন নিধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। জনৈক ইউরোপীয় লেখকের ভাষায়, "বহিরাগত বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধেও নানা দমনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইল। সম্রাট জন্ম-সূত্রের সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া মাত্র ২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আপন নিয়তি ও তাঁহার বুকের দানবটির সহিত নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন।" ১ আকবরকে জানিতে হইলে তাঁহার বুকের এই অভিশপ্ত দানবটিকে জানিতে ও ইহাকে বুঝিতে হইবে।

এছলাম, মোছলেম জাতি এবং ভারতের চাগতাই বংশের ভবিষ্যৎ দুর্যোগের দিনে কাজে লাগিত এরূপ সকল শক্তি ও প্রতিভাকে ধ্বংস করিয়া দিয়া আকবর যখন তাঁহার চারিপাশে দৃষ্টি খুলিলেন এবং বিচারকের দৃষ্টিতে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন তখন তিনি ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলি দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে এবং এই সমস্ত শক্তির তৎপরতার ঢেউ ইতিমধ্যেই তাহার সাম্রাজ্যের সীমায় আসিয়া লাগিয়াছে। এছলামের সামরিক শক্তি তিনি পূর্ব্বেই ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। এই শক্তির পুনরুজ্জীবন তাঁহার পক্ষে এতদিন তিনি কল্যাণকর বিবেচনা করেন নাই। উদীয়মান খৃষ্টান শক্তির সহিত ভবিষ্যৎ সংঘর্ষ আশঙ্কা করিয়া তাঁহার বুকের দানবটি এখন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং ইংরেজের রাজনৈতিক স্বার্থের সহিত সন্ধি স্থাপনে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া পড়িল। তাঁহার আন্তরিকতার প্রমাণস্বরূপ তিনি খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য প্রকাশ করিলেন এবং দেশের বাহিরে ও ভিতরে এই ধরনের একটি গুজব রটিতে দিলেন যে, তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

বিদেশী খৃষ্টান শক্তির মতই দেশের অভ্যন্তরে হিন্দু শক্তি আকবরের গভীর উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সুযোগ পাইলেই এই হিন্দু শক্তি মোগল বংশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে, ইহা বুঝিবার মত বিচক্ষণতা তাঁহার ছিল। কিন্তু তাঁহার অনুসৃত ধ্বংসাত্মক নীতির অনিবার্য পরিণাম তাঁহার ভাগ্যে তখন নামিয়া আসিয়াছিল। তিনি এই শক্তির উপরই নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাজেই ক্রমবর্দ্ধমান এই হিন্দু শক্তির ভবিষ্যৎ অভ্যুত্থান সম্ভাবনার সূচনায়ই নির্মূল করার সাহস ও সংকল্পের পরিচয় তিনি দিতে পারিলেন না। এইরূপ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়িয়াই তিনি তাহার বিশ্ববিশ্রুত তথাকথিত ধর্মীয় উদারতা সহনশীলতার ছদ্ম আবরণে হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের এক অভিনব অসাধু নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন॥ হিন্দুদের নিকট তাঁহার উদ্দেশ্যের সততা প্রমাণের জন্য তিনি এছলামের অনেক বিধি নিষেধ অমান্য করিতে লাগিলেন। মুছলমানগণ বহু ধর্মীয় অধিকার ও সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল এবং হিন্দুগণ দেশে মূর্তি-পূজার অবাধ অধিকার লাভ করিল। শাহী মহলে মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজা একটি নিয়মিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হইল। জালালুদ্দিন আকবর শাহ

১) টার্কস ইন ইণ্ডিয়া, ৬০ পৃষ্ঠা।

গাজী স্বয়ং কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা পরিয়া চন্দন চর্চিত দেহে হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে দরবারে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। দরবারে হিন্দু পণ্ডিত ও সভাসদগণ "অষ্টে ঠাং" রীতি গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা সম্রাটকে আল্লার আসনে বসাইয়া "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো" এই ধ্বনিতে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়া সম্রাটের প্রতি কৃত্রিম আনুগত্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সম্রাট আকবরের প্রশংসা কীর্তনে তাহারা এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, দেবী বন্দনা রচনা করিতে গিয়াও হিন্দু ভক্ত কবি গাহিয়াছেন :—

"হেথা এক দেশ আছে নামে পঞ্চগৌড়।
সেখানে রাজত্ব করে বাদশাহ আকবর॥
অর্জুনের অবতার তিনি মহামতি।
বীরত্বে তুলনাহীন জ্ঞানে বৃহস্পতি॥
ত্রেতা যুগে রাম যেন অতি সযতনে।
এই কলি যুগে ভূপ পালে প্রজাগণে॥"[১]

এই ধরনের অসাধু বাগাড়ম্বর ও চাটুকারিতার বাস করার ফলে আকবরের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে এবং কালক্রমে এই দৃষ্টি-বিভ্রমই তাঁহাকে নিকৃষ্টতম আত্মপ্রতারণার পথে ঠেলিয়া দেয়। মোছলেম ভারতের সমাজ জীবনের বহিরাঙ্গে যে নিজীবতা ও রুগ্ন অবস্থা তখন বিরাজ করিতেছিল সম্রাট আকবরের নিকট তাহা এছলামের মৃত্যু লক্ষণরূপে প্রতীয়মান হইল। দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট মুছলিম ওলি আওলিয়া ফকির ও আলেমগণের হীন ও ঘৃণ্য আচরণ দর্শনে তাঁহার এই ধারণা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল।[২] অন্যদিকে তিনি দেখিতে পাইলেন হিন্দু জনসাধারণ, পণ্ডিত ও ধর্মপুরোহিতগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার এমন কি স্বয়ং ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতে শুরু করিয়াছে; গর্বিত এবং উচ্চবর্ণ সচেতন রাজপুত সামন্তগণ শাহী হেরেমে তাহাদের ভগ্নী ও কন্যাদের প্রেরণ করিয়াও সম্মানের সহিত তাহাদের সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছে। এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া আকবর এবং তাঁহার উপদেষ্টাগণ এই সুবর্ণ-সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন।

হাস্যকর দীন-ই-এলাহী ধর্ম নিয়মিতভাবে প্রচারের প্রস্তুতি শুরু হইল। তাঁহার এই প্রচেষ্টা ও প্রস্তুতি গ্রহণের সূচনার দিকে এক আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে পারস্যের তদানীন্তন শাহ বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হন (১৫৭৫ খৃঃ) এবং একজন সুন্নী শাহ তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে এছলামী-শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন 'মোলহেদ' নামে একটি ধর্মদ্রোহী সম্প্রদায় পারস্যে বিশেষ করিয়া কাস্পিয়ান সাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

---

১) চণ্ডী, মাধবাচার্য্য কর্তৃক ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে রচিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩৭২ পৃষ্ঠা।
২) বদাউনী, আইন-ই-আকবরী, মকতুবাতে মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী ইত্যাদি।

পারস্যের রাজনৈতিক বিপ্লব ও শাসক পরিবর্তনের এই অশান্ত অবস্থায় মোলহেদ সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ দলে দলে পারস্য ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সম্প্রদায়ের এছলাম বিরোধী শিক্ষা আকবরের প্রচারিত মতবাদের অনুরূপ হওয়ায় তিনি ইহাদের সাদরে তাঁহার দরবারে গ্রহণ করেন। এবং ইহাদের নেতাগণ ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁহার গোপন উপদেষ্টায় পরিণত হয়।[১] শিয়া সম্প্রদায়ের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে তাহাদের দ্বাদশ ইমাম আল হাসান আল-আস্‌কারীর পুত্র মোহাম্মদ বা ইমামুল মেহ্‌দীকে হিজরী ২০৬ সনে (তাঁহার পিতার দাফন কার্য্যের সময়) শেষ বারের মত সাধারণ্যে দেখা যায়। প্রচলিত বিশ্বাস মতে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহার পুনরাবির্ভাবের কথা ছিল। আকবরের নবাগত এই উপদেষ্টাগণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, হিজরী অব্দের এক সহস্র বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, এই শুভ মুহূর্তে তিনি যদি নিজেকে সেই লুক্কাইত ইমাম বা দীর্ঘ প্রতীক্ষিত 'মেহদী' বলিয়া ঘোষণা করেন তাহা হইলে একই সঙ্গে তাহার সকল উদ্দেশ্যই চরিতার্থ হইবে।

রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে সম্রাট আকবর সেই সময় এমনি ধরনের একটা কিছু করার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই এরূপ একটা সুবর্ণ সুযোগ তিনি হাতছাড়া হইতে দিলেন না। কয়েক বৎসরের আলাপ-আলোচনা ও চিন্তা ভাবনার পর সভাসদগণের মধ্যে তিনি 'দীন-ই-এলাহী' নামে তাহার নব উদ্ভাবিত এক অভিনব ধর্ম প্রচার করিতে শুরু করিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন বর্ণনা হইতে আমরা এই উদ্ভট ধর্মের সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করিতে পারি। তাঁহার এই ধর্ম একমাত্র তাঁহার সভাসদ এবং দরবারের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এছলামের সকল রীতি রেওয়াজ ও মুছলিম তমদ্দুনের সর্বশেষ চিহ্নসমূহ তাহার দরবার হইতে নির্বাসিত হয়। এছলামী 'ছালাম' বা শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের রীতি সরকারী ভাবে নিষিদ্ধ করা হয় এবং তাহার স্থলে সম্রাটের সম্মুখে নতজানু হইয়া সেজদা করার রেওয়াজ প্রবর্তিত হয়। সভাসদগণ নব ধর্মের বিধান অনুযায়ী 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া তাহাদের প্রথম আনুগত্য প্রকাশ করিতেন। কিন্তু এই ধ্বনি আল্লাহ মহান অর্থে নয়, সম্রাট আকবর মহান এই অর্থেই তাহারা উচ্চারণ করিতেন। প্রত্যুত্তরে অন্যেরা বলিতেন, 'জাল্লা জালালুহু' অর্থাৎ সর্বোচ্চ তাঁহার জালাল (আকবরের প্রকৃত নাম) বা মহিমা—যে বিশেষণ একমাত্র আল্লাহ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। এই জালালুদ্দিন আকবর শাহ স্বয়ং আল্লাহর অবতার, এই সমস্ত ধ্বনি দ্বারা ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইত। দরবারে সন্ধ্যা প্রদীপ প্রজ্জলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই আদর্শ (?) মুছলিম সম্রাট অগ্নিদেবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সপরিষদ উঠিয়া দাঁড়াইতেন। এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকায় আকবরের এই হাস্যকর দীন-ই-এলাহী সম্পর্কে এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে :—

১। হিষ্টরি অব ফ্যানাটিজম, ৩১ পৃষ্ঠা।

এই অদ্ভুত ধর্মের পয়গম্বর ছিলেন বাদশাহ আকবর স্বয়ং···। প্রতিদিন প্রত্যূষে তিনি সমগ্র বিশ্ব উজ্জীবনকারী পরমাত্মার প্রতীকরূপী সূর্য্যের পূজা করিতেন। অপর পক্ষে তিনি নিজে স্বয়ং অগণিত মূঢ় নর-নারী কর্তৃক পূজিত হইতেন। ১

সমসাময়িক ইতিহাসে আকবরের দীন-ই-এলাহী তথা স্বর্গীয় ধর্ম্মের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। এই সম্পর্কে বদাউনী ও অন্যান্যদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে জানা যায় যে, এই ধর্মের বিধান অনুযায়ী সর্বপ্রকার খাদ্যই হালাল ছিল। "হিজরী বর্ষ গণনা রীতি বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই দীন-ই-এলাহীর ফরমান অনুসারে বেশ্যাবৃত্তি আইনানুমোদিত ও ইহার উপর কর ধার্য্য করা হইয়াছিল।" এই সমস্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় হিন্দু সমাজের সংস্কার সংক্রান্ত দুই একটি বিধি নিষেধের উল্লেখ পাওয়া যায়। মোট কথা, এছলাম ও মুছলিম তমদ্দুনের সকল শিক্ষা ও উপাদানের বিরুদ্ধে এক নিষ্ঠুর বিদ্রোহ ঘোষণা এবং ইন্দো-ইরানীয় চিন্তাধারার সমন্বয়ে একটি নূতন প্রকৃতির পূজা ভিত্তিক ধর্ম প্রতিষ্ঠানই ছিল আকবরের ধর্মনীতির দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আকবরের পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল অগভীর, তাই হিন্দু মানসিকতার মর্মমূল যথার্থ স্বরূপ অনুধাবনেই শুধু তাঁহার ভুল হয় নাই—সেই সময়কার মুছলিম জাতির সাময়িক জড়তাকে তাহাদের মৃত্যুর লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াও তিনি বিরাট ভুল করিয়াছিলেন। যুগ যুগ সঞ্চিত পাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে এই সময়ে মুছলিম ভারতের জীবন ও আত্মা সাময়িকভাবে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিল বটে কিন্তু তাহার মৃত্যু ঘটে নাই—কারণ যে কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই একজন মুছলমান সব সময় মুছলমানই থাকিবে। যখন মুছলমানদের উপর আকবরের নির্যাতন চরমে পৌঁছিল, তখন এই নির্যাতনের কঠোর কশাঘাতে তাহাদের অন্তরের সুপ্ত অমর-আত্মা জাগিয়া উঠিল এবং দুর্বার গতিবেগে প্রচণ্ড প্রতি-আঘাত হানিয়া চলিল। মুছলিম আত্মার এই বিপুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই মুছলিম ভারতের পুনর্জাগরণ ও নব জয়-যাত্রার শুরু।

আকবরের পক্ষে মুছলিম সমাজের এই প্রতিক্রিয়া ও নবজাগরণে বিব্রত বোধ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাই প্রধানতঃ মুছলিম সমাজকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি একটি নূতন বায়াত নামার খসড়া প্রস্তুত করিয়া তাঁহার দরবারের পণ্ডিত ও জ্ঞানী গুণীবৃন্দকে তাহাতে স্বাক্ষর দান করিতে বলিলেন। যতদূর জানা যায়, দরবারের ১৮ জন সদস্য ইহাতে স্বাক্ষর দান করেন এবং একমাত্র বীরবল ছাড়া এই স্বাক্ষর-কারীদের সকলেই ছিলেন মুছলমান! ইহাদের মধ্যে মাখদুমুল মুলক, আব্দুন নবী প্রমুখ তদানীন্তন মুছলিম ভারতের নেতৃস্থানীয় ফকিহ ও আলেমের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা ভাবিতেও অত্যন্ত বেদনা বোধ হয় যে, এইরূপ দুইজন প্রখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিও আকবরের বায়াতনামায় স্বাক্ষর করিতে কোনরূপ কুণ্ঠা ও লজ্জা বোধ করেন নাই।

১) ভারতের শিল্পকলা : ১৪শ সংস্করণ।

আইন-ই-আকবরীতে এই দীর্ঘ বায়াতনামার পূর্ণ অনুলিপি প্রদত্ত হইয়াছে। ১ সমগ্র বায়াতনামাটির উপর একবার চোখ বুলাইয়া গেলেই পাঠকগণের পক্ষে ইহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, প্রাতিমধুর ধর্মকথা ও বাক্যবিন্যাসের আবরণে সম্রাট আকবর ও তাঁহার ধর্মদ্রোহী উপদেষ্টাগণ এছলামের মর্মমূলেই ছুরিকাঘাত হানিতে চাহিয়াছেন। এই বায়াত-নামার শর্ত অনুসারে এছলামের হুকুম নিষেধ সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত ও রায়দানের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তথাকথিত এছলামের সুলতান আবুল ফাতাহ জালালুদ্দীন মোহাম্মদ আকবর বাদশাহ গাজীকে। এই ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি কোন এমাম বা মুছলিম আইনজ্ঞের মতামত নিতে বাধ্য ছিলেন না। বস্তুতঃপক্ষে কোরআন হাদীস প্রভৃতি এছলামী ধর্ম গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ভাষ্যদান এবং এই সমস্ত ধর্মগ্রন্থের নামে চূড়ান্ত মত প্রদান ও রায়দানের সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় অগ্নি ও সূর্যের উপাসক, আরবী হরফের পরিচয় জ্ঞানহীন অশিক্ষিত এবং স্বয়ং দেবতা জ্ঞানে পূজিত একজন মদ্যপ ও লম্পট সম্রাটের হস্তে। বয়াতনামার উপসংহারে এই কয়টি ধর্মদ্রোহমূলক ছত্র দৃষ্ট হইবে:—

"আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, যদি মহামহিম সম্রাট বিবেচনাসম্মত জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রজাবৃন্দের কল্যাণে কোন আদেশ (কোরআন বিরোধী নহে) ২ জারী করেন তাহা হইলে তাহা প্রত্যেকের উপর বাধ্যতামূলক ও অবশ্যপালনীয় হইবে। ইহার বিরোধিতা পরকালে লাঞ্ছনা ও ইহজীবনে সমাজচ্যুতি ও ধ্বংস দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।"

আকবরের ধৃষ্টতার এখানেই শেষ হয় নাই। বায়েতনামায় স্বাক্ষর আদায় করিয়া এছলামের এই তথাকথিত ছোলতান, মোমেনগণের নেতা, ধর্মযোদ্ধা ও সম্রাট জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবর আল্লাহর মছজিদ ও রাছুলে করিমের মিম্বরের বিরুদ্ধে তাহার বিজয় অভিযান শুরু করিলেন। একদা এক জুমআর নামাজের উপলক্ষে ফতেহপুরের জামে মছজিদটিকে খুব সুন্দর ভাবে সজ্জিত করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে শাহী মিছিল মছজিদের তোরণে আসিয়া পৌঁছিলে মছজিদের আভ্যন্তরস্থিত জামাত হইতে একদল লোক আসিয়া বাদশাহ ও তাঁহার সঙ্গীগণকে অতি সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া মছজিদের ভিতরে লইয়া যান। এই সমস্ত লোক মোছলেম আলেম ও ফকিরের বেশে সজ্জিত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা স্বয়ং বাদশাহের চর ছিল। আকবরই তাহাদিগকে এই উদ্দেশ্যে মছজিদে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মছজিদে জামাতের অধিকাংশ লোকই ছিল হয় আকবরের সভাসদ না হয় তাঁহার ভৃত্য কিংবা আশ্রিত জন। সুতরাং বিরোধিতা

---

১) ব্লকম্যানের আইন-ই-আকবরী, ১ম খণ্ড ১৮৬ পৃষ্ঠা।

২) আকবর কিরূপ হীন ধূর্তামূলক উপায়ে এখানে কোরআনের মর্যাদা রক্ষার প্রয়াস পাইয়াছেন পাঠকগণকে নিশ্চয়ই তাহা বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন করে না। তাঁহার ভক্ত ইংরেজ লেখকগণ একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "বায়াতনামার মুখবন্ধ ও মূল অংশে এছলামের সহিত আপোষ ও উহার প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব লক্ষিত হইলেও আসলে উহা ছিল একটি নূতন ধর্মেরই বায়াতনামা।" হেনরী জর্জ কীনি, মোগল সাম্রাজ্য নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

অথবা প্রতিবাদের সামান্যতম আশঙ্কাও সেখানে ছিল না। এই উপলক্ষে মছজিদের মিম্বর হইতে বাদশাহ কর্তৃক খুৎবার জন্য ফৈজী পূর্বেই একটি উদ্বোধনী শ্লোক রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই শ্লোকের বিষয়বস্তু বাংলায় নিম্নরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে:

"প্রভু মোরে করেছেন রাজ্য অধিপতি,
দিয়েছেন জ্ঞান আর সাহস শকতি।
সত্য আর ভালবাসা দিয়েছেন বুকে,
তিনিই দিশারী মোর ন্যায়ে ভুলে চুকে।
হেন ভাষা নাই করি তাঁর গুণ গান,
আল্লাহু আকবর সেই আল্লাহ মহান।"

আকবর সারা জীবন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার স্বধর্মের কুৎসা ও নিন্দা-মন্দ করিয়া গিয়াছেন। অপরপক্ষে প্রকৃতি পূজকদের ধর্মের আদর্শ ও রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সমর্থন জানাইতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ওই দিন তিনি ফতেহপুর মছজিদে গিয়াছিলেন তাঁহার জীবনব্যাপী প্রচেষ্টার সর্বশেষ পর্যায়ের উপর একটা ধর্মীয় ছাপ এবং বাস্তব রূপ দানের উদ্দেশ্য লইয়া। তৎকালে ফতেহপুরে এমন একজন মুছলমানেরও অস্তিত্ব ছিল না যিনি প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটের এই ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষীণ আওয়াজও তুলিতে সাহসী ছিলেন। সকল সভাসদ এমন কি ধর্মনেতা আলেমগণও সম্রাটের এই ঔদ্ধত্যমূলক আচরণ নীরবে সমর্থন করিয়া গেলেন। সুতরাং জাগতিক দিক হইতে বিচার করিলে আকবরের পক্ষে এই কাজে কোনরূপ ইতস্তত: করা বা বিচলিত বোধ করার কোন কারণই ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার হৃদস্পন্দন অতি দ্রুত হইয়া উঠিল এবং উপরোক্ত শ্লোকের প্রথম তিন লাইন আবৃত্তি শেষ করা মাত্রই মহাপরাক্রমশালী এই ধর্মদ্রোহীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং নিতান্ত অসহায় বোধ করিয়া মিম্বর হইতে তাহাকে নামিয়া আসিতে হইল। এখানে পাঠকদের নিকট ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বলার প্রয়োজন করে না যে, শ্লোকের শেষ তিন ছত্রে আকবর আল্লাহর একজন 'অবতার' এই দাবীর পরিষ্কার ঘোষণা রহিয়াছে। কিন্তু এই ছত্রগুলি উচ্চারণে তাঁহার অসামর্থ্য ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, তিনি একজন ধর্মদ্রোহী ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিয়া আল্লাহ তাঁহার মসজিদ এবং তাঁহার প্রিয় নবীর মিম্বরের পবিত্রতা রক্ষা করিলেন। আকবরের গুণমুগ্ধ জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক এই ঘটনাটিকে নিম্নোক্ত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: কিন্তু এই ঘটনার যে ভাবাবেগের সঞ্চার হইল, তাহা যে দৃঢ়চিত্ত প্রবল শত্রুর মোকাবেলায়ও কখনও বিচলিত হয় নাই তাহা কে অভিভূত করিয়া দিল। যে হৃদয় সকল বিপদে শান্ত থাকিত এখন তাহা দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। যে কণ্ঠস্বর যুদ্ধের তুমুল হট্টনিনাদ ছাপাইয়াও ঊর্দ্ধে শ্রুত হইত এক্ষণে বালিকার কণ্ঠের ন্যায়ই তাহা ভাঙ্গিয়া

পড়িল। প্রথম তিন ছত্রের উচ্চারণ সমাপ্ত করার পূর্বেই এই সম্রাট-নবীকে সেই উচ্চ মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিতে হইল।[১]

এছলাম বিরোধী ধ্বংস অভিযান

দীর্ঘ ৪৭ বৎসর কাল রাজত্ব করার পর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে আকবরের মৃত্যু হয়। তাঁহার জীবনের শেষ দশ বৎসরের কোন বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। দুইজন ঐতিহাসিকের মধ্যে আবুল ফজল ১২ বৎসর পূর্বে নিহত হন এবং বদাউনী দশ বৎসর পূর্বে এন্তেকাল করেন। পরোক্ষ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য হইতে জানা যায় যে, সম্রাটের জীবনের শেষ দশ বৎসর কতিপয় শোকাবহ ঘটনা ও মৃত্যু এবং দীর্ঘকাল যাবত যে সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন সেইসবের শোচনীয় ব্যর্থতার ফলে অত্যন্ত দুঃখময় হইয়া উঠিয়াছিল। এই সমস্ত পরোক্ষ সূত্রে পরিষ্কারভাবে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, জীবনের এই সময়টিতে আকবর এছলামের প্রতি তাঁহার আজীবন বিরোধিতা ও বিদ্রোহের দরুন গভীর আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় দগ্ধীভূত হইতেছিলেন। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ অবশ্য এ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে "আকবর তাঁহার বলিষ্ঠ ও সুস্থ বিচার বুদ্ধি বলে যে কুসংস্কার[২] ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করিয়াছিলেন সেই কুসংস্কারকে পুনরায় গ্রহণ করিয়াই মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাহার কোনই গুরুত্ব নাই।"

এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে এই বিশ্বাসের ঐতিহাসিক বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া এখানে সম্ভব নহে। তবে কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া ইহা আমরা স্বীকার করিয়া নিতে পারি যে, রাজত্বের শেষ দশকের একটানা বিপর্যয় ও ব্যর্থতার ফলে তাঁহার মনোবল এরূপ শোচনীয়ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার মনে এই ধরনের একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া বা ভাবান্তর সৃষ্ট হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে। মাতুলপক্ষীয় আত্মীয় স্বজনের রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া আকবরের বিরুদ্ধে পুত্র জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহ ঘোষণা, জনৈক হিন্দু আততায়ী কর্তৃক তাঁহার আবাল্য বন্ধু, দার্শনিক ও উপদেষ্টা আবুল ফজলের নিষ্ঠুর হত্যা, তাঁহার দীন-ই-এলাহী ধর্মে দীক্ষিত একমাত্র হিন্দু রাজা মহেশদাস বা বীরবলের আফগানদের হস্তে শোচনীয় পরাজয় ও মৃত্যু বরণ, টোডরমল ও অন্যান্যদের তিরোধান এবং এমনি ধরনের কতিপয় দুর্ঘটনা[৩] জীবনের শেষ দিনগুলিতে আকবরের মনের সকল শান্তি হরণ করিয়া নেয় এবং তাহার জীবনকে অত্যন্ত দুঃখময় করিয়া তোলে। কিন্তু

---

১ টার্কস্ ইন্ ইণ্ডিয়া, ৬৯ পৃষ্ঠা।

২ কুসংস্কার বলিতে এই সমস্ত ঐতিহাসিক এছলামকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু মজার কথা এই যে, আকবরের পুতুল পূজা, জড়পূজা এবং তাঁহার ত্রিত্ববাদ বিশ্বাসের মধ্যে কুসংস্কারের কোন চিহ্নই তাঁহারা দেখেন নাই।

৩ ফৈজি আকবরের মৃত্যুর দশ বৎসর পূর্বে পরলোক গমন করেন।

আমাদের মতে এই সমস্তই হইতেছে প্রতিক্রিয়ার আংশিক কারণ। যদি আমরা ইহার প্রধান ও মূল কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে চাই তাহা হইলে তাঁহার জীবনের ২১শ হইতে ৩৭শ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ তাঁহার রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় সময়ের কার্য্যকলাপ আমাদের অনুধাবন করিতে হইবে। আকবরের রাজত্বের এই ষোলটি বৎসর ছিল বিশেষভাবেই কর্মবহুল। তাঁহার এই সময়কার কার্য্যাবলীর একটি হইতেছে ভারতের বিজিত অংশের রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার প্রচেষ্টা; এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হইতেছে নিজের স্বকপোলকল্পিত ধর্ম দীন-ই-এলাহীকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার আয়োজন। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রয়োজনে ইহাই তাঁহার জীবনের বৃহত্তম স্বপ্ন ও আকাঙ্খা হইয়া উঠে আর এইখানেই নামিয়া আসে তাঁহার জীবনের চরমতম ব্যর্থতা।

১৫৮৭ সাল পর্য্যন্ত মুছলমান কাজীগণের দ্বারা হিন্দুদের মামলা মোকদ্দমার বিচারে আইনগত কোন বাধা ছিল না। কিন্তু উক্ত সালেই এক ফরমান জারী করিয়া আকবর মুছলমান কাজীদের এই অধিকার হরণ করেন। হিন্দু সভাসদদিগকে খুশী ও তুষ্ট করার যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পর আকবর (১৫৮৮ খৃঃ) রাজা ভগবান দাসের ভাগিনের, পালিত পুত্র (দত্তক পুত্র) এবং উত্তরাধিকারী মানসিংহকে তাঁহার নব ধর্ম দীন-ই-এলাহীতে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই তেজস্বী রাজপুত আকবরের দাওয়াতের জবাবে বলেন "যদি জীবন উৎসর্গ করার সংকল্পই হয় মহামান্য সম্রাটের মতবাদ গ্রহণের একমাত্র অর্থ তাহা হইলে আমার ধারণা, আমি যে সম্রাটের একজন বিশ্বস্ত অনুসারী তাহার প্রমাণ আমি যথেষ্টই দিয়াছি। কিন্তু আমি একজন হিন্দু, সম্রাট আমাকে মুছল-মান হইতে বলিতেছেন না। আমি তৃতীয় কোন ধর্মের কথা অবগত নহি।" নবরত্নের অন্যতম রত্ন রাজা টোডরমলও আকবরের এই ধর্মীয় দৈরাচারে আত্মসমর্পন করেন নাই। সম্ভবতঃ ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে একজন গোঁড়া হিন্দুরূপেই তিনি পরলোক গমন করেন। আকবর হিজরী প্রথম সহস্রাব্দ পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষটিকে ব্যবহার করার জন্য যে চাতুর্য্যলীলা তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই আমরা পাঠকদিগের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছি।

১৫৯১ সালে ৯৯৯তম বৎসর পূর্ণ হইল কিন্তু আকবর নিজেকে অজ্ঞাত এমাম মেহদী অথবা দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মছিহরূপে ঘোষণা করিয়া এক ধর্মবিপ্লব শুরু করিবেন বলিয়া এতকাল গোপনে যে প্রচারণা চলিয়া আসিতেছিল হিজরী ১০০০ তম বৎসরে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অলীক প্রমাণিত হইল। কীনির ভাষায় "পরবর্ত্তী বৎসর ছিল মুছলিম অব্দের ১০০০তম বৎসর। এবং ইহার পরে যে বৎসর আসিল তাহা সেই সময়ে এক সহস্রাব্দের যে আশা ব্যাপকভাবে পোষণ করা হইতেছিল তাহার সমাধি রচনা করিল।" ১ প্রধানতঃ এই সব চরম আঘাত ও বিপর্যয়ের দরুণ আকবরের জীবনের শেষকাল অত্যন্ত দুঃখময় হইয়া উঠে এবং তাহার মনের সকল শান্তি তিরোহিত হয়।

১) টার্কস ইন ইণ্ডিয়া, ৭২ পৃষ্ঠা।

আকবরের রাজত্বকালের সকল অপকর্মের পরিণাম ভোগ তাঁহার মৃত্যুর সাথেই শেষ হইয়া যায় নাই। মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের শেষ মুহূর্ত পর্যান্ত তাঁহার সকল উত্তরাধিকারীকে জীবনের যথাসর্ব্বস্ব দিয়া এই অপকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভারতের দশকোটি মুছলমান আজ পর্য্যন্ত আকবরের অপকর্ম্মের দরুণ ক্ষতিপূরণের অবশিষ্ট উত্তরাধিকার বহনের দায় হইতে অব্যাহতি পায় নাই। মুছলমান পাঠকদের নিকট এই উত্তরাধিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করিনা।

তাই এখানে আমরা আকবরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের এই সমস্ত অশুভ উত্তরাধিকারের মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি, দ্রুত নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন মুছলমানদের সামাজিক, তামদ্দুনিক ও ধর্মীয় জীবনের সকল স্তরে কিরূপ গভীর ও ব্যাপকভাবে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়াছিল নিম্নোক্ত নজীরগুলি হইতেই তাহার কিছুটা ধারণা পাওয়া যাইবে।

(১) "১৬০৯ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স আগ্রায় আগমন করেন·· যথেষ্ট খাতির যত্ন করিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লওয়া হয়। সম্রাট (জাহাঙ্গীর) তাহাকে ঘনিষ্ট সহচর হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহাকে খেতাব ও বৃত্তিদান করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ করিলে ও ভারতে বসতি স্থাপনে রাজী থাকিলে তাঁহার সহিত শাহী মহলের একজন শ্বেতাঙ্গ তরুণীকে বিবাহ দানের প্রস্তাব করেন।"

(২) খৃষ্টানদের প্রতি তাহার সৌজন্যের (জাহাঙ্গীরের) মাত্রা এতদূর গড়াইয়াছিল যে, শাহী পরিবারের কয়েকজন শাহজাদা পর্য্যন্ত আগ্রার গীর্জায় প্রকাশ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ক্যাপ্টেন হকিন্সের নেতৃত্বে পরিচালিত স্থানীয় খৃষ্টান বাশেন্দা ও পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী পরিবৃত হইয়া মিছিল করিয়া তাঁহারা গীর্জায় গমন করিয়াছিলেন।" (কীনি ও কেক)।

(৩) "তিনি (জাহাঙ্গীর) রাত্রিকালেই তাহার বন্ধু সমাজকে লইয়া মদের নেশায় মাতিয়া উঠিতেন। শাহী মহলে সকল জাতির ইউরোপীয়দের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। তিনি এই ইউরোপীয়দের সহিত ভোর রাত্রি পর্য্যন্ত সুরা পানে মত্ত থাকিতেন।" (কার্ট্রন)?

(৪) মানুসি বেগম মমতাজ মহল সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "খৃষ্টানদের বিশেষতঃ পর্তুগীজদের প্রতি বেগমের মন খুবই বিরূপ ছিল। যৌবনে তাঁহার ফুফু সাম্রাজ্ঞী নূর জাহানের নিকট তিনি যে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন অংশতঃ সেই শিক্ষা এবং অংশতঃ জেসুইটগণ কর্তৃক ধর্মান্তরিত তাঁহার দুই বন্ধাকে হুগলীর পর্তুগীজগণ কর্তৃক আশ্রয় দানকেই তিনি (মানুসি) পর্তুগীজগণের প্রতি তাঁহার বিরূপ মনোভাবের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।"

(৫) জাহানারা বেগম দিল্লীতে গমন করেন এবং তথায় তাঁহার কূট কৌশল ও প্রভাত

সূর্য্যের উপাসিকা ভগ্নী রওশানারার সহিত ১৬ বৎসর অতিবাহিত করেন। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১

(৬) মানসিংহ ছিলেন একজন রাজপুত বীর ও মুর্তিপূজক হিন্দু। আকবর কর্তৃক তাঁহাকে তাঁহার দীন-ই-এলাহী ধর্ম্ম গ্রহণের আহ্বান জানাইলে তিনি যে তেজস্বিতা পূর্ণ না-বোধক জওয়াব দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়াছি। মানসিংহের এই আচরণের সহিত আকবরের দরবারের শ্রেষ্ঠ মুছলিম আলেম ও ফকিহগণের আচরণ তুলনা করিলেই বুঝা যইবে যে, এই সময়ে মুছলিম সমাজ অধঃপতনের কোন শোচনীয় স্তরে ও অতল গহ্বরে নামিয়া গিয়াছিল। প্রথমেই আমরা দেখতে পাই যে, একমাত্র বীরবল ছাড়া আর কোন হিন্দুকেই আকবর তাঁহার দীন-ই এলাহী ধর্ম্ম গ্রহণে সম্মত করাইতে পারেন নাই। অথচ অন্যদিকে শেখ আব্দুন নবী ও মওলানা মাখদুমুল মুলকের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম নেতাগণ সহ দরবারের প্রায় সকল মুছলিম সভাসদই তাঁহার রচিত রয়েত নামায় স্বাক্ষর দান করিলেন! শাহী মহলের নওরোজ উৎসবে এছলামের ছোলতান খেতাবধারী এই সম্রাট কর্ত্তৃক রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মুছলিম ধর্ম নেতা ও আলেমগণকে সুরা পানের আমন্ত্রণ এবং পরম কৃতজ্ঞচিত্তে এই সমস্ত ধর্ম নেতা ও আলেমগণ কর্ত্তৃক সেই আমন্ত্রণ গ্রহণের অতি মর্মন্তুদ কাহিনীও সমসাময়িক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। ২ আকবর এবং তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীগণের সময় মুছলমান লেখকগণ হিন্দী ভাষায় হিন্দু ধর্মের ভাব ও আদর্শ সম্বলিত পুস্তক প্রণয়ন করিতে শুরু করেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা এখানে 'মদন শতক' 'সামুদ্রিকা' ইত্যাদি পুস্তকের নাম উল্লেখ করিতে পারি।

এই পুস্তকের সূচনায় গ্রন্থকারগণ গণেশ, রামচন্দ্র প্রভৃতি দেবতার বন্দনা গাহিয়াছেন, 'রাম ভূষণ' নামক পুস্তক প্রণেতা ইয়াকুব খান, রাধাকৃষ্ণ, সরস্বতী ও গৌরী শঙ্করের স্তুতি কীর্ত্তন এবং এইসব দেব দেবীর প্রতি পূজা নিবেদন করিয়া ধর্মীয় উদারতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ৩

(৭)...আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে মুছলমানগণ ছালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পরিবর্তে বাদশাহকে নতজানু হইয়া সেজদা করিতেন অথবা তাহাদিগকে এইরূপ করিতে বাধ্য করা হইত। আইন করিয়া এই সময় গো-বধ করা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মুছলমানদিগকে বহু অনৈছলামিক আইন ও ফরমান মানিয়া চলিতে বাধ্য করা হয়। মছজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি নজর দেওয়া হইত না। রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও মেরামত কার্য্যের অভাবে বহু মছজিদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। অনেক মছজিদ হিন্দুরা ধ্বংস করিয়া দেয় অথবা মন্দির ও নাট্যশালায় রূপান্তরিত করে। জাহাঙ্গীরের

---

১) টার্কস ইন ইণ্ডিয়া, ৯৫, ১০০, ১২১ ও ১৩৫ পৃঃ।

২) বদাউনী।

৩) বিস্তারিত বিবরণের জন্য ১৯৩৯ সনের হিষ্টরিক্যাল কংগ্রেস মোগল যুগ অধ্যায়ের ৭—১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সময়কালীন বিজাপুরের মসজিদসমূহ সম্পর্কে ফেরিস্তা লিখিয়াছেন, "তাহারা (হিন্দুরা) মছজিদে প্রবেশ করিয়া সেখানে মূর্তি পূজা করিত এবং বাদ্যযন্ত্র সহযোগে দেব-দেবীর স্তোত্র বন্দনা গান গাহিত। ১

(৮) বিশ্বের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ। পৃথিবীর রাজা বাদশাহগণ তাঁহার অধীন প্রজা মাত্র। আল্লাহর কাছে তাঁহাদের মর্যাদা আর দশ জন সাধারণ মানুষের মর্যাদার অধিক নয়। ইহাই মুছলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া মুছলমান রাজা বাদশাহগণ তাঁহাদের মুদ্রার এক পার্শ্বে কোন না কোন আকারে কলেমা কিংবা আল্লাহর কোন একটি নাম অঙ্কিত করিতেন। ভারত হইতে এছলামের নাম নিশানা মুছিয়া দেওয়ার অতি ব্যগ্রতায় আকবর এই রীতি বাতেল করেন; এবং অগ্নিউপাসকগণের মধ্যে প্রচলিত সৌর বৎসরের নাম অঙ্কনের প্রথা প্রবর্তন করেন। তাঁহার যোগ্য পুত্র জাহাঙ্গীর তাঁহার মুদ্রায়—"মুদ্রা প্রস্তুতকালে সূর্য্য যে রাশিচক্রে অবস্থান করিবে সেই রাশিচক্র মুদ্রিত হইবে" এই মর্মের এক ফরমান জারী করিয়া আকবরের অনাচারকে ছাড়াইয়া যান।

(৯) আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রের ন্যায় মোগল চিত্রকলা ও স্থাপত্যেও হিন্দু প্রভাব এত অধিক প্রাধান্য লাভ করে যে, এই দুই সম্রাট মছজিদ নির্মাণেও হিন্দু ভাব ও আদর্শের ছাপ দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

(১০) আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, ইংরেজ ও খৃষ্টানদিগকে আকবর নানাভাবে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর এই সমস্ত শ্বেতাঙ্গ পরিবৃত হইয়া পানশালায় উৎসব-যামিনী যাপনে মত্ত রহিয়াছেন। এইসব রাজনৈতিক বণিকের দল ও জেসুইট খৃষ্টানেরা দরবারী নওরতনের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে অথবা ধর্মের বাণী প্রচার করিতে সুদূর ইংলণ্ড হইতে ভারতে আগমন করে নাই। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ পত্তনের উদ্দেশ্য লইয়াই তাহারা এ দেশে আগমন করিয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের সমাধি রচনার কাজ আকবরই শুরু করেন এবং তাঁহার মদ্যপ পুত্র, স্যার টমাস রো ও তাহার মূল পুরোহিত অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত চতুর কূটনীতিবিদ রেভারেণ্ড ই, ফেরিকে অতি মাত্রায় প্রশ্রয় দান করিয়া এই কাজটিকে ত্বরান্বিত করেন। আকবরের সময়ে ইংরাজেরা সুরাট বন্দরে নিজেদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে। তিন বৎসর মোগল দরবারে চেষ্টা তদ্বির করিয়া স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে তাহার সকল দাবী-দাওয়া ও আরজি মঞ্জুর করাইয়া লইতে সক্ষম হন। জাহাঙ্গীরের এই মঞ্জুরীর সর্ত্ত অনুযায়ী ইংরেজগণ অন্যায় বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা লাভ ছাড়াও তাঁহাদের সুরাটস্থিত কারখানাটিকে একটি শক্তিশালী সৈন্যশিবিরে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হয়। সুরাট সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে 'এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকায়'বলা হইয়াছে, "মূল ভূখণ্ডের যে স্থানটিতে ইংরেজেরা প্রথম কারখানা স্থাপন করিয়া ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বীজ বপন করে নগরীটি সেই

১) কনফেডারেসী অব ইণ্ডিয়া, ৫১ পৃষ্ঠা।

স্থানেই অবস্থিত। শাহী মঞ্জুরীর শর্ত অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শুধু মাত্র সুরাটেই নয়, মোগল সাম্রাজ্যের বহু কেন্দ্রে কারখানা স্থাপনের অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন। টমাস রো'র ভারত ত্যাগকালে সুরাট, আগ্রা, আহমদাবাদ ও ব্রচে ইংরেজদের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত কারখানার কর্তৃত্ব সুরাট কারখানার প্রধান কর্মকর্তার হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। উক্ত কর্মকর্তা কারখানা পরিচালনা ছাড়াও পারস্যের লোহিত সাগর উপকূলস্থিত বন্দর সমূহের সহিত কোম্পানীর বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেন।" ১ মোগল সাম্রাজ্যের সকল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সামরিক ঘাটিসহ ইংরেজদের কারখানা গড়িয়া উঠে।

মোছলেম ভারতের অন্ধকার যুগের আকবর ও জাহাঙ্গীর কৃত অপকর্ম ও উহার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ইহা হইল একটি অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র। আমাদের বিশ্বাস চিন্তাশীল ও নিরপেক্ষ পাঠকদের জন্য এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাই যথেষ্ট হইবে।

১) টেক্সট বুক অব মডার্ণ ইণ্ডিয়া হিষ্টরি, ২য় খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা।

২২শ অধ্যায়

এছলামের মৌলিক আদর্শ

কতকগুলি অপরিহার্য্য বিশ্বাস ও কতিপয় অলঙ্ঘনীয় অনুষ্ঠানের যৌগপতিক সমষ্টির সামগ্রিক স্বরূপের নামই ধর্ম। ইছলাম ধর্মেরও ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এইরূপ কতকগুলি বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের উপর। ইছলামিক পরিভাষায় এইগুলিকে বলা হয় আকীদা ও আমল। এই আকীদাগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান আকীদা হইতেছে, আল্লাতাআলার অস্তিত্ব ও তাঁহার তাওহীদ—তাঁহার জাত ও ছেফাতের কোনদিকে কোন অংশে এবং পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কোনভাবে সৃষ্টির কাহারও সামান্য মাত্র অধিকার না থাকার অটল, অচল ও অব্যয় অক্ষয় বিশ্বাস। এই বিশ্বাস অন্তরের ন্যায় তাহার জীবন সাধনায় প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক কথায় সক্রিয়ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে, এবং কোন অবস্থায় তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না। এই বিশ্বাসের ও এই আমলের নামই তাওহীদ।

তাওহীদের স্থান

আল্লাহ মানুষকে পয়দা ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বর্ত্ত জগতে কতকগুলি শৎ সুন্দর ও মহৎ কর্ত্তব্য পালনের দায়িত্ব অর্পন করিয়া, এবং অসৎ অসুন্দর ও অশোভন কার্য্য কলাপ হইতে বিরত থাকার নির্দ্দেশ দিয়া। বলা অবশ্যক, এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সাধারন শক্তিও তাহাকে প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য এই শক্তি হইতেছে কতকগুলি ব্যাপারে সীমিত। ফলতঃ এই সীমিত ইখতিয়ারের অব্যবহার, অপব্যবহারের জন্যই বান্দাকে তাহার স্রষ্টা ও প্রভু প্রতিপালকের হুজুরে পরজীবনে জওয়াবদিহি করিতে হইবে। কারণ সৎ ও অসৎ বিচার করার মত সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধিও তিনি বান্দাকে যথেষ্ট ভাবে প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্বেও মানুষ সময় সময় বা অধিক সময় ইচ্ছাপূর্ব্বক অথবা অজ্ঞতা বশতঃ সেই বিবেক বুদ্ধির নির্দ্দেশকে অমান্য করিয়া পাপাচারে লিপ্ত হইয়া পড়ে, এবং তজ্জন্য তাহাকে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনে তাহার পাপের ভাগী হইতে হয়।

কোরআন মজীদে (ছুরা ফতেহায়) সর্ব্বপ্রথমে আল্লার গুণ বাচক বিশেষণ বা "ছেফত"রূপে রাব্বুল আলামীন পদের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ—আল্লাহ সর্ব্ব জগতের পোষক ও প্রতিপালক প্রভু, যিনি তরবিয়ত করিয়া সকলকে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাকারী। তদনুযায় মানব সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার অব্যবহিত পরে পরেই তিনি জানাইয়া দিয়াছেন :—

فاما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون—

بقره ৩৮

"অতঃপর আমার পক্ষ হইতে কোনো হাদী (পথ প্রদর্শক) নবী তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইবে যখন, তখন সেই হাদীর তাবেদারী করিবে যাহারা, কোনো প্রকার ভীতিগ্রস্ত হইবে না তাহারা এবং দুঃখ ভোগীও হইবে না তাহারা।" (ছুরা আল বাকারা ৩৮) আল্লার প্রেরিত নাবী-রাছুলগণ হইতেছেন সেই সৎ পথ প্রদর্শনকারী হাদী এবং আল্লার ওয়াদা অনুসারে অতীতে বহু নাবী রাছুল আসিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তখনকার নাবী রাছুলগণ আসিয়াছিলেন বিভিন্ন দেশবাসীদিগের বা বিশিষ্ট কোনো এক জাতির নিকট—সাময়িক ভাবে। তখনকার পরিস্থিতি অনুসারে ইহার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

কালক্রমে দুনয়ার যখন বৈজ্ঞানিকযুগের সূচনা আরম্ভ হইল। দুনয়ার ভৌগোলিক ব্যবধান তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইল, বিচ্ছিন্ন মানব সমাজের পক্ষে পরস্পর পরিচিত হওয়ার সুযোগ সুবিধা সহজতর হইয়া যাইতে আরম্ভ হইল, তখনই সেই রাব্বুল আলামীনের রহমত এক বিশ্বজনীন ধর্মের উপক্রম হিসাবে নামিয়া আসিল দুনয়ার সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বপ্রধান তাওহীদের আদি কেন্দ্র—ইবরাহীমের কোরবাণগাহে, ইছলামের মর্ম্মকেন্দ্র পুণ্য-পূত মক্কা ধামে। সেই ধর্ম্মের নাম ইছলাম, এবং তাহার অনুসরণ করি বলিয়া আমাদের ধর্ম্মীয় বিশেষণ হইয়াছে মোছলেম বা মুছলমান।

উপরে যে বিশ্বাস ও যে আমলের কথা বলা হইয়াছে, সে গুলির সহিত পূর্ব্বে উদ্ধৃত গান ও কবিতাগুলি মিলাইয়া দেখিতে হইবে, তাহা ইছলামের শিক্ষার সহিত সামঞ্জস, না তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি এই সবকে কোরআনের সমস্ত মৌলিক শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া মনে করি।

এই পরিস্থিতির সংশ্রবে আসিয়া, "মোছলেম" বাংলার সামাজিক জীবনের ইতিহাস লেখককে, অন্ততঃ সেই সমাজের অতীত দেড় হাজার বৎসরের জীবন সাধনার পদ্ধতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যথাযথভাবে সন্ধান লইতে হইবে—তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বুঝিতে হইবে, মোছলেম নামধারী আমরা ইছলাম ধর্ম্মের বিশেষতঃ তাহার মূল ভিত্তি স্বরূপ তাওহীদ-শিক্ষার অনুসরণ করিয়াছি কি পরিমাণে, পক্ষান্তরে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া আসিয়াছি কি পরিমাণে? এই যোগ বিয়োগের ফলে আমাদের জাতীয় স্বরূপ যাহা দাড়াইবে তাহাই হইবে আমাদের সত্যকার ইতিহাস।

প্রথমে কলেমায়ে তাওহীদ হইতে আরম্ভ করা যাউক—ইহার দুইটী অংশ (১) লাইলাহা ইল্লাল্লাহ (২) মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ। আল্লাহ ব্যতীত মা'বুদ বা পূজা অর্চ্চনার যোগ্যপাত্র আর কেহই নাই, আর কিছুই নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) হইতেছেন তাঁহার পয়গাম বহনকারী (পায়গম্বর) বা রাছুল। এছলামের ব্যবস্থায় কালেমায় তাওহীদের সঙ্গে সঙ্গে কালেমায় শাহাদতের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়া আছে। ইহার আরবী হইতেছে :—

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده و رسوله ـ

"আমি বিশ্বাস ও প্রকাশ করিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা অর্চ্চনার যোগ্যপাত্র আর কেহই নাই, আর কিছুই নাই, তিনি একক এবং তাঁহার জাত ও ছেফাতে (তাঁহার সত্তার ও কোনো গুণের) শরীক কেহই নাই; এবং আরও স্বীকার ও প্রকাশ করিতেছি যে, মোহাম্মাদ হইতেছেন তাঁহার বান্দা ও তাঁহার প্রেরিত ও পয়গাম বাহক।

পূর্ব্বেকার উদ্ধৃত ভজন পূজনের স্তবস্তুতিগুলি এই দুটি কলেমার ভাব ও তাৎপর্য্যের সহিত মিলাইয়া দেখিলে প্রত্যেক নিরপেক্ষ পাঠকই বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ উক্তিগুলির কলেমা দুইটীর সহিত কোনো অংশের বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। বরং ঐগুলির প্রত্যেক শব্দ ও প্রত্যেক ছত্র হইতেছে উভয় কলেমার সম্পূর্ণ বিপরীত একটা মিথ্যা ও অনৈছলামিক শয়তানী প্ররোচনা মাত্র। এই অছওয়াছার বাস্তব নমুনা হিসাবে পূর্ব্বে যেসব উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, মোছলেম বঙ্গের তৎকালীন সামাজিক জীবনের পরিচয় লাভের জন্য তাহাই যথেষ্ট হইবে বলিয়া আশা করি। ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিতে হইলে এবং এইসব মহাপাতকের কার্য্যকারণ পরম্পরার সঠিক ভাবে সন্ধান লইতে হইলে মোছলেম ভারতের বিগত দ্বাদশ শতকের উত্থান পতনের মূলীভূত অন্ধ বিশ্বাস ও অনৈছলামিক ধ্যানধারণার সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হইতে হইবে। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে—সেদিকে আমরা আল্লার সন্ধান পাইব না, পাইব অগ্নিপূজক ও সূর্য উপাসক ইরাণীদিগের প্রচারিত এবং ভারতীয় পৌত্তলিকদিগের "হামাউস্ত" বা কঠোর অদৃষ্টবাদের সন্ধান, অহদাতুল অজুদ বা অদ্বৈতবাদের সন্ধান, যোগসাধনা ও তান্ত্রিক কদাচারের সন্ধান, ৩ হইতে ৩৩ কোটি দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনার সন্ধান। আল্লার হাজার হাজার শোকর, ইহার প্রতিবিধানে নিবেদিত চিত্ত একদল মোজাহেদের বা এক শ্রেণীর মোজাহেদের আপ্রাণ চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রামের সন্ধানও আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ইঁহারা যে মশাল জ্বালাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অক্ষয় অব্যয় নূরের জৌলুসে আমাদের গম্যপথ ও পথের উদ্দিষ্ট মনজেল আজও نور على نور নূরুন আলা নূরিন্ হইয়া রহিয়া গিয়াছে।

তাতারীদিগের উত্থান ও তাহার ভয়াবহ পরিণতির কথা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু জাতির স্বহস্ত-সঞ্চিত যে মহাপাতকপুঞ্জের প্রতিক্রিয়া চঙ্গেজ ও হালাকু খাঁ রূপে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রতি লক্ষ্য করার মত চিন্তাশীল মানুষ মুছলমান সমাজে আজও খুব কমই দেখা যায়। সমসাময়িক যুগের যে মহামানবটি সর্ব্বপ্রথমে উত্থান করিয়াছিলেন যুগপৎভাবে তাতারী বিপ্লবের ও নিজেদের আভ্যন্তরীন ত্রুটি বিচ্যুতিগুলির বিরুদ্ধে—তিনি হইতেছেন শায়খুল-এছলাম এমাম এবনে-তাইমিয়া। অনুপম পাণ্ডিত্য, অসাধারণ প্রতিভা, অতুলনীয় শাস্ত্র-জ্ঞান, বিপুল কর্ম্মশক্তি, দুর্দ্দমনীয় সাহস ও দুর্লভ আন্তরিকতা এবনে-তাইমিয়ার জীবনকে বস্তুতই একজন আদর্শ মোজাহেদের জীবনে পরিণত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার তেজোদৃপ্ত কণ্ঠ, তাঁহার স্বর্ণগ্রন্থ, লেখনী এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ

তরবারী প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া এছলাম ধর্ম্ম ও মুছলমান জাতির যে কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছে, পতন যুগের সহস্রাব্দ ব্যাপী ইতিহাসে বস্তুতঃ তাহার তুলনা নাই। এমাম এবনে তাইমিয়াকে, জাতির এই কল্যাণ সাধনের "অপরাধে," বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে—এমন কি, আজিকার দিনে সর্ব্বপ্রধান সংস্কারক ও প্রবর্ত্তক বলিয়া বিশ্ব মোছলেমের দিকে দিকে সমস্বরে সম্মানিত এই মহান মোজাদ্দেদ ও বিপ্লবী এমামের শেষ নিশ্বাস বহির্গত হইয়াছিল কারাগারের একটা সংকীর্ণ ও নির্জ্জন কক্ষে।

এবনে-তাইমিয়ার জন্ম ৬৬১ হিজরী বা ১২৬২ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ৭২৮ হিজরী বা বা ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে। এমাম এবনে তাইমিয়ার পুণ্য জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর বিভিন্ন কঠিন সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার লেখনী সর্ব্বদা ও সর্ব্বক্ষণ কলমী জেহাদে তৎপর ছিল। তিনি যে সকল গ্রন্থ ও রেছালা প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ তালিকা প্রদান করা বর্ত্তমান নিবন্ধে সম্ভবপর নহে—উহার জন্য স্বতন্ত্র একটি পুস্তক রচনা আবশ্যক। অতি সংক্ষিপ্ত কথায় বলিতে গেলে এমাম ছাহেবের রচিত পুস্তকের সংখ্যা কেহ তিন শত, কেহ পাঁচ শত আর কেহ কেহ এক সহস্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, এমাম এবনে তাইমিয়া বিপুল সংখ্যক পুস্তক পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি প্রকাশ লাভ করিয়াছে, আরও অনেকগুলি প্রকাশ লাভ করিতে আজও সক্ষম হয় নাই। আমরা নিম্নে এমাম ছাহেবের বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত পুস্তকের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পাঠকগণের অবগতির জন্য পেশ করিতেছি—

তফ্ছীর ও	তৎ সম্পর্কিত	১০২ খানা
হাদীছ ও	,,	৪১ ,,
ফিক্হ, ফতাওয়া ও	,,	১৩৮ ,,
অছুল ফিক্হ ও	,,	২৮ ,,
আকায়েদ ও ইল্মে কালাম	,,	১২৬ ,,
আখলাক ও তছওউফ	,,	৭৮ ,,
মনতিক ও ফালছফার সমালোচনা	,,	১৭ ,,
পত্র আকারে		৭ ,,
বিবিধ বিষয়	,,	৫৪ ,,
	মোট	৫৯১ খানা

উল্লেখিত পুস্তকগুলির মধ্যে কোন কোনটি সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় রচিত। এবং ইতিমধ্যে এমাম ছাহেবের কতিপয় পুস্তকের উর্দ্দু অনুবাদও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

এমাম ছাহেবের শিক্ষা বর্ষঃ এমাম এবনে তায়মিয়া সুদীর্ঘ ৪৬ বৎসর ব্যাপী

অধ্যাপনার কাজ করিয়া গিয়াছেন। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁহার নিকট হইতে ফয়জ প্রাপ্ত ছাত্রগণের সংখ্যা নিরূপণ করা একটি দুরূহ ব্যাপার, সন্দেহ নাই। তবে এমাম ছাহেবের কতিপয় ছাত্র এরূপ ছিলেন যাঁহারা জ্ঞান, গরীমায় বিশ্ব জগতে বিশেষতঃ ইছলামগগণে জ্যোতিষ্মান নক্ষত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন। যাঁহারা বাস্তবপক্ষে তাঁহাদের উস্তাদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের তালিকাও অতি দীর্ঘ। আমরা নিম্নে তাঁহাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি।

শামছুদ্দীন আবু আবদুল্লা মোহাম্মদ বিন আবু বকর। তিনি এবনে কাইয়েম নামে খ্যাত ছিলেন। ৬৯১ হিজরীতে দামেশকে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৭৫১ হিজরীতে জান্নাতবাসী হন।

এমাদুদ্দীন আবুল ফেদা ইছমাঈল বিন শাহাবুদ্দীন আবু হাফজ বিন কছীর। ইনি হাফেজ এবনে কাছীর নামে ইছলাম জগতে সুপরিচিত। বিখ্যাত তফছীর এবনে কাছীর তাঁহারই রচিত। হিজরী ৭০০ সনে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন আর ৭৭৪ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল হাদী, জন্ম ৭০৪ হিজরী এবং মৃত্যু ৭৪৪ হিজরী।

জয়নুদ্দীন উমর বিন মুজাফফর, মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী। ইনি এবনে ওরদী নামে খ্যাত ছিলেন।

শায়খ বদরুদ্দীন বিন ছায়েগ (৬৭৬-৭৩৯ হিঃ) ইনি এবনুছ ছায়েগ নামে বিখ্যাত ছিলেন।

শায়খ শামছুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আহমদ (৬৬৬-৬৯৭ হিঃ) ইনি শায়খ দুলাহী নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

শায়খ নূরুদ্দীন এবনে ছায়েগ (৬৯৬-৭৪৯ হিঃ), শায়খ আহমদ বিন ফজলুল্লাহ আল উমরী (৭০০-৭৪৯ হিঃ), শায়খ আহম এবনে মোহাম্মদ এবনে মিররী, ইনি এবনে মিররী নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ও শায়খ আবদুল আজিজ।

আবুল আব্বাছ আহমদ বিন কুদামা মাকদেছী (৬৯৩-৭৫১ হিঃ) এবং আমিনুদ্দীন আবদুল ওয়াণী আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ এবনে আবু ইছাহক (৬৮৪-৭৩৫ হিঃ) (এমাম এবনে তাইমিয়া ও হায়াতে এবনে গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

এমাম এবনে-তাইমিয়ার এবং তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্র-শিষ্যগণের বিপ্লবী সাধনা ধারা, নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষসূত্রে হিন্দুস্থানে পৌঁছিতে আরম্ভ করিয়াছিল আকবারী যুগের বহু পূর্ব্ব হইতে। এবনে বতুতার ছফরনামায় (২—২৫২—৫৫ পৃষ্ঠা) বর্ণিত আছে যে, এবনে-তাইমিয়ার শিষ্য শায়খ আবদুল আজীজ, ছোলতান মোহাম্মদ তোগলকের দরবারে সসম্মানে গৃহীত হইয়াছিলেন। মোহাম্মদ তোগলক, ও তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ফিরোজ তোগলক, হিন্দুস্থানের পারিপার্শ্বিক প্রভাব হইতে এছলাম ধর্ম্ম ও মোছলেম জাতিকে মুক্ত করার জন্য যে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহার মূল প্রেরণাও

যে এবনে-তাইমিয়ার প্রতিষ্ঠিত সাধন কেন্দ্র হইতেই সজ্জিত হইয়াছিল, এই দুই ছোলতানের জীবনী পাঠ করিলে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ১

আকবরের প্রথম-জীবন পর্যন্ত নিখিল মোছলেমের এই সংস্কার ধারা, মোছলেম-ভারতের ক'একজন প্রধান পুরুষের মস্তিষ্কে অথবা তাঁহাদের মাদ্রাছাগুলির চার-দেওয়ালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল, সাধন দুর্দ্ধরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া উঠিতে পারে নাই। এই জেহাদকে সত্যরূপে ও প্রচণ্ডভাবে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া তোলার ভার আল্লাহ কর্ত্তৃক অর্পিত হইয়াছিল প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ مجدد الف ثانی বা দ্বিতীয় সহস্রাব্দীর মোজাদ্দেদ হজরত শেখ আহমদ ছরহন্দীর উপর। আকবরের জন্ম হইয়াছিল ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এবং ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মোজাদ্দেদ শেখ আহমদ ছরহন্দী জন্ম গ্রহণ করেন ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে এবং তিনি পরলোকগমন করেন ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং মোজাদ্দেদ ছাহেবের ধর্ম্ম সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যায় আকবরী শাসনের শেষ যুগ হইতে।

মোজাদ্দেদ ছাহেবের সাধনা ছিল যেমন বিরাট ও বিপুল, তেমনি ব্যাপক ও সর্বতোমুখী। সমসাময়িক সাধারণ আলেম ও সুফীদিগের ন্যায় রাজনৈতিক অনাচার বা দরবারী আলেমগণের ব্যভিচার হইতে দূরে সরিয়া গিয়া, খানকাহ ও মাদ্রাছার চার-দেওয়ালীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়া কোনগতিকে নিজের ঈমানটুকুকে রক্ষা করিয়া মরিয়া যাওয়াকেই তিনি নাএবে নবীগণের জীবনাদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই—অথবা কোন একটা মজহাব-বিশেষের ওকালতী করার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিমা লইয়াও তিনি ধর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন প্রত্যেক অধর্মের বিরুদ্ধে, প্রত্যেক অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক অনাচারী ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে। কাজেই সমসাময়িক রাজদরবার ও দরবারী আলেম সমাজ মোজাদ্দেদ ছাহেবের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ইহারই ফলে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজত্বের প্রথম যুগেই মোজাদ্দেদ ছাহেবকে গোয়ালিয়র দুর্গে আটক রাখার আদেশ প্রদান করেন। ২

কিন্তু সম্রাটের ক্রোধ, দরবারীগণের আক্রোশ অথবা গোয়ালিয়র দুর্গের প্রস্তর-প্রাচীর এই বীর মোজাদ্দেদের আত্মার তেজ ও ঈমানের প্রেরণাকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিতে পারে নাই। সেকালে প্রধান প্রধান নাগরিকগণের আবাস নির্মিত হইত

---

১) বর্ত্তমান যুগের বিকৃত ইতিহাস মোহাম্মদ তোগলককে যে রূপে বিকৃত করিয়াছে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

২) মোজাদ্দেদ ছাহেব তাঁহার কার্য্যাকার্য্যের কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক আহুত হইয়া রাজ দরবারে উপস্থিত হন এবং সম্রাটকে সেজদা করার পরিবর্ত্তে এছলামের বিধান অনুসারে "আছ-ছালামো আলায়কুম" বলিয়া সম্বোধন করেন। দরবারের মুফতী আলেমগণের ব্যবস্থা অনুসারে এই "অপরাধে" হজরত মোজাদ্দেদকে কারারুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

দুর্গ-প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগে এবং তাঁহাদের সংস্রবে অন্যান্য শ্রেণীর বহু লোক সমবেত হইয়া দুর্গটাকে একটা নগরে পরিণত করিয়া দিত। মোজাদ্দেদ ছাহেব কেল্লাবাসী সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এছলামের বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। গোয়ালিয়রের দুর্গাধিপ অল্পকাল পরে এই প্রচারের ফলাফল সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরের দরবারে যে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন, মোজাদ্দেদ-জীবনের অসাধারণত্বের কতকটা পরিচয় তাহা হইতেও পাওয়া যাইবে। দুর্গাধিপ জাহাঙ্গীরকে জানাইতেছেন—"এই বন্দীর প্রভাবে এখানকার পশুগুলি মানুষে এবং মানুষগুলি ফেরেশতায় পরিণত হইয়া যাইতেছে।"

হাদিছে আছে, হজরত রছুলে করিম বলিয়াছেন—

ان من اعظم الجهاد كلمة عدل (وفى رواية كلمة حق) عند سلطان جا ئر ـ
رواه الترمذى وابو داود و ابن ما جة عن ابى سعيد ـ ورواه احمد و النسائى
عن طارق بن شهاب ـ

অর্থাৎ, "অত্যাচারী রাজার নিকট সত্য ও ন্যায্য কথা (প্রকাশ করা) হইতেছে গুরুতর জেহাদ।" এই মহান আদর্শের অনুসরণ করিতে মোজাদ্দেদ ছাহেব কোন দিন কোন অবস্থায় সামান্য মাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নাই। এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলার জাহাঙ্গীরের আদেশে তাঁহাকে কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল, ইহা একটু পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। গোয়ালিয়র দুর্গাধিপের রিপোর্ট পাইয়া সেই জাহাঙ্গীরই একটা অভূতপূর্ব্ব ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মোজাদ্দেদ ছাহেবকে মুক্তি দিয়া সসম্মানে দিল্লী আনিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

এবার মোজাদ্দেদ ছাহেব রাজদরবারে আমন্ত্রিত ও মহাসম্মান্ত অতিথি। সম্রাটের আদেশে যুবরাজ খোররম (শাহজাহান) নিজে অগ্রবর্ত্তী হইয়া গোয়ালিয়রের সেই নিঃস্ব বিদ্রোহীকে পিতার পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা জানাইলেন। প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাট নিজে স্বাগত সম্ভাষণ নিবেদন করিয়া অতিথির প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু যে মাথা শুধু আল্লার হুজুরে ভূলুণ্ঠিত হওয়ার জন্য পয়দা হইয়াছে, তাহা এবারও রাজ সমক্ষে অবনমিত হইল না। অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী মুশরেকী সেজদা ও কাফেরী স্তুতি স্তাবকতায় কলুষিত মোগল দরবারের সমগ্র অশুভ পরিবেষ্টনকে কম্পিত করিয়া মোজাদ্দেদ ছাহেবের তেজদৃপ্ত কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল আবার সেই "আছ্ছালামু আলায়কুম"এর মধুর আহ্বান। এই মোলাকাতে শেখ আহমদ ছরহন্দী সাম্রাটকে তাঁহার পিতৃশাসনের অভিশাপ ও তাহার আত্মঘাতী কুফলগুলি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি এছলামের নামে দাবী জানাইলেন :—

(১) সম্রাটকে ছেজদা করার রীতি সম্পূর্ণভাবে রহিত করিতে হইবে।
(২) মুছলমানদিগকে গরু 'জবাই' করার অনুমতি দিতে হইবে।
(৩) সম্রাট ও তাঁহার দরবারীরা জমাআতে নামাজ আদায় করিবেন।
(৪) কাজীর পদ ও শরিয়তের মাহকামা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

(৫) সমস্ত বেদআৎ ও এছলাম-বিরোধী অনাচারকে সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে।

(৬) এছলাম-বিরোধী আইনগুলি রহিত করিতে হইবে।

(৭) ভগ্ন ও বিধ্বস্ত মছজিদগুলিকে আবাদ করিতে হইবে।

সম্রাট ইহা স্বীকার করিলেন এবং অনতিবিলম্বে তদনুসারে রাজকীয় ফর্ম্মানও প্রচারিত হইল। এই শ্রেণীর রাজনৈতিক ব্যাপারগুলি ব্যতীত, সে সময়ে বিভিন্ন দিক দিয়া যে সব অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার ধর্ম্মের ছদ্মবেশে মোছলেম ভারতের জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল, মোজাদ্দেদ ছাহেব তাঁহার প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক সংগ্রামেই তিনি জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের মোছলেম ভারতের একজন বিশিষ্ট চিন্তানায়ক সঙ্গতই বলিয়াছেন যে, "যথাসময়ে মোজাদ্দেদ ছাহেবের আবির্ভাব না হইলে আজ হইতে তিন শতাব্দী পূর্ব্বেই হিন্দুস্থানের পৃষ্ঠ হইতে এছলামের নামগন্ধ পর্য্যন্ত নিঃশেষে মুছিয়া যাইত।

সুখের বিষয়, মোজাদ্দেদ ছাহেবের সাধনা তাঁহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। ক্রমবর্দ্ধমান অনৈছলামিক প্রভাবের ও অমুছলমান প্রতিপত্তির যে ভয়াবহ ভবিষ্যতের আশঙ্কায় তাঁহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিয়াছিল, সেই আশঙ্কার অনুভূতি এবং সেই অনুভূতিজনিত তীব্রতর কর্মচাঞ্চল্যের স্পষ্ট প্রমাণ আমরা দেখিতে পাইতেছি—যথাক্রমে সম্রাট শাহজাহানের শাসননীতির পরিবর্ত্তনে, মুহিউদ্দীন আলমগীর বাদশাহ গাজীর জীবন-সংগ্রামে, শাহ অলীউল্লাহ ও তাঁহার হীরকখনিবৎ খান্দানের শতাব্দব্যাপী সাধনায় এবং সর্ব্বশেষ মোছলেম ভারতের মুক্তিসংগ্রামের সর্ব্বপ্রধান নায়ক ছৈয়দ আহমদ শহীদের জেহাদ ঘোষণায়।

মোজাদ্দেদ ছাহেবের সাধনার প্রভাবে জাহাঙ্গীরের শাসন নীতিতে যে পরিবর্ত্তনের সূচনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিত পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। মোজাদ্দেদ ছাহেবের পূর্ব্বকথিত আশঙ্কার অনুভূতি শাহজাহানের জীবনে এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, মোগল ইতিহাসের পাশ্চাত্য সমালোচকগণের অনেকেই তাহা দেখিয়া অতিমাত্রায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—It is very curious that Shahjahan, who was by birth only one fourth Mussulman should have been most bigoted of his race who had yet ruled India."

ইহা খুবই কৌতূহলজনক ব্যাপার যে, শাহ জাহান জন্মগতভাবে এক চতুর্থাংশ মুছলমান হইলেও তিনিই ছিলেন ভারতের মুছলমান শাসকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গোঁড়া।

সম্রাট আলমগীর যে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিরূপ সচেতন ছিলেন, তাঁহার সারা জীবনের কর্ম-সংস্থানই তাহার প্রমাণ। কিন্তু আলমগীরের এই সংগ্রাম মোছলেম-

ভারতের জাতীয় ইতিহাসের জন্য কোন একটা মঙ্গল ভবিষ্যতের সূচনা করিয়া যাইতে পারে নাই, এই সত্যকে আমরা কোনমতে অস্বীকার করিতে পারি না। বিপদের অনুভূতি আলমগীরের অন্তরে গভীর ভাবে বিদ্যমান ছিল, তাঁহার কর্মশক্তিরও অবধি ছিল না। এ সব সত্ত্বেও তাঁহার এই বিপুল সাধনা এমন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল, এ প্রশ্নের সত্যকার উত্তরও সে সময়কার রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে খুবই স্পষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। সেই উত্তরের সংক্ষিপ্ত সার এই যে, নিজে একজন নিষ্ঠাবান মুছলমান হওয়া সত্ত্বেও মোগল শাসননীতির চিরন্তন ধারার কবল হইতে আওরঙ্গজেব আপনাকে মুক্ত করিয়া নিতে পারেন নাই। মুছলমান জাতিকে সুসংহত ও সুসম্পন্নরূপে শক্তিশালী ও সুরক্ষিত করিয়া তোলার জন্য যে তেজের, যে আলোকের এবং প্রেরণার আবশ্যক হইয়া থাকে, কোরআনের বিশদ নির্দেশে এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন আদর্শেই তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। এই নির্দেশের ও এই আদর্শের অনুসরণ করার চেষ্টা আলমগীর বা তাঁহার উত্তরাধিকারীরা কোনদিনই করেন নাই। তাই ভারতের অমুছলমান শক্তি যখন এছলাম ধর্মের প্রত্যক্ষ বাহন ও উপকরণের বিরুদ্ধে উত্থান করার জন্য সংঘবদ্ধ হইয়া চলিয়াছিল, মুছলমানের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের প্রবর্ত্তন করার জন্য শিবাজীকে যখন শিবের সাক্ষাৎ অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছিল এবং চিরকালের উপেক্ষিত ও উৎপীড়িত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে এছলামের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিবার জন্য সৎনামী (বা সত্তরামী) ষড়যন্ত্রের প্রভাব যে সময় দিল্লীর দুর্গপ্রাচীরকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে চাহিতেছিল—সে সময়ও হতাবশেষ মোছলেম শক্তিগুলিকে নিঃশেষে নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলার পুরুষানুক্রমিক চেষ্টার সামান্য ব্যতিক্রমও দেখা যায় নাই। বেতনভোগী ব্যবসাদার সৈন্য ও সেনানায়কগণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া মোগল সিংহাসনকে রক্ষা করার পরিবর্ত্তে, ভারতের মুছলমানকে এছলামের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া একটা বিরাট ও দুর্দ্ধর্ষ মোজাহেদ সঙ্ঘ গড়িয়া তোলার এবং তাহার সাহায্যে এছলামী সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার সামান্য একটু আগ্রহের সন্ধানও সে সময়কার জাতীয় সাহিত্যের কোনদিকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সহস্র সহস্র মোজাহেদের জান কোরবানে স্বনামধন্য আহমদশাহ আবদালী পানিপথের পরীক্ষাক্ষেত্রে নূতন করিয়া যে সাফল্যমণ্ডিত জীবন-জেহাদের সূচনা করিয়াছিলেন তাহাও অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে জাতীয় জীবনের এই প্রেরণা ও এই প্রাণবস্তুর অভাবে।

সম্রাট আলমগীর এন্তেকাল করেন ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। স্বনামপ্রখ্যাত সূক্ষ্মদর্শী আলেম এবং মোছলেম ভারতের প্রধানতম চিন্তানায়ক শাহ অলিউল্লার জন্ম হয় ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে, এবং দিল্লীর অন্ধ সম্রাট শাহ আলমের সময়ে হিজরী সনের হিসাবে ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সুতরাং শাহ ছাহেব ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, মোটামুটিভাবে ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দেই লর্ড ক্লাইভ শাহ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীভার গ্রহণ

করিয়াছিলেন। সুতরাং মোছলেম ভারতের চরম অধঃপতনের শেষ ও শোচনীয় ইতিহাসটী রচিত হইয়া চলিয়াছিল শাহ ছাহেবের জীবন কালে এবং তাঁহার চক্ষের সম্মুখে। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের (৩য়) পানিপথ যুদ্ধের সাফল্য ও ব্যর্থতার সমস্ত কার্য্যকারণ পরম্পরার ক্রত অভিনয়ও শাহ ছাহেবের জীবনকালেই সম্পন্ন হয়—পলাশীর বিপর্য্যয়ও সংঘটিত হইয়া গিয়াছিল শাহ ছাহেবের জীবনকালে পানিপথ যুদ্ধেরও কএক বৎসর পূর্ব্বে।

হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার যে সর্ব্বনাশকর পরিণতির আশঙ্কায় ভারতীয় মুছলমানের জাতীয় মন ভবিষ্যতের ভাবনায় সেদিন বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, দূরদর্শী চিন্তানায়ক শাহ অলিউল্লাহ তাহার প্রত্যেকটি দিককে সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিকারের কার্য্যকরী উপায়ের নির্দ্দেশও তিনি দিয়াছিলেন। শাহ ছাহেবের সেই অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং তাঁহার সেই নির্দ্দেশের অনাবিল পরিচয় তাঁহার বিভিন্ন বহিপুস্তকে বহুল পরিমাণে আছে। হিন্দুরাজের শাসনের অভিশাপকে মস্তকে বহন করিয়া এছলাম ধর্ম্ম ও মুছলমান জাতি কোন মতেই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না—এই সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া শাহ ছাহেব সমসাময়িক মুছলমান বাদশাহ, আমীর, সৈনিক ও মোছলেম জনসাধারণকে সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত জেহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হইতে উপদেশ দিয়াছেন। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কর্ম্মপদ্ধতি হিসাবে তিনি সেই জেহাদের সম্পূর্ণ স্কিমও প্রদান করিয়াছেন। শাহ অলিউল্লার জীবন ইতিহাস আলোচনা করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং তাঁহার এতদসংক্রান্ত মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া তাহার কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাইনা। আগ্রহশীল পাঠকগণ শাহ ছাহেবের রচিত পুস্তকগুলি বিশেষতঃ ফয়ুজুল হারামাইন ও তফ্‌হিমাতে ইলাহিয়া পাঠ করিয়া দেখিলে আমাদের এই উক্তির সত্যতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মোটের উপর এখানকার বক্তব্য এই যে, মোছলেম ভারতের যে আশঙ্কা ও অনুভূতি একদিন পাকিস্তানের দাবীর মধ্য দিয়া ব্যাপকভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মোছলেম লীগের অথবা মোহাম্মদ আলী জিন্নার আবিষ্কৃত একটা অভিনব ব্যাপার মোটেই ছিল না। ইহা মুছলমানদের চিরন্তন জাতীয় অনুভূতির সাময়িক প্রকাশ মাত্র। ভারতে এই অনুভূতির সূচনা প্রথম আরম্ভ হইয়াছে আকবরের শাসন যুগে এবং শাহ অলিউল্লাহ সমস্ত জীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে সেই চিরন্তন অনুভূতিরই অভিব্যক্তি করিয়া গিয়াছেন।

মোজাদ্দেদে আল্‌ফে-ছানী শেখ আহমদ ছরহন্দী মোছলেম-ভারতের ভাব ও কর্ম্মে যে চাঞ্চল্যের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পূর্ণতা সাধিত হয় দিল্লীর স্বনামখ্যাত শাহ-পরিবারের বিশেষতঃ তাহার মধ্যমণিস্বরূপ শাহ অলিউল্লার অবিরাম সাধনার ফলে। কালক্রমে এই উভয় মোজাদ্দেদের সাধনা ধারা একত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়া যায়, রায়বেরেলীর একটি বিখ্যাত মোজাহেদ পরিবারে। "ভারতে অহ্‌হাবী সংগ্রামের প্রথম প্রবর্ত্তক" বলিয়া বিখ্যাত এমাম ছৈয়দ আহমদের উত্থান হয় এই ছৈয়দ পরিবারে। ছৈয়দ আহ্‌মদ ছাহেবের আবির্ভাব এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত মুক্তিসংগ্রাম মোছলেম ভারতের ইতিহাসে

একটা গুরুতর ব্যাপার। ইতিহাসের কোন্ যুগে এবং অবসাদ, নৈরাশ্য ও অপদার্থতার কোন্ সর্বনাশী পরিস্থিতির ব্যাপক আবেষ্টনের মধ্যে ছৈয়দ আহমদ মুছলমান জাতির আসন্ন গোরস্থানের বুকের উপর জয়জয়কার জাগ্রত করিয়া তুলিয়া ছিলেন, আজিকার দিনে জাতীয় জীবনের পক্ষে তাহার সম্যক আলোচনা একান্তই আবশ্যক। কারণ, জাতীয় আত্মার যে ভাব-চাঞ্চল্য সেদিনের মোছলেম ভারতকে পাকিস্তানের সাধনায় মধ্য দিয়া জীবন জেহাদে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, এই মহান এমামেরও লক্ষ্য ছিল তাহাই, বরং তাহা অপেক্ষাও গুরুতর- পূর্ণতর পাকিস্তান।

যুগের এমাম ছৈয়দ আহমদ শহীদের বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং তাঁহার মুক্তি সংগ্রামের শতাব্দীব্যাপী ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াও এখানে সম্ভব হইবেনা, সেজন্য একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করা আবশ্যক। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, মোছলেম রাজশক্তির বিনাশ এবং অমুছলমান রাজশক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে সমগ্র মোছলেম ভারতের জাতীয় জীবন স্বাভাবিকভাবে যে সব মারাত্মক অভিশাপে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, ছৈয়দ ছাহেব তাহারই প্রতিকার করিতে চাহিয়াছিলেন সুপ্ত চেতনা ও লুপ্তবিবেক মুছলমান জাতির সংহতি সাধন করিয়া, তাহাদের কর্মশক্তিকে ধর্মের প্রেরণায় নবভাবে নবতেজে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়া। ছৈয়দ ছাহেব নওয়াব ছোলায়মান জাহকে এক পত্রে লিখিয়াছেন :—

قضارا از مدت چند سال حکومت و سلطنت این ملک بر این منوال گردیده که نصارے نکوهیده خصال و مشرکین بد مال بر اکثر بلاد هند استیلا یا اند و آن دیار را بظلمت ظلم و بیداد مشحون ساختند - و دران بلاد و امصار رسوم کفر و شرک اشتهار یافته و شعار اسلام رو باستتار آورده - نا گزیر سینهٔ بے کینه بمعسا ینه این حال پراز رنج و ملال بود و بشوق هجرت مالا مال - غیرت ایمانی بدل در جوش بود و اقامت جهاد بسر در خروش -

অর্থাৎ:—ভাগ্যক্রমে এই দেশের শাসন ও রাজত্বের অবস্থা কিছুদিন হইতে এইরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে যে, খৃষ্টান ও হিন্দুগণ হিন্দুস্থানের অধিকাংশ অঞ্চলের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে এবং ঐ অঞ্চলগুলিকে অত্যাচারে অবিচারে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ঐসব অঞ্চলে শেক ও কোফ্রের রীতিনীতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং এছলামের অনুষ্ঠানগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া আমার অন্তর দুঃখে ও বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়ে, হেজরতের আগ্রহে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে—ঈমানের অভিমান (emulation) আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তোলে এবং জেহাদ প্রবর্তনের আগ্রহে আমার মস্তক আলোড়িত হইতে থাকে।[১]

বাংলার অধিবাসীদিগকে এক শ্রেণীর লেখক "ভীরু বাঙ্গালী" বলিয়া উল্লেখ করিয়া

১) ছৈয়দ আবুল হাসান আলী কৃত سیرت سید احمد شہید দ্রষ্টব্য।

থাকেন। ছৈয়দ আহমদ শহীদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মুক্তি সংগ্রাম এই বাংলা দেশে কিরূপ ব্যাপক ও প্রচণ্ড আকারে প্রকট হইয়াছিল, পক্ষপাতদুষ্ট হইলেও স্যার উইলিয়ম হাণ্টার কর্ত্তৃক বিরচিত "The Indian Musalman" পুস্তকে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। হাণ্টার এই পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন—

"The whole Country (Bengal) has been overrun by such men. The have excited the peasants and the Ambeyla Campaign has shown us that they are not to be despised, and that the timit Bengali under certain conditions, fight as fiercely as an Afghan."

"মোহাজ্জিদেরা সমগ্র দেশে (বাঙলা দেশে তখন) ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা কৃষক সমাজকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। আম্বেলা অভিযানে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাঁহাদের অবজ্ঞা করা যায় না। এই ভীরু বাঙালীরাই অবস্থা বিশেষে আফগানের ন্যায় প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাইতে সক্ষম।"

এই যে হাজার হাজার মুছলমান নিজেদের যথাসর্ব্বস্বকে বিসর্জ্জন দিয়া ভারতের দুর্লঙ্ঘ পর্ব্বত প্রান্তরগুলিকে পদব্রজে অতিক্রম করিয়া সীমান্ত দেশে উপস্থিত হইয়াছিল, পাঠানদিগের সহিত যোগ দিয়া সমান বীরত্বের সহিত যুদ্ধ চালাইয়াছিল এবং বাংলা হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা সাহায্য পাঠাইয়া সীমান্তের সংগ্রাম-কেন্দ্রকে দীর্ঘ এক শত বৎসর ধরিয়া জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছিল, ইহার মূল প্রেরণা আসিয়াছিল সেই একই ভাব-কেন্দ্র হইতে—মোজাদ্দেদ ছরহন্দী, শাহ অলিউল্লাহ ও ছৈয়দ আহমদ শহীদ যাহা হইতে তেজ ও শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এক কথায় তাহা ছিল অমোছলেম এছতে'লা বা আধিপত্যের অবশ্যম্ভাবী কুফলগুলির বিরুদ্ধে মোছলেম জাতির "গাইরাতে ঈমানীর" স্বাভাবিক বিদ্রোহ। পাকিস্তান আন্দোলন মোছলেম-ভারতের দিকে দিকে একদিন যে চিন্তা চাঞ্চল্য ও ভাব-বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল, তাহার প্রথম কথাও ছিল ইহাই।

ছৈয়দ আহমদ শহীদের প্রবর্ত্তিত সাধনা কোনদিক দিয়া কি পরিমাণে সার্থক বা বিফল হইয়াছে, এসম্বন্ধে কোন কোন অঞ্চলে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের মতে ছৈয়দ সাহেব যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইতে পারে নাই প্রধানতঃ দুইটি কারণে। ইহার মধ্যে প্রথম কারণ হইতেছে, সীমান্ত প্রদেশের কতিপয় পাঠান গোত্রের মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা এবং দ্বিতীয় কারণ হইতেছে ছৈয়দ ছাহেবের স্থলাভিষিক্ত কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত এমাম গায়েবের অসত্য আকীদা। ইহার পরিবর্ত্তে এছলামের ইতিহাস হইতে এই প্রেরণা তাঁহাদের গ্রহণ করা উচিত ছিল যে, মুছলমানের লক্ষ্য নেতার প্রতিষ্ঠিত আদর্শ, তাঁহার পার্থিব দেহ কখনই নহে। হজরতের এন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে মদীনায় যখন এই শ্রেণীর একটা বিভ্রাটের সূচনা হইয়া চলিয়াছিল, হজরত আবু বকর ছিদ্দিক তখন ছাহাবাগণের সম্মেলনে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি পূজা করিত

২০

মোহাম্মদের সে জ্ঞাত হউক যে, মোহাম্মদ নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি পূজা করিত আল্লার তার জানা উচিত যে, আল্লাহ জীবিত, তিনি অমর। আল্লাহ বলিয়াছেন—

وما محمد الا رسول - قد خلت من قبله الرسل - فئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم - ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا - وسيجزى الله الشكرين -

অর্থাৎ—"মোহাম্মদ একজন প্রেরিত বই আর কিছুই নহেন, তাঁহার পূর্ব্বেও বহু রাছুল গুজরিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি মরিয়া যান অথবা নিহত হন, তাহা হইলে কি তোমরা (আল্লার পথ হইতে) ফিরিয়া দাঁড়াইবে? হাঁ, যাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইবে, তাহারা আল্লার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না,—এবং শীঘ্র আল্লাহ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে পুরস্কার দান করিবেন।"

ওহোদের ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় "হজরত নিহত হইয়াছেন" শুনিয়া একদল ছাহাবা যখন হতাশ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের এক প্রান্তে গিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন সে সময়ও ছাহবাগণের অনেকের কণ্ঠে এই আয়তের প্রতিধ্বনিই জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। অবসন্ন ছাহাবাগণকে আহ্বান করিয়া আনছ-এবন-নাজর সেই চরম বিপদের সময় বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

موتوا على ما مات عليه رسول الله

"যে কর্ত্তব্য পালনের জন্য আল্লার রাছুল আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, সেই কর্ত্তব্যের জন্য তোমরাও আপনাদিগকে কোরবান করিয়া দাও।"

নবী মরেন, নেতা মরেন, কিন্তু আল্লার বাণীকে জয়যুক্ত করার যে কর্ত্তব্য তাঁহাদ্বারা আনীত হয়, তাহা মরে না—ইহাই হইল মুছলমানের আদর্শ। বলা বাহুল্য, পরবর্ত্তী নেতাদিগের এই শ্রেণীর ত্রুটি বিচ্যুতিগুলির জন্য ছৈয়দ ছাহেবকে কোন মতে দোষী করা যায় না।

২৩শ অধ্যায়

মুছলিম বাংলায় অনৈছলামিক ভাবধারা অনুপ্রবেশের প্রকৃত কারণ

গত ২০শ অধ্যায়ে যে উদাহরণগুলি প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া অনেকের মনেই ধারণা জন্মিতে পারে যে, সেগুলি হয়ত পুথি লেখকগণের মৌলিক রচনা। কিন্তু বস্তুতঃ প্রকৃত অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, ঐ বিষাক্ত ও ইছলাম-বিরোধী ভাবধারা বাংলার মুছলমান সমাজে প্রবেশ করিয়াছে প্রধানতঃ ফার্সী সাহিত্যের মাধ্যমে। তাহার দীর্ঘকাল পরে ঐ শ্রেণীর বিকৃত মতবাদগুলি উর্দ্দু সাহিত্যে বিপুল পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যে সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, তখন ফার্সী ভাষাই ছিল বাঙ্গালী মুছলমানের দরবারী বা সরকারী ভাষা। পক্ষান্তরে তখন বাংলার মুছলমান সমাজ ঐ ভাষাকে নিজেদের সামাজিক ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মধ্যবিত্ত ও উচ্চস্তরের মুছলমান সমাজ উহাকে নিজেদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহনরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এই ফার্সী ভাষা কি রূপে বাঙ্গালী মুছলমানের মন ও মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার কএকটা উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে:—

(১) মোহাম্মদ আল্লার রছুল ও তাঁহার একজন বান্দা, তিনি একজন "বাশর" বা মানুষ ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না, একথা কোরান মজীদের বিভিন্ন আয়তে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মানুষ ব্যতীত ফেরেশতা প্রভৃতি অন্য কাহাকেও মাটির মানুষের নিকট রাছুল করিয়া পাঠান হইলে, তাহার রেছালতের মূল উদ্দেশ্যটাই যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইত, কোরেশদিগের উত্তরে তাহাও কোরআন মজীদে উত্তম রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সে কালের ফার্সী কবিগণ তাঁহাকে "আল্লার আসনে', বসাইয়া দেওয়ার জন্য নিজেদের কবি প্রতিভার চরম অপচয় করিতে চেষ্টার একটুও ত্রুটি করেন নাই।

(ক) তাঁহারা ভক্তি-গদগদকণ্ঠে বলিতেছেন—

محمد بشکل عرب آمده ـ عین را حزف کن که رب آمده

"মোহাম্মদ আসিয়াছেন আরবের আকার ধারণ করিয়া, "আরব" শব্দের আয়নকে হজফ করিয়া দাও, তাহা হইলে দেখিবে যে, বস্তুতঃ রব আসিয়াছেন।

(খ) হজরত ইউছুফও আল্লার একজন নবী—সুতরাং মানুষ। মোল্লা জামী তাঁহার ইউছুফ-জোলেখা পুস্তকে তাঁহার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন:—

چوں آں بے چوں دو بں چوں کر د٠آرام ـ بی رر بوش کرده یوسفش نام

যখন সেই অরূপ স্বরূপ এই রূপ জগতে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন, তখন নিজের মুখ ঢাকার জন্য তাঁহার নাম করণ করিলেন ইউছুফ বলিয়া।

(গ) রাছুলে করিমের এক নাম আহ্‌মদ ইহা কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বড় একদল কবি, তাঁহাকে আহাদ্‌ রূপে প্রতিপন্ন করার জন্য অজস্র কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। মীলাদের কেতাবগুলি এই শ্রেণীর মোশরেকী উপকথায় পূর্ণ হইয়া আছে। অথচ আহাদ্‌ (একক) একমাত্র আল্লারই বিশেষণ—(قل هو الله احد) বল আল্লাহ হইতেছেন আহাদ বা একক। কিন্তু আহ্‌মদকে আহাদে পরিণত করিয়া লওয়াই আজ এশ্‌কে রাছুলের প্রধান উপকরণ রূপে ব্যক্ত করা হইতেছে।

উর্দ্দু কবিরা এ সম্বন্ধে একদম কাজের খতম করিয়া ছাড়িয়াছেন। যেমন:—

تها جو مستوی عرش خدا ہو کر - اتر پڑا مد ینه میں مصطفی ہو کر

কোরআনে বলা হইয়াছে:—

الرحمان على العرش استوی

রহমান বা আল্লাহতাআলাই আরশের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। কিন্তু আমাদের কবি বলিতেছেন, "আরশের উপর খোদা রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন যিনি, তিনিই মাদীনায় নামিয়া আসিলেন "মোস্তাফা" হইয়া!

আরও স্পষ্ট ভাষায় শুনুন:—

نہیں ڈر شریعت کا میں صاف کہدوں - خدا خود رسول خدا بن کے آیا

"শরিয়তের ভয় নাই, আমি ছাফ করিয়া বলিতেছি, খোদা স্বয়ং রাছুলে খোদা বনিয়া আসিয়াছেন।

محمد کو مولا جو پیدا نه کرتا - قسم ہے خدا کی خدائی نهو تی

আল্লাহ যদি মোহাম্মদকে পয়দা না করিতেন, খোদার কছম—তাহা হইলে খোদার খোদাই হইতে পারিত না।"

(ঘ) শেখ ফরীদুদ্দিন আত্তার বলিতেছেন,

ما مقیمان کوئے دلداریم - رخ بدنیا و دین نمی آریم

"মাশুকের গলিতে অবস্থান করি আমরা—দুনয়ার প্রতি বা দিন-ধর্ম্মের প্রতি দৃকপাতও আমরা করি না।

(ঙ) মাওলানা রুমী বলিতেছেন:—

من ز قر آن مغز را بر داشتم - استخوان پیش سگان انداختم

"আমি কোরান হইতে তাহার মগজটা উঠাইয়া নিলাম, আর হাড়গোড় ফেলিয়া দিলাম কুকুরগুলির সম্মুখে।"

অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অনেক বিখ্যাত কবি বলিতেছেন:—

خود کو زه و خود کو زه گر و خود گل کو زه
خود رند سبو کش
خود برسر آں کو زه خر یدار بر آمد
بشکست و رواں شد

নিজে কুজা (ঘটি) নিজে কুমার, নিজে কুজার মাটি, নিজেই মত্ত মদ্যপায়ী, নিজেই আবার সেই কুজার কাছে খরিদ্দার হইয়া আসিল—ভাঙ্গিয়া ফেলিল আর চলিয়া গেল।

অন্য একজন কবি বলিয়াছেন,

مدرسه تها یا دیر تها کعبه تها یا بتخانه تها
هم سبهی مہمان تهے ایک تو هی صاحب خانه تها

কবি হাফিজ শিরাজী বলিয়াছেন,

حافظا! گر وصل خواهی صلح کن با خاص و عام
با مسلماں الله الله با برهمن رام رام

হাফেজ! যদি মিলন চাও, তাহা হইলে খাছ আম সবলের সহিত সন্ধি করিয়া চল:—মুছলমানের সহিত আল্লাহ আল্লাহ বল এবং ব্রাহ্মণের সহিত রাম রাম।

আকবরী দরবারের শেখ ফায়জীর নাম মোগল-ভারতের ইতিহাসে উজ্জল হইয়া আছে নানা কারণে। তাঁহার অগাধ বিদ্যা, বহুমুখী প্রতিভা এবং বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন বিষয়ে রচিত শতাধিক জ্ঞানগর্ভ বহি পুস্তকই ছিল তাঁহার খ্যাতির প্রধান উপকরণ। আরবী ভাষার হরফ বা বর্ণমালার মোট সংখ্যা হইতেছে ২৯ টা। ইহার মধ্যে বিন্দু বা নোক্তাযুক্ত হরফ হইতেছে ১৪টা। ফায়জী তাঁহার বিখ্যাত তাফছীর (سوا طع الالهام) "ছাওয়াতিউল এল্‌হাম" আরবী ভাষায় রচনা করেন নোক্তা ওয়ালা হরফ ১৪টাকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়া। অথচ ঐ বিরাট তাফছীরের ভাষায় কোথাও এক বিন্দুমাত্র জড়তা নাই, ব্যাকরণের একটি মাত্রও ব্যতিক্রম নাই। কবি হিসাবে, ঐতিহাসিক হিসাবে, দার্শনিক হিসাবে তিনি বহু মূল্যবান পুথিপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য প্রসঙ্গের দিক দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র পাঠ ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি প্রথম জীবন হইতে যথাসম্ভব সাধনা করিয়া আসেন। "এই সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য তিনি ছদ্মবেশে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন।" হিন্দু সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা ছাড়াও তিনি সংস্কৃত কাব্য ও দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সর্বপ্রথমে তিনি লীলাবতীর ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিয়া সুধি সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক তিনি ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে,

কাযজীর উপরোক্ত তাফছীর ও অনুবাদ সম্বন্ধে তখনকার মুছলমান সমাজে নানাবিধ মানিকর গল্প গুজব প্রচলিত ছিল। তাহার এই প্রচেষ্টায় যে আকবর বাদশার মতামতের সমর্থন করার কোনো একটা অভিসন্ধি লুকাইয়া থাকিতে পারে, সেরূপ সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান ছিল।

যুবরাজ দারা শেকোহ

দারা শেকোহ ভারত সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনিও কাযজীর ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষতঃ উচ্চ পর্য্যায়ের হিন্দু শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। হিন্দু ও মোছলেম ধর্মকে একই ধর্মে পরিণত করার উদ্দেশ্যে তিনি مجمع البحرين (দুই সাগরের সঙ্গম) নামে একখানা পুস্তক রচনা করেন। ঘটনাক্রমে জনৈক "ফকীর মাওলানার" সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়া যায়। ঐ মাওলানা ছাহেবের নিকট উপনিষদের মহিমা শ্রবণ করিয়া কাশী হইতে কয়েকজন সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধু সন্ন্যাসীকে আমদানী করেন এবং তাহাদের নিকট হইতে উপনিষদ শিক্ষা করেন। দীর্ঘ ছয় মাসের অবিরত পরিশ্রম দ্বারা ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে সমস্ত টীকা টিপ্পনিসহ উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তখনকার দরবারী পরিবেশের উপযোগী করিয়া তিনি ঐ পুস্তকের ভূমিকায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের মহাতথ্যও পরিবেশন করিয়াছেন। এমন কি এই মতের সমর্থনে কোরআনের উল্লেখ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। ফারসী পণ্ডিত মুসোআকতাই দুর্পেয়ো এই পুস্তকের ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।" এইরূপে মোগলকুল তিলক মহাত্মা দারাশেকোহের মাহাত্ম্য ও উপনিষদের মহিমা বিভিন্ন অনুবাদ ও দর-অনুবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে প্রচারিত হইয়া যায়।

এইসব মহাত্মা ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপস্থিত আমাদের বলিবার বিশেষ কিছু নাই। এখানে আমরা শুধু দেখাইতে চাহিয়াছি যে, দিল্লীর তৎকালীন বাদশাহ ও ছুলতান-দিগের কল্যাণে বিজাতীয় ধর্মভাব ও অনৈছলামিক শিক্ষা ও সংস্কার পারসী ভাষার মাধ্যমে মোছলেম বঙ্গের জনসাধারণের মন ও মস্তিষ্কের উপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল।

আর একটি উদাহরণ :—

কাজী রুকনুদ্দীন ছমারকান্দি, ছোলতান আলী মর্দ্দানের শাসনকালে বাংলা দেশের **ত্রিপুরায় (?)** কাজীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গদেশ মুছলমানদিগের দ্বারা বিজিত হওয়ার পর তাঁহাদের বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞান সাধনার বিষয় দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইয়া যায়। এমন কি, ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত কামরূপ অঞ্চলেও এ সম্বন্ধে খুব চর্চ্চা হইতে থাকে।

এই ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ উদ্ধৃত হইতেছে :—

মুছলমানেরা দেশ জয় করার পর হইতে, তাঁহাদের বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞান-সাধনা সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশংসা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। এই সময়, ছোলতান আলী মর্দ্দান শাহের আমলদারীকালে, কামরূপ নিবাসী জনৈক "ভোজক ব্রাহ্মণ" মুছলমান পণ্ডিতদিগের সহিত مناظره বা বিচার বিতর্ক করার উদ্দেশ্যে সেখানে আগমন করেন। জুমার দিন এই উদ্দেশে তিনি সেখানকার জামে মসজিদে উপস্থিত হন। অতঃপর তিনি স্থানীয় লোকদিগের নিকট হইতে, শ্রেষ্ঠ আলেম হিসাবে কাজী রুকুনুদ্দীন ছামারকান্দী ছাহেবের নাম শুনিয়া তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের প্রধান এমাম কে?" কাজী উত্তরে বলিলেন—"আল্লার রাছুল হজরত মোহাম্মদ।" এই নাম শুনিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই মোহাম্মদ যিনি "রূহ্ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—রূহ হইতেছে আল্লার একটা আদেশ?" কাজী ছাহেব বলিলেন, হাঁ তিনিই। পণ্ডিত তখন বলিতে লাগিলেন, "ঠিক কথা, সত্য কথা। আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রগুলিতেও ঠিক এইরূপে আত্মার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।"—এইরূপ কথোপকথনের পর তিনি সানন্দে এছলাম গ্রহণ করেন এবং তারপর তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত ইছলামী ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যে ইহাতে এতদূর বুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, স্থানীয় আলেম ছাহেবরা তাঁহাকে ফৎওয়া দেওয়ার অনুমতি পর্য্যন্ত দান করেন। তখন ব্রাহ্মণ কাজী ছাহেবকে উপঢৌকন বা তোহফা হিসাবে একখানা যোগ-সাধনা পুস্তক প্রদান করেন।

এই পুস্তকের নাম ছিল অমৃতকুণ্ড, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই পুস্তকখানি ভারতবর্ষের পণ্ডিত ও দার্শনিকদিগের নিকট হইতে বিশেষ প্রশংসা ও সমর্থন লাভ করিয়াছিল। কাজী সাহেব আরবী ও ফার্সীর স্থায় সংস্কৃত ভাষারও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি পুস্তকখানা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং প্রথমে ফার্সীতে এবং পরে আরবীতে তাহার অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন। বলা অবশ্যক, অনুবাদ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বরং নিজে ঐ পুস্তকের শিক্ষা অনুসারে যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হন, ফলে তিনি এই সাধনায় এরূপ সাফল্য লাভ করেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি যোগীদের মর্য্যাদায় উপনীত হইয়া যান। পাঠক সাধারণকে এই পুস্তকের মর্ম্মবাণী সম্বন্ধে কিছুটা পরিচিত করার জন্য, তাহার বাব বা অধ্যায় সূচীটা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

১ম অধ্যায়—বৃহৎ জগতের তত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান
২য় "—ক্ষুদ্র জগত-তত্ত্বের রহস্য সম্পর্কীত জ্ঞান
৩য় "—মন ও তাহার অর্থ সম্পর্কীত জ্ঞান
৪র্থ "—সাধনা ও সাধন পদ্ধতি সম্পর্কীয় জ্ঞান
৫ম "—শ্বাস ক্রিয়া ও তাহার পদ্ধতি সম্পর্কীয় জ্ঞান
৬ষ্ঠ "—বীর্য স্তম্ভন সম্পর্কীয় জ্ঞান
৭ম "—ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কীয় জ্ঞান

৮ম অধ্যায়—মৃত্যুর লক্ষণ সম্পর্কিত জ্ঞান
৯ম ”—আত্মিক শক্তি সমূহকে বশীভূত করণ সম্পর্কীয় জ্ঞান
১০ম ”—আদি অন্ত অথবা আরম্ভ ও সমাপ্তি সম্পর্কীয় জ্ঞান

অনৈছলামিক ভাবধারা কিরূপে পার্সীভাষার মাধ্যমে মোছলেম বঙ্গের উপরিস্তরের বিশিষ্ট বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের শিক্ষা ও সাধনার মধ্যবর্ত্তিতায় বাংলার মধ্যস্তরের মুছলমানের মন ও মস্তিষ্ককে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা পণ্ডিত প্রবর কয়জীর, যুবরাজ দারা শেকোহের এবং মাওলানা কাজী রুকনুদ্দীন ছাহেবের কার্যকলাপের বিবরণে কিছুটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কাজী সাহেব হিন্দুর যোগশাস্ত্র সাগ্রহে পাঠ করিতেছেন, যত্ন সহকারে তাহার ফার্সী ও আরবী অনুবাদ করিতেছেন, এবং শুধু অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছেন না—নিজেও তাহার নির্দেশ অনুসারে সাধনা করিয়া, একজন পাকাপোক্ত যোগীতে পরিণত হইয়া যাইতেছেন। বলাবাহুল্য, কোনক্রমে সেই ভাবধারা বাংলার স্বল্পশিক্ষিত সাহিত্যিকদিগের মধ্যেও সম্প্রসারিত হইয়া যায়। ইহাই ছিল সে কালের মুছলমান সমাজের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান অভিশাপ। ✓

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে বাংলায় সমাগত ছুফী ছাহেবদিগের কর্ম্মতৎপরতা সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলার দরকার মনে করিতেছি। আমাদের দেশে যে বহু শ্রদ্ধাভাজন ছুফীর সমাগম হইয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য এবং তাহার ফলেই এখানকার বহু সংখ্যক অমুছলমান যে ইছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত এতদ্দেশীয় ঐতিহাসিকের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু সে সময় এছলাম গ্রহণ করিয়াছিল কাহারা? এ প্রশ্নের সদুত্তর কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। আমরা যতটা সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে মনে হইতেছে, তখন মুছলমান হইয়াছিল, বর্ণবিচারে উৎপীড়িত ও ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে জর্জ্জরিত বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের জনসাধারণ। কিন্তু ইহা খুবই সত্য যে, মোছলেম সমাজে প্রবেশ করার সময়, নিজেদের যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত সংস্কারগুলিকেও তাহারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু আমাদের ভক্তিভাজন ছুফীগণের মধ্যে কেহই যে তাহাদিগকে সেই সব কুসংস্কার হইতে মুক্ত করার বিশেষ কোনো চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ইহারই ফলে তাহাদের সেই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসগুলি ক্রমে ক্রমে মুছলমানদিগের মধ্যে সংক্রমিত হইয়া আসিয়াছে।

ছুফীগণের কর্ম্মতৎপরতার বিস্তারিত সমালোচনা করা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর হইবে না। জীবনে কুলাইলে ও সুযোগ সুবিধার অভাব না ঘটিলে ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। সে যাহাই হউক, উপস্থিতের মত কতকগুলি অতি আবশ্যকীয় তথ্য আজ পাঠকগণের খেদমতে পেশ করিয়া রাখিতেছি:—(ক) সমাগত ছুফীগণের সকলকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে না। তাঁহাদের মধ্যে প্রথমাগতদিগের অনেকেই ছিলেন ইছলামী শরীয়তের পাকা পাবন্দ। শেষের বেদান্ত হইতে

দূরে থাকার চেষ্টাই তাঁহারা আজীবন করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা ছিলেন সাধু প্রকৃতির লোক। খুব সম্ভব, ইহাদের সাহচর্য্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন যাঁহারা, ইছলামী শিক্ষায় প্রেরণা তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অব্যবহিত পরে যাঁহারা আসিলেন, সে সৌভাগ্য তাঁহারা লাভ করিতে পারেন নাই। আল্লার কোরআন ও রাছুলের হাদীছের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ সংশ্রব ছিল খুবই কম। ইহাদের সময়ে মোছলেম সমাজে প্রতিবেশী হিন্দুদের যোগ ও তান্ত্রিক সাধনার, তাহাদের সিদ্ধান্ত বেদান্তের, তাহাদের অদ্বৈতবাদ ও অবতারবাদের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ইহাদের পরে মোছলেম সমাজে ফকীর দরবেশ নামে যে "ছুফী"দিগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহাদের অপকীর্ত্তির পরিচয় সম্পর্কে আমরা পূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

(খ) ছুফী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল হজরত রাছুলে করিমের অনেক পরে। যে মোহ্‌উদ্দীন এবন্ আরাবীকে ছুফী মতাবলম্বীরা প্রধানতম গুরু বা শায়খে আকবর বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, এবং যাঁহাকে অহ্‌দাতুল্ অজুদ বা অদ্বৈতবাদ আকীদার প্রথম দ্রষ্টা বলিয়া তাঁহারা (ও অন্যেরা) মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ৬৩৮ হিজরীতে বা (Nicholson-এর মতে) ১২৪০ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং মুছলমানদিগের ধর্ম্ম সাহিত্যে তাঁহার নামগন্ধেরও সন্ধান পাওয়া যায় না।

(গ) ছুফী মতবাদের বিচার আলোচনা সম্বন্ধে মুছলমান লেখকগণের রচিত যে সব বহিপুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক, আমাদের দেশে সেগুলি এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়া আছে। অধিকন্তু তাহা আরবী ভাষায় লিখিত, সুতরাং অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থীদিগকে নির্ভর করিতে হয় ব্রাউন ও নিকলসনের এবং অন্যান্য খৃষ্টান লেখকদিগের রচনাবলীর উপর। ইহা যে কিরূপ বিপদজনক ব্যাপার, ভুক্তভোগী পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

আল্লাতাআলার হাজার হাজার শোকর, ছুফী মতবাদের যথাযথভাবে সমালোচনা করিয়াছেন মোছলেম সমাজের সর্ব্বজনমান্য জনকএক সুধীব্যক্তি। তাঁহাদের কএকখানা মূল্যবান কেতাব আমার কাছে মউজুদ আছে। তাহার মধ্যকার দুইটি কেতাবের নাম উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

(১) نقد العلم والعلماء او تلبيس ابليس —(ইবলীছের প্রবোচনা)

تصنيف شيخ عبدالرحمن ابن جوزى

(২) الفرقان بين اولياء الرحمان و اولياء الشيطان

تصنيف شيخ الاسلام ابن تيمية الحرانى

রাহমানের অলী ও শয়তানের অলীদিগের মধ্যে পার্থক্যকারী কেতাব।

এমাম ইবনে তাইমিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। এখানে এমাম এবনে জওযীর অতি সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

আল্লামা ইবনে জাওযীর পরিচয়

আবুল ফরজ আবদুর রহমান এবন আবুল হাছান আলী এবনে মুহাম্মদ এবনে আলী বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন হুম্মাদা বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন জা'ফর আলজওযী বিন আবদুল্লাহ বিন কাছেম বিন নজর বিন কাছেম বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান এবনুল কাছেম এবন মুহাম্মদ বিন আবু বকর ছিদ্দীক (রাযিঃ) কোরায়শী তয়মী, বাগদাদী ফকীহ হাম্বালী। উপাধি ছিল জামালুদ্দীন আল্ হাফিজ। ৫০৮ অথবা ১০ হিজরীতে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২ই রমজান ৫৯৭ হিজরীতে তথায় ইন্তেকাল করেন। অতঃপর হরব গেটের নিকটবর্ত্তী স্থানে তাঁহার দাফন কার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

এবনে জাওযী তাঁহার যুগের শীর্ষস্থানীয় অভিজ্ঞ আলেম ও মোহাদ্দেছ ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার সুললিত কণ্ঠের ওয়াজের খ্যাতি তখন সর্ব্বদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কোরআনের তফছীরে তাঁহার বিরাট গ্রন্থ জাদুল মছীর ফী ইলমে তফছীর চার খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে তিনি বহু মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। হাদীছ শাস্ত্রেও তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রক্ষিপ্ত (মওজু') হাদিছ সম্পর্কে তিনি চারি খণ্ডে একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং ইহা অতি বিশুদ্ধ বলিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ইবনে জাওযীর লেখনী এতই প্রখর ছিল যে, কথিত আছে তাঁহার ইন্তেকালের পর তাঁহার স্বরচিত মুসাবেদাগুলি একত্রিত করিয়া তাঁহার বয়সের সর্ব্বমোট দিন গুলিতে ভাগ করিয়া দেখা যায় যে, তিনি প্রত্যহ ৯খানা পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি একজন যশস্বী কবিও ছিলেন। অতি উচ্চাঙ্গের বহু কবিতাও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে খল্লেকান তাঁহার কতিপয় কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন। ওয়াজ মজলিসে তিনি বহু প্রশ্নের অতি উত্তম সমাধান দিতেন যাহাতে দলমত নির্ব্বিশেষে সকলেই সন্তুষ্ট হইতেন।

কথিত আছে যে, বাগদাদে শিয়া ছুন্নীদের মধ্যে হজরত আবু বকর এবং হজরত আলীর মধ্যে কে অধিক মর্যাদাশীল ছিলেন—এ বিষয়ে বিরাট মতবিরোধ ও তর্ক চলিতেছিল। অবশেষে সকলের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইল এই যে, এমাম এবনে জাওযী এ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করিবেন তাহাই সকলে মানিয়া লইবে। সেমতে তাঁহার ওয়াজের এক মজলিসে জনৈক জিজ্ঞাসাকারী দণ্ডায়মান হইয়া সেই প্রশ্ন উত্থাপন করিলে তিনি চেয়ারে উপবেশন অবস্থায়ই তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, فقال افضلهما من كانت ابنته تحته যার কন্যা তাঁহার স্ত্রী হইয়াছেন তিনিই আফজাল—শ্রেষ্ঠ। এই বলিয়া এবনে জাওযী আসন ত্যাগ

করিলেন এবং তাঁহার নিকট ইহার ব্যাখ্যা চাওয়া হইল না। অতঃপর ছুন্নীরা ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন, আবু বকরই আফজল ছিলেন কারণ তাঁহার কন্যা বিবি আয়েশা হজরতের বিবি ছিলেন। পক্ষান্তরে, শিয়া সম্প্রদায় বলিলেন, ইহার অর্থ এই যে, আলী আফজল ছিলেন, কারণ হজরতের কন্যা ফতেমা তাঁহার বিবাহে ছিলেন। বাগদাদের 'জাওয' নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ইবনে জাওযী নামে সর্ব্বজন পরিচিত।' *

পাশ্চাত্য লেখক ও ভাষ্যকারদিগের কৃপায় এবং এ-দেশের বএকজন লেখকের আলোচনায়, মোহীউদ্দীন এবনুল আরাবীর নাম ইদানিং বিশেষ মর্য্যাদালাভ করিয়াছে। এ জন্য আমরা তাঁহার সম্বন্ধে অত্যাবশ্যক তথ্য সম্বন্ধে আজ অতিসংক্ষেপে দুইএকটা কথা পাঠকদের খেদমতে পেশ করিয়া রাখিতেছি। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে ফুছুছুল-হেকাম فصوص الحكم ব্যতীত ইব্নুল্ আরাবীর রচিত আরও অনেক বই পুস্তক আছে—যেমন কোরআন মজীদের তফছীর, ফতুহাতে মাক্কীয়া ইত্যাদি। এই শেষোক্ত পুস্তকে তিনি বলিয়াছেন :—

اذا صح الحديث و عارضه قول صاحب و امام' فلا سبيل الى العدل عن الحديث - و يترک قول ذلک الامام .و الصاحب للخبر....

لا يجوز ترک آية او خبر بقول صاحب و امام — و من يفعل ذلک فقد ضل ضلالا و خرج عن دين الله -

মর্মানুবাদ :—যখন (কোনো) বিষয়ে ছহী হাদীছ পাওয়া যাইবে, সে অবস্থায় তাহার বিপরীত কোন এমামের বা কোনো আলেমের মত গ্রহণ করা যাইতে পারিবে না। (এই রূপে) কোনো এমামের বা আলেমের কথা যদি আল্লার কোরআনের কোনো আয়তের অথবা তাঁহার রাছুলের কোনো হাদীছের বিপরীত হয়, তবে সেই এমাম বা আলেমের কথা গ্রহণ করা বৈধ (জাএজ) হইবে না। যে ব্যক্তি কোরআনের আয়ত ও রাছুলের হাদীছকে বর্জ্জন করিয়া চলে, সে গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) হইবে ও দীন এছলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে।"

এই মন্তব্য হইতে জানা যাইতেছে যে, মোহীউদ্দীন এবনুল আরাবীই হউন বা কূতুল-কুলুব রচয়িতা আবু তালেব মক্কীই হউন, অথবা অন্য কোনো ছুফী লেখকই হউন, তাঁহাদের মতামতের সমর্থন বা প্রতিবাদ করার পূর্ব্বে, তাঁহাদের আজীবনের লিখিত পুস্তকগুলির সমগ্রভাবে আলোচনা পর্য্যালোচনা করিয়া লওয়া আবশ্যক। অন্যথায় সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য মর্য্যাদা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইবে না।

---

* (ওফ্য়াতুল আইয়ান (১) ২৭২ পৃঃ।)

২৪শ অধ্যায়

প্রাথমিক ছুফীগণের সাধনা যুগের অবসান ঘটার পর এছলাম ধর্ম্মের, বরং প্রকৃত এছলাম ধর্ম্মের নামকরণে মোছলেম সমাজের দিকে দিকে যে সব মারাত্মক অনাচারের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল, সে যুগের মুছলমানদিগের আচার ব্যবহার, তাহাদের বিশ্বাস ও সংস্কারাদির পরিচয় লইলে তাহা সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারা যায়। বস্তুতঃ ইহারা এছলামের পরিবর্ত্তে আর একটা উদ্ভট ধর্ম্মেরই সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল। ইহা আমাদের কল্পিত কথা নহে, বহু বিজ্ঞ আলেম ও এমাম মুক্ত কণ্ঠে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। একটা উদাহরণ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর অভিমতের আরও দুই একটা নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী একজন বিখ্যাত ছুফী মতাবলম্বী আলেম। তাঁহার লিখিত বিবিধ পুঁথি-পুস্তক দীর্ঘকাল হইতে মুছলমান সমাজে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডের একখানা সাময়িক পত্রিকায়, তাঁহার কোরআন মজীদের ইংরেজী তরজমা ও তফছিরের বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হইয়াছে।

মাওলানা ছাহেবের একটি প্রবন্ধ, মাওলানা ছৈয়দ ছোলায়মান নদভী সম্পাদিত মাআরেফ معارف (মাসিক) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, প্রবন্ধের শিরোনামা تاریخ تصوف کے چند اوراق—"তাছাউফ-ইতিহাসের কএক পাতা"। এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে লেখক প্রাথমিক যুগের ছুফীগণের রচিত কএকখানা কেতাবের আলোচনা করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"প্রাথমিক যুগের ছুফীদিগের রচিত বহিপুস্তকগুলি পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে,

قدما' صوفیہ کا جادۂ سلوک و طریقت شریعت اسلام و سنت نبوی کے قدم بہ قدم تھا اور رفتہ رفتہ جن بدعات کو شعار تصوف سمجھ لیا گیا ہے، ان سے قدیم اکابر طریقت کا دامن بالکل پاک تھا ۔

পূর্ব্ববর্ত্তী ছুফীদের কর্ম্মপদ্ধতি এছলামী শরীয়ত এবং রছুলুল্লার ছুন্নতের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে যে সব বেদআতকে তাছাওউফের নিদর্শন বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে, তরিকতের প্রধান প্রধান আলেমগণের দামন তাহা হইতে সম্পূর্ণ পাক ছিল (মহররম, ১৩৭০ হিজরী)।

নিকলসন প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিদ্যাবিদগণের বহিপুস্তকের উপর নির্ভর করিয়া যাহারা এছলাম ধর্ম ও মোছলেম জাতি সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য এডওয়ার্ড কেম্ব্রিক নামক জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের একটা

মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পুস্তকখানার নাম—একতেফাউল কুনু' বেমা হয়া মাত্বু' (اكتفاء القنوع بما هو مطبوع)—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোরআন, তাফছীর, হাদীছ বিভিন্ন মজহাবের ফেক্‌হ প্রভৃতি যে কোনো দেশে যে কোনও বিষয়ে যে কোনো বহিপুস্তক আরবী ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার ও তাহার লেখকগণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অধিকন্তু কোনো প্রকার গোঁড়ামী বা পক্ষপাতের লেশমাত্রও ইহার কোনা আলোচনায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মুছলমান দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ছুফীগণের দীর্ঘ তালিকা দেওয়ার পর লেখক তাছাওউফ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

و من تسموا فى هذا العصر بالصوفية اكثر هم ليسوا على طريق الصوفية من المتقد مين، بل ليسوا على سنن الدين الاسلامى ١٨١ ص

"বর্ত্তমান যুগে ছুফী নাম দেওয়া হয় যাহাদিগকে, তাহাদের অধিকাংশই পূর্ব্ববর্ত্তী ছুফিদিগের ধারা কারা ও নিয়ম পদ্ধতির অনুসরণ করেনা—বরং এছলাম ধর্ম্মের কোন নিয়ম নীতিরই অনুসরণ তাহারা করে না।—(১৮১ পৃঃ)

উপরে বর্ণিত "ছুফী"দিগের অনাচার ও অপপ্রচারের ফলে তৎকালীন মুছলমান সমাজের ধর্ম্মীয় ও নৈতিক অধঃপতন যে শোচনীয়তার কোন্ নিম্নতম পর্য্যায়ে উপনীত হইয়া গিয়াছিল, বাংলার একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের পুস্তক হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন :—

دران حين بعضى از آوارگان جهان نورد و سياحان صحرا گرد از فقرا و مساكين اسلام مى آمدند و بمقابله مشاهد هندوان و معابد مگهان مزارات و قبور باطله بنام قبر يا آستانهٔ سلطان العارفين بايزيد بسطامى قدس الله سره السامى و حضرت غوث الاولياء شيخ عبد القادر جيلى رحمه الله تعالى كه گاهى اين بزرگان درين دارالكفر نيامده بودند و امثال آن ساخته و پرداخته ذريعهٔ ارزاق و وسيلهٔ اجتماع مردمان از نواحى و آفاق كرده بودند كه بتدريج سبب آمد و شد مسلمانان هم پيدا شد -

অর্থাৎ সেই সময় কতিপয় ভবঘুরে ও পর্যটক ফকীর ও মিছকিন মুছলমান (চাটগামে) আগমন করে এবং হিন্দুদের মন্দির আর মগদের গীর্জার মোকাবেলায় বিখ্যাত ছুলতানুল আরেফীন বাএজিদ বোস্তামী (রহঃ) ও হজরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) প্রমুখের নামে কয়েকটি মিথ্যা কবর ও জিয়ারতকেন্দ্র গড়িয়া তোলে। অথচ এই বোজর্গ ব্যক্তিগণ কখনও ভারতের এই দারুল কুফরে কখনও আগমন করেন নাই। এই সমস্ত কবরের সাহায্যে তাহারা লোকজনকে সমবেত করার আর নিজেদের জীবীকা নির্ব্বাহের একটি ফন্দি করিয়া নিয়াছিল। ইহাই পরবর্ত্তীকালে ধীরে ধীরে মুছলমানদের গমনাগমনের কেন্দ্র হইয়া দাড়াইল। ১

১) মরহুম খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ খান রচিত আহাদীছুল খাওয়ানীন, ১৬-১৭ পৃঃ

উক্ত ঐতিহাসিক সমকালীন খোন্দকার সমাজের আলোচনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন :—

قول کلی درسیرت اکثر خوندکاران حال بانقلاب روزگار نسلا بعد نسل بتدریج جهل و غرور و نادانی بل بدعت و شرک و بی ایمانی در اکثر ایشان راه یافته هیچ یک ازان فضائل در اکثر ایشان نمانده از علامات خوندکاری در ایشان صرف اینقدر باقی است که بار بر سر و دوش خودها نمی کشند و قلبا رانی بدست خود نمی کنند و گوشۀ ازار بر پس پشت نمی زنند و چون از سابق عادت به حرفت و زراعت و تجارت نمی دارند و تاب مشقت نمی آرند و خود را بی کار می گذارند ناچار بر ای حصول لذات و شهوات خود ها متمسک بانواع حیلت و وسیلت میشوند براه مکر و مکیدت میروند اکنون غالب پیشۀ خوندکاران زمانۀ حال مسئلت و مکیدت و قرآن فروشی و سحر و افسون نهایی با طلبه است و بی حیائی و حسد و خصومت و قساوت قلب اکثر در ایشان مروج شده است و قبل ازین که در نواحی تهره و روشن آباد و بهلوه و جکدیه اکثر مردمان جهلای ساده دل بودند و جهل بسیط داشتند عیاران این خوندکاران رفته بیچارگان ساده را بیشتر در بوادی ضلالت و گمراهی و وادی فساد عقیدت و تباهی میکشیدند چنانچه ذبح جانور بغیر خودها جائز می داشتند و می گفتند که این کار جز پیران کسی نتواند کرد و از راه فریب چیزی بر دشنه یا کارد خوانده و بران دمیده بآنها میدادند و آن سادگان جز بدان دشنه یا کارد ذبح روا نمی داشتند و هم چنان بعضی بی حضور خود بگذاردن نماز بجماعت و امامت و خطبه و صلوة عیدین رخصت نمیدادند وفاتحه در بندی از اینوبۀ نی گره دار خوانده درین دمیده سر آن بسته بآن بیخردان میدادند که آن را حین غیبت پیر بر طعام های مرسومه ایام و اعیاد و تقریبات کشاده برآن می گردانیدند و بغیر ان آن اطعمه خوردن جائز نمیداشتند و هم چنین بیهود گی های دیگر می آموخته شد -

অর্থাৎ খোনকার বা খন্দকারদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ খন্দকারের জীবনীতে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অবস্থাও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। মূর্খতা, অহঙ্কার এবং হীনমন্যতার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। তাহাদের অধিকাংশের মধ্যে বিদআত শির্ক এবং বেঈমানীও প্রবেশ লাভ করিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের মধ্যে অন্য কোন সৎগুণই পরিদৃষ্ট হয় না। বর্তমানে খন্দকারদের মোটামুটী পরিচয় শুধু ইহাই অবশিষ্ট রহিয়াছে যে, তাহারা নিজেদের স্কন্ধে ও মস্তকে

কোন বোঝা উঠায় না, নিজেরা ক্ষেত কৃষি করে না। কাছা দেয় না। আর যেহেতু তাহারা নিজেদের পূর্ব অভ্যাস অনুসারে ক্ষেত কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যে অভ্যস্ত নহে এবং মেহনত মুশাক্কাত বা পরিশ্রমে তাহারা অপারগ বলিয়া নিজেদেরকে সর্ব্বতঃ অকেজ করিয়া ফেলে সেইহেতু পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ সম্ভোগ করার জন্য আর নিজেদের প্রবৃত্তির চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অবশেষে তাহারা নানারূপ ছলা, কলা ও কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমান সময়ে খন্দকারদের সাধারণ পেশা হইতেছে ভিক্ষাবৃত্তি ও প্রতারণা করা, কোরআন বিক্রয় (অর্থাৎ তাবীজ দেওয়ার ব্যবসা), জাদুটোনা এবং অযথা কাহিনী রচনা করা প্রভৃতি। সর্ব্বপ্রকার নির্লজ্জতা, হিংসা বিদ্বেষ, ঝগড়াঝাটি ও নিষ্ঠুরতা তাহাদের অধিকাংশের মধ্যে শিকড় গাড়ীয়া বসিয়াছে। ইতিপূর্বে ত্রিপুরা ও রওশন আবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার অশিক্ষিত সাধারণ নাগরিক অতি সরল প্রকৃতির ছিল, নিরেট মূর্খতার মধ্যেও তাহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া যাইতেছিল কিন্তু এই খন্দকার গোষ্ঠি সেখানে গমন করিয়া সেই সাধারণ সরল লোকদিগকে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করে ; তাহাদের পূর্ব বিশ্বাসকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তাহারা খন্দকার ছাড়া অন্য কাহারও হাতে কোন জীব-জানোয়ার জবাই করা নাজায়েজ বলিয়া ফতওয়া দেয় এই কারণে যে, জবাই কাজের ন্যায় মহৎ কাজ পীর ব্যতীত অপর কেহই করিতে পারে না। জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহারা খঞ্জর অথবা ছুরিতে ফুক দিয়া সেই অস্ত্র তাহাদিগকে প্রদান করিত এবং এই সব সরল লোকে সেই খঞ্জর আর ছুরি ছাড়া অন্য অস্ত্রে জবাই করা জায়েজ মনে করিত না। কোন কোন খন্দকার তাহাদের অনুপস্থিতিতে নামাজের জমাত, ইমামত, খোৎবা দেওয়া এবং ঈদের নামাজ পড়া পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তাহারা জাহেল মুরীদদের জন্য বাঁশের চোঙ্গায় ফুক দিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া মূর্খ মুরীদদিগের হাতে দিয়া নির্দেশ দিত যে, পীরের অনুপস্থিত কালে (ঠেকা বশতঃ) বিভিন্ন আবশ্যকীয় নির্দিষ্ট দিবসের ফাতেহা প্রভৃতির আহারাদিতে উক্ত চোঙ্গার মুখ খুলিয়া দিয়া খাদ্যদ্রব্যের উপর ঘুরাইতে হইবে, অন্যথায় সেই খানা খাওয়া জায়েজ হইবে না। অনুরূপভাবে তাহারা বহুপ্রকার বেদা ও অযথা রছম মুর্খ জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়াছিল। (১) —ঐ, আহাদীছুল খওয়ানীন, ২০৬ পৃঃ)

১। মরহুম খান বাহাদুর ছাহেবের উপরোক্ত ইতিহাসখানা মুদ্রিত হইয়াছিল ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং আজ হইতে ৯৩ বৎসর পূর্ব্বে। স্থানীয় মুছলমান সমাজ দীর্ঘকাল এইরূপ অনৈছলামী আচার ব্যবহার এবং কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে পরিবেষ্টিত থাকার পর একজন স্বনামখ্যাত আলেম এবং আর একজন ধর্ম্মপ্রাণ ছুফী ছাহেবের সাধনার ফলে তাহারা এই অন্ধকার হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়া আবার সত্যধর্ম ছলামের সন্ধান লাভে সমর্থ হইয়াছিল। খান বাহাদুর ছাহেবের পরবর্ত্তী বিবরণে এই দুইজনকে আমরা যথাক্রমে হাজী, গাজী, আলেম, ফাজেল ও মোজাহেদ মওলানা এমামুদ্দীনরূপে, এবং امیر زرد গাজী, হাজী, পীর ও মোর্শেদ ছুফী নূর মোহাম্মাদরূপে

এছলাম ও প্রচলিত বিদআত

এছলাম একটা পূর্ণ ধর্ম—এ কথা আল্লাহতাআলা স্বয়ং আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা নবীরূপে বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন দুনিয়ায় এই এছলামকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ তেইশ বৎসর ধরিয়া নবুয়তের এই কর্ত্তব্য যথাযথভাবে পালন করার পর, যখন তাঁহার "পরম বন্ধু ও চরম বন্ধুর নিকট হইতে আহ্বান আসিয়াছিল, সেই সময়, হজ্জ বিদায়ের সম্মেলনে আরাফাতের ময়দানে ছুরা মায়দার এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল :—

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الا سلام دينا -

(হে মোছলেম সমাজ!) আজিকার এই দিনে তোমাদের মঙ্গলের জন্য দীনকে পূর্ণ পরিণত করিয়া দিলাম, এবং তোমাদের কল্যাণের জন্য আমার নে'মৎকে সুসমাপ্ত করিয়া দিলাম, আর এছলামকে নির্ব্বাচিত করিয়া দিলাম তোমাদের জন্য দীনরূপে। (মায়দা ৩)

এখানে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে বুঝিয়া দেখিতে হইবে যে, যে বস্তু পরিপূর্ণ হইয়া আছে, বাহিরের কোন বস্তুর সামান্য মাত্র স্থান, তাহাতে কস্মিনকালেও হইতে পারে না, পারিলে সে বস্তুকে পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। অথচ কালামে মজীদের প্রেরক এবং স্বয়ং আল্লাহতাআলা নিজের হবিবের মারফৎ প্রেরিত দীনে এছলামকে পূর্ণ পরিণত ও সুসমাপ্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিতেছেন। অতএব প্রত্যেক মুছলমানকে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করিতে হইবে যে, আল্লার কালামের ও তাঁহার রাছুলের (প্রামাণ্য) হাদীছে বর্ণিত আদেশ নির্দ্দেশ বা কোনো আমল বা আকীদা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয় এছলামের অঙ্গীভূত হইতে পারে না। এই শ্রেণীর বিষয়বস্তুগুলি হইবে মালউন বেদআৎ এবং স্থান বিশেষে প্রত্যক্ষ শেরক ও কোফর। ইহার ব্যতিক্রম কোনো অবস্থায় সম্ভব হইতে পারে না।

পরবর্ত্তী প্রশ্নগুলির বিচার করিতে হইবে, এই ভূমিকার আলোকে।

এখন উদাহরণ হিসাবে জিজ্ঞাস্য এই যে, পিতামাতার মৃত্যু হইলে, তাঁহাদের

দেখিতে পাইতেছি। (আল্লার রহমত সহস্রধারে বর্ষিত হউক ইঁহাদের আত্মার প্রতি!) এই সাধকগণের সাধনা ও জীবন সংগ্রামের পূর্ণবিবরণ প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। উপস্থিতের মত আমরা এইটুকু বুঝিয়া স্বস্তিলাভ করিতেছি যে, তাঁহারা শুধু কেতাব খানার মাওলানা বা হুজরার ছুফী ছিলেন না,—তাঁহারা ছিলেন ময়দানের মর্দ্দে মোমেন ও মোজাহেদ।

রূহের বা আত্মার কল্যাণের জন্য বিভিন্ন অবধারিত তারিখে খানা, মেহমানী বা তাআমদারীর যে প্রথা মুছলিম সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে, আল্লার কেতাবে অথবা তাঁহার রাছূলের কোনো প্রামাণ্য হাদীছে ঐরূপ তাআমদারী করার কোনও প্রমাণ মওজুদ আছে কিনা? যদি না থাকে, এবং তাআমদারীর কাজগুলি যদি বস্তুতঃ মৃত ব্যক্তির রূহের জন্য ছওয়াব হাছেলের উপলক্ষ্য বলিয়া আল্লার হুজুরে গ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, এছলাম দীন পূর্ণ নহে। কারণ তাহাতে মোর্দাদের খানার ন্যায় এতবড় একটা পুণ্য কার্য্য (!) সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা করা হয় নাই!

পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, কোরআন ও হাদীছের সহিত এ সব ব্যাপারের বিন্দুমাত্রও সংস্রব নাই। এবং নাই বলিয়া সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে ভারতের মহামান্য আলেমগণের সকলেই এই প্রথাকে "নিকৃষ্টতম" শ্রেণীর বেদ্‌আত বলিয়া প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। এমন কি, কেহ কেহ ইহাকে পৌত্তলিক হিন্দুদিগের আচরিত কদাচারের অন্ধ অনুকরণ বলিয়া উল্লেখ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই দাবীর বিচার পরে করা যাইতে পারিবে। উপস্থিত এমামুল হিন্দ মরহুম শাহ অলিউল্লাহ ছাহেবের অছীয়তনামা হইতে তাঁহার একটা মন্তব্য সর্ব্বপ্রথমে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। শাহ ছাহেব বলিতেছেন :—

از بدعات شنیعه ما مردمان اسراف است در ماتم ها و سوم و چهلم و ششماهی و فا تحه سالینه واین همه را در عرب اول وجود نبود، مصلحت آن است که غیر تعزیهٔ و ارثان میت تا سه روز و طعام ایشان یک شبا روز رسمے نه باشد -

অর্থাৎ যে সকল নিকৃষ্ট বেদ্‌আত আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বিভিন্ন মাতমে, ছিয়ম, চেহ্‌লাম (তৃতীয় দিনের, চল্লিশ দিনের) ষষ্ঠ মাসিক ও বার্ষিক আহারাদির ব্যবস্থাপনায় আমাদের অপব্যয় হইতেছে অন্যতম। এছলামের প্রাথমিক যুগে এই প্রথার কোন অস্তিত্বই ছিল না। ইহার পরিবর্ত্তে তিন দিন মৃত ব্যক্তির ওয়ারেছদের সঙ্গে সহানুভূতি করা, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দেওয়া এবং এক দিবারাত্রের জন্য তাহাদের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া মাইয়েতের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন রছম পালন করা সঙ্গত নহে।

শাহ ছাহেবের এই মন্তব্য হইতে জানা যাইতেছে যে,

(১) হজরত রাছুলে করিমের বা তাঁহার ছাহাবীগণের সময় এই প্রথার অস্তিত্বই ছিল না।

(২) সুতরাং ইহা হইতেছে একটি নিকৃষ্টতম বেদ্‌আত্।

এমাম সিন্ধী মাদানী এবনে-মাজার টীকায় বলিতেছেন :—

قد ذكر كثير من الفقهاء ان الضيافة من اهل الميت قلب للمعقول،
لان الضيافة حقها للسرور لا للحزن -

অর্থাৎ, ফেকার আলেমগণের অনেকেই বর্ণনা করিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তির পরিজন-দিগের নিকট হইতে জিয়াফত্ আদায় করা একটা না মা'কুল কাজ। কারণ জিয়াফত হয় খুশীর ব্যাপারে, দুঃখের সময় ইহার প্রচলন হইতে পারে না।"

এমাম এবন-হোমাম বিষয়টা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

يكره اخذ الضيافة من اهل الميت - لانه شرع فى السرور لا فى الشرور -
و هى بدعة مستقبحة (فتح القدير) -

অর্থাৎ—মাইয়েতের পরিজনবর্গের নিকট হইতে জিয়াফৎ গ্রহণ করা মাকরূহ। কারণ, শরিয়তে জিয়াফৎ অনুমোদিত হইয়াছে আনন্দজনক মুহূর্তে দুঃখজনক ব্যাপারে নহে। সুতরাং ইহা হইতেছে অতি নিন্দনীয় বেদ্আত।

ফাতাওয়া আলমগীরীতে বর্ণিত হইয়াছে :—

قرأة الكافرون الخ مع الجمع مكروهة لانها بدعة - لم ينقل ذلک عن
الصحابة -

(মাইয়েতকে ছওয়াব পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে) জনসমাবেশে ছুরা কুল্ইয়া শেষ পর্যন্ত পাঠ করা মকরূহ, কারণ ছাহাবা হইতে এরূপ করা প্রমাণিত হয় নাই। হানাফী ফিকহের বিশ্বস্ত কেতাব নেছাবুল এহ্তিছাবেও এরূপ উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, তাবেয়ীগণ হইতেও এরূপ বর্ণিত হয় নাই।

এমাম আহমদ বিন্ হাম্বল বলিয়াছেন :—

الطعام الذى يصنعه اهل الميت فيجتمع عليه النساء و الرجال لهو فعل
قوم لاخلاق لهم فى الدين (تزكرة قرطبى) -

মাইয়েতের গৃহে যে খানা তৈয়ার হয় এবং নারী-পুরুষ সকলে তাহা ভক্ষণ করে—তাহা হইতেছে এমন এক সমাজের রীতি, এছলাম ধর্মে যাহাদের কোনো অংশ নাই।

মাওলানা শাহ মোহাম্মদ ইছহাক মোহাদ্দেছ দেহ্লবীও এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আরও আছে, লোকে মনে করে যে, ঐ সব দিনে মোর্দাদের রূহ সেখানে উপস্থিত হয়, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ প্রমাণহীন কথা মাত্র। (مائة مسائل)

যে সব আলেম এই "শোকোৎসবের" জিয়াফৎ মেজবানীকে, হিন্দু সমাজ হইতে গৃহীত ও অনৈছলামিক অনাচার বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। হিন্দু সমাজের স্বীকৃত বরাহ পুরাণে এই প্রথার প্রথম সন্ধান পাওয়া যায়। এই সমাজে মৃত পিতৃবর্গকে প্রেত হওয়ার দুর্ভোগ হইতে মুক্তি দেওয়ার ও

তাহার উৎপাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত করিতে হয়। ১ হিন্দু শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে—ব্রাহ্মণকে এগারদিনে, ক্ষত্রীয়কে তেরদিনে, বৈশ্যকে ষোলদিনে এবং শূদ্রকে একত্রিশ দিনে এই শ্রাদ্ধপ্রথা পালন করিতে হয়। ইহা ব্যতীত শাস্ত্রে খুঁটিনাটি আরও অনেক প্রকার ব্যবস্থা আছে। অধিকন্তু মাসিক, বাৎসরিক প্রভৃতি (সর্ব্বসাকুল্যে) ষোল প্রকার শ্রাদ্ধের নির্দ্দেশও হিন্দুশাস্ত্রে আছে। এক শ্রেণীর মুছলমান তাহাদের দ্বিতীয় অন্ধকার যুগে, তৃতীয় দিনের শ্রাদ্ধ (তীজা), ১১ দিনের শ্রাদ্ধ বা য়াজদহম, ৩১ দিনের ছীয়ম سیوم বা ৩০ দিনের শ্রাদ্ধ এবং ষাণ্মাসিক ششماہی পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, জন্মদিন উপলক্ষে সাংবৎসরিক স্মৃতি দিবস উপলক্ষেও তাহারা শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং ৪০ দিনের "চেহ্লাম" چہلم পালনও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

আমাদের মধ্যে যাহারা এই প্রথা পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, মৃত পিতৃবর্গের রূহে ছওয়াব পৌঁছাইবার জন্য এবং তাহাদের মাগ্‌ফেরাতের উদ্দেশ্যে আমরা এই অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকি। হিন্দুশাস্ত্রে বলা হইতেছে—মানব মৃত্যুমুখে পতিত হইলে প্রেতভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। পরে পুত্রাদি শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে পিতৃগণের আত্মা ইহার পুণ্যফলে প্রেতলোক হইতে মুক্তি লাভ করে।

আমরাও প্রায় একই রূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়া থাকি, আমাদের পিতৃগণের আত্মা এই ছওয়াবের বরকতে আল্লার রহমত ও মাগফেরাত লাভ করিতে পারেন, সেইজন্য আমরা ঈছালে ছাওয়াবের এই অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকি। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ছওয়াব লাভের আশ্বাস আমরা কোথা হইতে পাইয়াছি, আল্লার কেতাব হইতে, না তাঁহার রাছুলের কোনো হাদীছ হইতে?—পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, কোরআন হাদীছের কুত্রাপি এই আশ্বাসের কোনো প্রমাণই পাওয়া যায় না। এছলামের প্রাথমিক যুগে এই অনাচারের অস্তিত্বই ছিল না। তাহার পরবর্ত্তী যুগের আলেম ও মুফতিগণ সকলে সমস্বরে এই কুপ্রথার নিন্দা করিয়াছেন, ইহাকে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর একটা বেদআত্ বলিয়া দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন।

উপরে আমরা যেসব যুক্তিপ্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি, সে সমস্তই হানাফী মজহাবের

১। এই উৎপাতের বিষয় বেদ্‌আতী মুছলমানদিগের আচার ব্যবহারে সমানভাবে প্রকট হইয়া আছে। তাহারাও বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, মানুষ মরিয়া যাওয়ার পর তাহার "আরওয়াহ" নিজের স্বজনের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে এবং নিজের আকাঙ্খিত বস্তু প্রাপ্ত হইবার জন্য চারিদিকে ডামাডোল করিয়া বেড়ায়। অধিকন্তু সময় সময় নিজের পরিত্যক্ত পরিজনের উপর নির্য্যাতন চালাইতেও কুণ্ঠিত হয় না। (প্রাচীন হিন্দী উর্দ্দু অভিধান ফার্হাঙ্গে আছাফীয়া) বৃহস্পতিবার দিনগত রাত্রে এবং শবেবরাতের (রাত্রেও) মুছলমান সমাজের একশ্রেণীর লোক নিজেদের পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের পরিতৃপ্তির জন্য নানা-প্রকার ভোগের আয়োজন করিয়া থাকেন। শবেবরাতের হালওয়া-রুটি ইহার প্রধানতম উপকরণ।

বিশিষ্ট আলেমগণের ফৎওয়া ও বিশুদ্ধ ফেকার কেতাব হইতে গৃহীত হইয়াছে। আমাদের ধারণা ছিল, এই অনাচারটা হানাফী মজহাবের একশ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু সন্ধান নিয়া জানিতে পারিলাম যে, যাঁহারা মোহাম্মদী ও আহলে হাদীছ বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন, এই বেদ্আত্‌টা তাঁহাদের মধ্যেও বহুলভাবে প্রচলিত আছে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের ও লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে। ইহা জাএজ হওয়ার কি প্রমাণ তাঁহারা পাইয়াছেন, জানিতে পারিলে বিশেষ বাধিত ও উপকৃত হইব। মৃত ব্যক্তির জন্য কোনো সৎকাজ করা হইলে, তাহার ছওয়াব তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—ইহা আমরাও বিশ্বাস করিয়া থাকি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকি যে, বেদআতের দ্বারা যেসব রীতিনীতি ও প্রথা পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়া থাকে তাহা ধর্মের হিসাবে সৎকাজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

গোর পরস্তী বা কবর পূজা

এই প্রসঙ্গের বিচার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যে, কবর বলিতে কি বুঝায়? মুছলমান হিসাবে পাঠকগণের অনেককেই হয়ত কোনো না কোনো অবস্থায় কবরের সংস্রবে যাইতে হইয়াছে। কবর আছে, অথচ তাহাতে দাফন করা হইল যাহাকে তাহার অস্তিত্বই নাই! এমন কি, যে গ্রামে বা যে শহরে তার কবর তাহাকে সেই গ্রামের লোক চিনে না, জানে না! এমন উদ্ভট কথা কেহ কখনো শুনিয়াছেন কি? আমরা অনেক সময় শুনিতে পাই যে, বাংলা দেশের অমুক অঞ্চলে অমুক বোজর্গের কবর (মাজার শরীফ) বিদ্যমান আছে। অথচ আমাদের সমস্ত প্রামাণ্য ইতিহাসে সেই বোজর্গ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, বাংলা দেশে দূরে থাকুক, পাক-ভারতের কোনো অঞ্চলেই তিনি কস্মিনকালেও কদম রাখেন নাই। অধিকন্তু তাঁহার জন্ম-মৃত্যুর স্থান কাল সম্বন্ধে যদি লিখিত থাকে যে, সেই বোজর্গ অন্য এক দেশে জন্ম গ্রহন করিয়াছিলেন এবং অমুক সালের অমুক তারিখে তাঁহার এন্তেকাল হইয়াছিল, সেই স্থানে তাঁহার কাফন-দাফন হইয়াছিল, কেহ তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইবে না। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে! অথচ হজরত রাছুলে কারিমের হাদীছে, এই শ্রেণীর কবর বানানই নিষিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ কবরে জিয়ারতে গমনকারীদের উপর হজরত লা'নৎ করিয়াছেন। গোর পরস্তী বা কবর পূজা—শিরোনামা দেখিয়া কোনো কোনো পাঠক হয় তো আমাদের উপর বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ হইতেছেন। তাহাদিগকে আমরা কিছু সময়ের জন্য ধৈর্য্য ধারণ করিতে সবিনয়ে অনুরোধ জানাইতেছি।

অন্য সব পূজার ন্যায় কবর পূজারও কতকগুলি উপাদান উপকরণ আছে। যেমন—(১) কবর পাকা করা, কবরের উপর পাকা ঘর, গুম্বদ বা গুম্বা প্রস্তুত করা ইত্যাদি।

(২) কবরের উপর চেরাগ—বাত্তি জ্বালান, কবরকে ছেজদার স্থান রূপে গ্রহণ করা, কোনো ইষ্ট লাভের বা কোনো অনিষ্ট হইতে রক্ষার জন্য কবরস্থ মানুষের কাছে প্রার্থনা করা, হাজত মানা, নজর নামাজ মানা ইত্যাদি। কবর সংক্রান্ত ও অন্যান্য শির্ক-বেদ্‌আত সম্বন্ধে, মাওলানা খোররম আলী ছাহেবের "নাছীহাতুল-মোছলেমীন" নামক কেতাবখানা বাংলায় তরজমা করা হইয়াছে। শীঘ্রই প্রকাশ করার চেষ্টা হইতেছে। আজ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্তভাবে কতিপয় হাদীছ এবং হানাফী মজহাবের স্বনামখ্যাত মুফতী ও এমামগণের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইব। আমরা শুধু হানাফী মজহাব বলিতেছি এই জন্য যে, মোহাম্মাদী জামাতে আল্লার ফজলে আজ পর্য্যন্ত এই সমস্ত বিদ্‌আত ও কুপ্রথা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।

যে সব লোক এমাম আবু হানিফা ও অন্যান্য এমামগণের رحمة الله عليهم اجمعين অনুসরণ করিয়া থাকেন তাহাদিগকে প্রারম্ভেই জানাইয়া রাখিতেছি যে, ঐ এমামগণ এবং তাঁহাদের নামে প্রতিষ্ঠিত মজহাব চতুষ্টয়ের আলেম ও মুফতীগণ সকলে এক বাক্যে কবরের উপর পাকা ঘর ও গুম্বদ বা কুব্বা নির্ম্মাণ করা ইত্যাদিকে ছাফ হারাম বলিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন।

এমাম মুছলিম, তিরমিজি, নাছায়ী ও ইবনে মাজাহ হজরত জাবের এবনে আব-দুল্লার বাচনিক রেওয়ায়তে করিয়াছেন,—

عن جابر قال نهى رسول الله صلى عليه وسلم ان يجصص القبر و ان يقعد عليه و ان يبنى عليه -

রছুলুল্লাহ (দঃ) কবর পাকা করা, কবরের উপর স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করা এবং কবরের উপর উপবেশন করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তিরমিজির রেওয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে—

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجصص القبور و ان يكتب عليها و ان يبنى عليها و ان توطا -

রছুলুল্লাহ (দঃ) কবর পাকা করিতে, উহাতে কিছু (মাইয়েতের নাম প্রভৃতি) লিপিবদ্ধ করিতে, কবরের উপর ঘর নির্ম্মাণ করিতে এবং উহাকে পদদলিত করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

উল্লিখিত হাদীছের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, কবরকে পাকা করা এবং তাহার উপর কোনরূপ ঘর বানান প্রভৃতি সর্ব্বতঃ হারাম। (আউনুল মা'বুদ)

আবু দাউদ, তিরমিজি এবং নাছায়ী হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,—

قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد و السرج ۔

অর্থাৎ রছুলুল্লাহ (দঃ) (শরীয়তবিগর্হিত ভাবে) কবর জিয়ারতে গমনকারিণী স্ত্রী-লোকদের প্রতি, এবং যাহারা কবরের উপর মছজিদ নির্ম্মাণ করে আর কবরে বাতি জ্বালাইয়া থাকে, তাহাদের প্রতি লা'ৎ করিয়াছেন।

রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার মৃত্যুশয্যায় উম্মতকে সেৎবারের ন্যায় অছীয়ত করিয়া গিয়াছেন,—

الا فلا تتخذوا القبور مساجد ۔

সাবধান! তোমরা কবরকে মছজিদে পরিণত করিও না। অতএব কবরে গোম্বজ বানান, সৌধ নির্ম্মাণ করাও যে হারাম তাহা এই হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে। আব্দুর রাজ্জাকের হাদীছে আছে,—

ان من شرار امتی من يتخذ القبور مساجد ۔

বস্তুতঃ আমার উম্মতের নিকৃষ্ট লোক হইতেছে তাহারা, কবরকে ছিজ্দাগায় পরিণত করে যাহারা।

এমাম মুছলিম হজরত আয়েশার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ তাঁহার অন্তিম সময়ে ইর্শাদ করিয়াছেন,—

لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ۔

আল্লার লা'নৎ বর্ষিত হউক এহুদ এবং নাছারার উপর, তাহারা তাহাদের নবীদের কবরগুলিকে মছজিদে (ছিজদাগায়) পরিণত করিয়া দিয়াছে।

তিনি আব্দুল্লাহ এবন হারিছ নজরাণীর বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন,—

الا و ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم و صالحيهم مساجد،
الا فلاتتخذوا القبور مساجد انى انهاكم عن ذلك ص ۲۰۱

দেখ, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা (এহুদ ও নাছারা) তাহাদের নবী ও সৎব্যক্তিদের কবরগুলিকে মছজিদ করিয়া নিয়াছিল, অতএব সাবধান! তোমরা (হে মুছলিম সমাজ!) কবরকে মছজিদে পরিণত করিও না, বস্তুতঃ আমি তোমাদিগকে উহা হইতে নিষেধ করিতেছি। (মুছলিম ২০১ পৃঃ)

ছহীহ বুখারী এবং মোআত্তা গ্রন্থেও এই মর্ম্মের হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত হাদীছের দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে,—

(ক) কবরের উপর কোনরূপ ঘর, গোম্বদ বা সৌধ নির্ম্মাণ করা এছলামী শরীয়তে সর্ব্বতঃ নিষিদ্ধ—হারাম।

(খ) কবরে মছজিদ বানান অথবা কবরের দিকে ছিজদা করা এবং কবরকে ছিজদাগাহ পরিণত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ—অবৈধ।

(গ) কবরে কোনরূপ আগুন প্রজ্বলিত করা, চেরাগ দেওয়া, মোমবাতি এবং আগরবাত্তি প্রভৃতি জ্বালান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, শরীয়ত-বিগর্হিত কাজ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং হজরত আলীকে কবরের উপর নির্মিত ঘর, গোম্বদ এবং কুব্বা প্রভৃতি ভাঙ্গিবার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এমাম মুছলিম আবুল হাইয়াজ আছদী তাবেয়ীর সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন,—

قال قال لى على الا ابعثک على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته ۔

হজরত আলী আমাকে বলিলেন, আমি তোমাকে সেই কাজে নিযুক্ত করিতেছি, যে কাজে রাছুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন অর্থাৎ যেখানেই কোন প্রতিমা দেখিবে তাহা নিশ্চিহ্ন করিবে এবং যেখানেই কোন উঁচু কবর দেখিবে তাহা ভাঙ্গিয়া (ভূমির) সমান করিয়া দিবে। (মুছলিম ৩১২ পৃঃ)

স্বয়ং এমাম আবু হানীফা কবরের উপর ঘর, কুব্বা এবং গোম্বদ বানাইতে নিষেধ করিয়া উহাকে হারাম বলিয়াছেন।

ফতাওয়া কাজী খানের (১ম খণ্ড, আলমগীরির টীকায় মিসরের ময়মনিয়া প্রেসে মুদ্রিত) ১১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে—

روى عن ابى حنيفه رحمه الله تعالى انه قال لا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء و سقط ۔

এমাম আবু হানিফা বলিয়াছেন, কবর যেন পাকা করা, মাটীর দ্বারা লেপন এবং কবরের উপর ঘর আর তাঁবু প্রতিষ্ঠা করা না হয়। (কারণ উহা নাজায়েজ ও অবৈধ)।

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

يكره ان يبنى عليه بناء من بيت او قبة او نحو ذالک ۔

কবরের উপর গৃহ, কুব্বা অথবা অনুরূপ কোন কিছু নির্মাণ করা মকরূহ—হারাম। (শামী (১) ৬৬২ পৃঃ; মুনিয়াতুল মুছল্লীর ভাষ্য কবীরি ৬০০ পৃঃ)

এমাম মোহাম্মদ এবন হাছান কর্তৃক এমাম আবু হানীফার সূত্রে রাছুলুল্লার একটি হাদীছও বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ কবর পাকা করিতে এবং উহাকে চতুষ্কোণবিশিষ্ট করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (শামী (১) ৬৬১ পৃঃ)।

ফতাওয়া আলমগীরিতে (১) ১৭৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—

لا الا جر و الخشب و يكره ان يزاد على التراب الذى اخرج من القبر و يسنم القبر قدر الشبر ولا يربع ولا يجصص و يكره ان يبنى على القبر ۔

অর্থাৎ পাকা ইট এবং লাকড়ি কবরে লাগাইবে না। কবরের মাটি ছাড়া অপর মাটি বৃদ্ধি করিয়া কবরকে উঁচু করা মকরূহ। কবরকে (উটের) ঝোঁটাস্বরূপ এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করিবে। কিন্তু চতুষ্কোণ এবং পাকা করিবে না। কবরের উপরে কোন সৌধ নির্মাণও মকরূহ—হারাম।

অনুরূপভাবে ফতাওয়া কাজী খান, বাজ্জাজীয়া, কনুজ্জুদ্দাকায়েক এবং ইহার ভাষ্য অয়লয়ী, বাহ্‌রুররায়েক, রেদায়া প্রভৃতি ফিকাহ্‌ গ্রন্থে এবং হানাফী ও শাফেয়ী প্রভৃতি মজ্‌হাবের বিশিষ্ট আলেমগণের ফতাওয়া দ্বারা কবর পাকা করা এবং গোম্বদ বা সৌধ নির্মাণ করা হারাম ও নিষিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং কেহ এরূপ বানাইলে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কুহ্‌বীর শরাহ জৌহরায়ে নৈয়ারাতে বলা হইয়াছে,—

يكره تطيين القبور و تجصيصها والبناء عليها و الكتا بة عليها -

কবরকে মাটি দিয়া লেপা, পাকা করা, উহার উপর ঘর নির্ম্মাণ করা এবং কবরে (মাইয়তের নাম, সন প্রভৃতি) লেখা মকরূহ—হারাম।

কনজুদ্দাকায়েকের টীকায় বলা হইয়াছে,—

يكره الستور على القبور و بناء القبة على القبر كما يصنع الان فى حق الاو لياء و الصلحاء -

কবরকে চাদর দ্বারা আবৃত করা, ও তাহার উপর কুব্বা বানান মকরূহ। যেমন আজকাল অলি ও সৎ ব্যক্তিদের কবরে করা হইয়া থাকে। (৫০ পৃঃ)

মুফীদুল মু'মীনীনে আছে;

البناء على القبور حرام و من قال باباحته فاباح ما تنهى عنه السنة -

কবরের উপর কোনরূপ ঘর বানান হারাম। যাহারা ইহাকে মুবাহ বলিয়াছে তাহারা সুন্নতে (হাদীছে) নিষিদ্ধ বস্তুকেই মুবাহ করিয়াছে।

আমরা উপরে শুধু এমাম আবু হানিফা এবং হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থের উদ্ধৃতি উপস্থাপিত করিয়াছি। এখন আমরা অন্যান্য এমামগণের কয়েকটি উক্তিও পেশ করিতেছি।

কবরের উপর গোম্বদ নির্ম্মাণ সম্পর্কে এমাম চতুষ্টয় এবং অন্যান্য এমামগণের অভিমত ব্যক্ত করিয়া আল্লামা আলী এবনে আবদুল্লাহ উন্দলুছী নাছায়ীর ভাষ্যে লিখিয়াছেন,

ذهب الا مام احمد و ابو حنيفة فى رواية و الرافعى وداؤد الظاهرى انه حرام مطلقا سواء كان فى مقبرة مسبلة اوفى ملک البانى و قال مالک و الشافعى و الثورى و الا وزاعى و ابو حنيفة فى رواية اخرى انه حرام فى مقبرة مسبلة و مكروه ان كان فى ملک البانى -

এমাম আহমদ, আবু হানীফা, শাফেয়ী এবং দাউদ জাহেরীর মত এই যে, সাধারণ কবরস্থানে অথবা নির্ম্মাণকারীর নিজস্ব গোরস্থানে—সর্ব্বত্রই কবরের উপর ঘর, কুব্বা গোম্বদ প্রভৃতি বানান হারাম। পক্ষান্তরে, এমাম মালেক, শাফেয়ী, ছওরী, আওজায়ী এবং আবু হানিফার অপর মতানুসারে সাধারণ কবরস্থানে উল্লেখিত নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ অবৈধ—হারাম এবং নিজস্ব গোরস্থানেও মকরূহ।

এমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন,

رایت الا ئمة بمكة يامرون بهدم مايبنى (نيل الا و طار مصرى جلد (٣) ٣٢٤ ص)

মক্কার সমস্ত এমামকে আমি দেখিয়াছি তাঁহারা কবরের উপর নির্ম্মিত গোম্বদ ও পাকা ঘর প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে নির্দ্দেশ দিতেন। (নয়ল)

তিনি তাঁহার কেতাবুল উম্মে বলিয়াছেন,

انما احب ان يشخص على وجه الارض شبرا او نحوه وا حب ان لا يبنى ولا يجصص فان ذلك يشبه الزينة و الخيلاء و ليس الموت موضع و احد منهما و لم ار قبور المهاجرين و الا نصار مجصصة -

আমার মতে কবরকে ভূমি হইতে এক বিঘত পরিমাণ উচু করা উচিত এবং কবরকে পাকা করা এবং তাঁহার উপর কিছু নির্ম্মাণ করা উচিত নহে, কারণ ইহাতে সৌন্দর্য্য আর অহঙ্কারই প্রকাশ পাইয়া থাকে আর মৃত্যু উহার কোনটির যোগ্যস্থান নহে। এবং আমি মোহাজির ও আনছারদের কাহারও কবর পাকা করা দেখি নাই। অতঃপর এমাম শাফেয়ী রছুলুল্লার একটি হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تبنى القبور او تجصص -

কবরের উপর কিছু নির্ম্মাণ করিতে অথবা কবরকে পাকা পোখ্‌তা করিতে রছুলুল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন। (কিতাবুল উম্ ২৪৬)

কবরের উপর মছজিদ বানান, এবং কবরের দিকে নামাজ পড়া প্রভৃতিও হুরতের নির্দ্দেশ অনুসারে এমাম শাফেয়ী নিষেধ করিয়াছেন। (ঐ)

বিখ্যাত হানাফী আলেম আল্লামা কাজী ইব্‌রাহীম তাঁহার মাজালিছুল আবরার গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

و يكره ان يبنى عليه بيت او قبة او نحو ذلك .... ليس شئ منها مشر و عا باتفاق ائمة المسلمين - .

কবরের উপর কোনরূপ ঘর, কুব্বা অথবা অনুরূপ কিছু নির্ম্মাণ করা নিষিদ্ধ...। এই সমস্ত বিষয়ের শরীয়ত-বিরুদ্ধ হওয়াতে সমুদয় এমাম মতৈক্য একমত। (৩৫৪ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও লিখিয়াছেন,

كالمساجد المبنية على القبور فان حكم الاسلام فيها ان تهدم حتى تسوى بالارض و كذا القباب التى بنيت على القبور يجب هدمها لانها اسست على معصية الرسول و مخالفته و كل بناء اسس على معصية الرسول و مخالفته فهو بالهدم اولى من مسجد الضرار و لانه عليه السلام نهى البناء على القبور و لعن المتخذين عليها المساجد -

অর্থাৎ কবরের উপর নির্ম্মিত মছজিদগুলি সম্বন্ধে শরীয়তের নির্দ্দেশ এই যে, উহা ভাঙ্গিয়া ভূমির সমপর্য্যায় করা উচিত, অনুরূপভাবে কবরের উপর যে সমস্ত কুব্বা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলা ওয়াজিব। কারণ তাহা আল্লার রছুলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে আর যাহা রছুলুল্লার বিরুদ্ধাচরণে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা মছজিদে জেরার অপেক্ষা সমধিক আবশ্যক। বস্তুতঃ রছুলুল্লাহ (দঃ) কবরের উপর মছজিদ অথবা অন্যান্য গৃহ নির্মাণকারীদের প্রতি লা'নৎ করিয়াছেন। (ঐ ১২৮-১২৯ পৃঃ)

আল্লামা এব্‌নে হজর মক্কী শাফেয়ী লিখিয়াছেন,

و لو بنى فى مقبرة مسبلة هدم و جوبا لحرمته .... وقد افتى جمع بهدم ما بقرافة مصر من الابنية حتى قبة امامنا الشافعى التى بناها بعض الملوک و ينبغى لكل احد هدم ذلک -

(মুছলমানের) সাধারণ কবরস্থানে কবরের উপর কিছু নির্ম্মিত হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা ওয়াজিব, কারণ উক্ত নির্ম্মাণকার্য্য সর্ব্বতঃ হারাম।...

সকল মতের সমস্ত আলেম সমবেতভাবে ফত্‌ওয়া দিয়াছেন যে, মিশর প্রান্তে যে সমস্ত গোম্বজ—কুব্বা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করা উচিত। এমন কি এমাম শাফেয়ীর কবরের উপর যে কুব্বা জনৈক সম্রাট বানাইয়াছেন তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলার ফত্‌ওয়া তাঁহারা দিয়াছেন। প্রত্যেকের জন্যই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা ওয়াজিব।

আল্লামা ছৈয়দ মাহ্‌মুদ আলুছী ছুরা কাহফের তফছীরে লিখিয়াছেন,

فان اعظم المحرمات و اسباب الشرک الصلوة عندها و اتخاذ ها مساجد او بناؤها عليها و تجب المبادرة لهدمها و هدم القباب التى على القبور اذهى اضر من مسجد الضرار لانها اسست على معصية رسول الله صلى الله عليه و سلم لانه عليه الصلوة و السلام نهى عن ذلک و امر بهدم القبور المشرفة و تجب ازالة كل قنديل او سراج على قبر ولا يصح وقفه و نذره -

অর্থাৎ কবরের কাছে নামাজ পড়া, কবরকে মছজিদে পরিণত করা অথবা কবরের উপর মছজিদ নির্মাণ করা গুরুতর হারাম এবং শির্কের উপকরণ। যথাশীঘ্র তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা ওয়াজিব, কেননা তাহা মছজিদে জেরার অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকারক; বস্তুতঃ তাহা রছুলুল্লার না-ফরমানীর উপর প্রতিষ্ঠিত, রছুলুল্লাহ (দঃ) উহা নিষেধ করিয়াছেন এবং উচ্চ কবরগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার হুকুম প্রদান করিয়াছেন। অনুরূপভাবে কবরে যে ফানুস অথবা প্রদীপ জালান হইয়া থাকে তাহা অপসারণ করাও ওয়াজিব। তাহাতে কিছু ওয়াকফ করা বা কিছু মানত করাও জায়েজ নহে।

(রুহুল মাআনী (৫) তফছিরে ছুরা কহ্ফ)

অতঃপর পবিত্র কোরআনের একটী আয়তের প্রতি পাঠক পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের ইতি টানিতে চাই। আল্লাহ ইর্শাদ করিয়াছেন,

يا ايها الذين امنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون -

হে মোমেনগণ! নিশ্চয়ই যাবতীয় মাদকদ্রব্য, সকল প্রকারের জুয়া এবং সমস্ত 'স্থান' (আল্লাহ ব্যতীত যাহা পূজিত হইয়া থাকে) এবং আজ্লাম (জুয়া খেলার জন্য নির্দিষ্ট তীরগুলি) অতি জঘন্য শয়তানি কাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে, অতএব বর্জন কর এই জঘন্যতাকে যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। (ছুরা মায়েদা ৯০ আয়ত)

আয়তে উল্লিখিত 'আনছাব' শব্দের অর্থ হইতেছে সেই সমস্ত যাবতীয় বস্তু, আল্লাহ ব্যতীত যাহার পূজা করা হইয়া থাকে। মাগ্রালিছুল আবরারে বলা হইয়াছে,

و هو كل ما نصب و عبد من دون الله تعالى من شجر او حجر او قبر او غير ذالک -

'আন্‌ছাব' বলিতে সেই সমস্ত 'স্থান ও বস্তু'ই বুঝাইতেছে, আল্লাহ ছাড়া যাহার পূজা করা হইয়া থাকে। বৃক্ষ অথবা প্রস্তর অথবা কবর বা অন্য কোন বস্তু—সমস্তই তাহার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কবরে নির্মিত ও পূজিত সমুদয় বস্তু উহার অন্তর্গত হইয়া অপবিত্র—নজিছ বস্তুতে পরিণত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক মুছলমানকে উক্ত নজিছ হইতে দূরে থাকার জন্য পবিত্র কোরআনে আল্লাহ নির্দেশ দান করিয়াছেন,

فاجتنبوا الرجس

অপবিত্র বস্তুর নিকটবর্তী হইও না। (আল্‌কোরআন)

পরিতাপের বিষয়, বর্তমানে এক শ্রেণীর লোক মিথ্যা স্বপ্নের আশ্রয় লইয়া নিজেদের প্রবৃত্তির চরিতার্থ করার মানসে যত্রতত্র নিত্য-নূতন কবর আবিষ্কার করিতেছে এবং ইহা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। কবর পূজা প্রভৃতি শির্কের কলুষ কালিমায় আজ মুছলিম

সমাজের সামাজিক জীবন কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে। আরও অধিক দুঃখের বিষয় এই যে, এই শির্ক ও অনাচারের অনুভূতিও মুছলমান সমাজ হারাইতে বসিয়াছে। শরীয়তের প্রকৃত নির্দ্দেশ এবং আল্লাহ্ ও রছুলের বাস্তব হুকুম কি, তাহা মুছলমান সমাজের সম্মুখে বিস্তারিতভাবে উপস্থিত করার জন্য আমরা পবিত্র কোরআন, হাদীছ, ফিকাহ্ এবং এমামগণের উক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, কবর পাকা করা, কবরের উপর কোন অট্টালিকা বা এমারত নির্ম্মাণ করা, কবরে নামাজ পড়া, ছিজদা করা এবং নজর নায়াজ ও মানত করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। মুছলমান সমাজকে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে আমাদের আলোচিত দলীলগুলি বিচার করিয়া শির্ক ও বিদআতের মহাপাতক হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আল্লাহ পাক মুছলিম সমাজকে সত্য অনুধাবন করিয়া তাহার অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

و ما علينا الا البلاغ المبين وما توفيقى الا بالله -

২৬শ অধ্যায়

অধঃপতনের আর একটা দিক

এছলামের প্রকৃত শিক্ষা হইতে বঞ্চিত একদল তথাকথিত পীরফকীর ও গ্রাম্য গোনকার এবং আলেম নামধারী ব্যক্তিদিগের কুশিক্ষার প্রভাবে তৎকালীন মোছলেম জনসাধারণ জ্ঞানগতভাবে ও ধর্মের হিসাবে কোন্ শোচনীয় পর্য্যায়ে উপনীত হইয়া গিয়াছিল, তাহার কতকগুলি উদাহরণের উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, পরবর্ত্তী যুগে এই অনাচারের কোনো প্রকার প্রতিকার সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই নানা কারণে। ইহার কারণ হইতেছে, একদিকে কোরআন হাদীছের চর্চার অভাব এবং অন্যদিকে উপরোক্ত শ্রেণীর ভণ্ড ও ভ্রান্ত পীর ফকীরদিগের প্ররোচনার প্রাদুর্ভাব। এই অন্ধকার যুগে দোওয়া, কবচ, যাদু, টোটকা,, জেন, ভূত প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা-"আমলীয়াত" ছিল ইহার প্রধান উপকরণ। আল্লার কোরআনে এবং রাছুলে করিমের হাদীছে এই অনাচারের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় না।

এখন প্রশ্ন আসিতেছে, তাহা হইলে এই সব অনাচারের মূল উৎস কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে কএকজন লেখকের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(১) In India, the most popular work on da'wah is the Jawahirul Khamsah, by Shaikh Abul Muwayyid of Gujerat, A. H. 956, in which he says the Science is used for the following purposes. (1) To establish friendship or enimity between tow persons. (2) To cause the cure, or the sickness and death of a person. (3) To secure the accomplishment of one's wishes, both temporal and spiritual. (4) To obtain defeat or victory in battle.

This book is largely made up of Hindu customs which, in India, have become part of Mohamadanism ; but we shall endeavour to confine ourselves to a consideration of those sections which exhibit the so-called Science as it exists in its relation to Islam.

In order to explain this occoult Science, we shell consider it under the following divisions :

1) The qualifications necessary for the 'amil' or the person who practices it.

2) The tables required by the teacher, and there uses.

3) An explanation of the terms nisab, zakat, ushr, qufl, daur, bazl, khatm, and sariul ijabah and their uses.

4) The methods employed for commanding the presence of the genii.

(A Dictionary of Islam, Pages : 72—73.)

তরজমা :—

"দাওয়া" সম্পর্কে লিখিত ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কেতাবখানির নাম হইতেছে 'জাওয়াহিরুল খামছা'। ৯৫৬ হিজরীতে গুজরাটের অধিবাসী শেখ আবুল মুয়াইঈদ কর্ত্তৃক ইহা লিখিত হইয়াছিল। উক্ত লেখকের মতে "দাওয়া-বিজ্ঞানে"র কার্য্যকারীতা নিম্নরূপ :—

(১) দুইজন লোকের মধ্যে দোস্তি অথবা দুষমনি পয়দা করা;

(২) কারো রোগ-বিমার সারানো অথবা কারো মৃত্যু ঘটানো;

(৩) কোন পার্থিব অথবা পারলৌকিক মকছুদ হাছেল;

(৪) যুদ্ধে পরাজয় ঘটানো অথবা জয়লাভ করা।

এই পুস্তকের বিষয়বস্তুর অনেকগুলি হিন্দু সংস্কারের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল। বলাবাহুল্য, ভারতবাসীদের মধ্যে এই সকল সংস্কারাদি এছলামের নামেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য তাহা নহে। আমাদের উদ্দেশ্য হইতেছে এই তথাকথিত বিজ্ঞানের সহিত এছলামের সম্পর্ক খুঁজিয়া বাহির করা।

এই গুপ্ত-বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হইলে ইহাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া নিতে হইবে :

(১) আমিল অর্থাৎ চর্চ্চাকারীর প্রয়োজনীয় বিশেষ গুণাবলী।

(২) প্রয়োজনীয় সময়-নির্ঘণ্ট ও তাহাদের ব্যবহার।

(৩) নেছাব, জাকাত, উশর, কুফ্‌ল, দওর, বজল, খতম, ও ছরিউল ইজাবাহ্‌ প্রভৃতি অর্থবাচক শব্দসমূহের বিশেষ ব্যাখ্যা ও তাহাদের ব্যবহার।

(৪) জেন হাজের করা ও তাহাকে কাজে খাটানো।

(২) এছলামী ইনসাইক্লোপিডিয়ার লেখক বিভিন্ন স্থানে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে কএকটা অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(ক) تعویذات کی مستقل کتابیں موجود ہیں....، ان کتابوں میں سے جواهر خمسه اور نقش سلیمانی بہت مشہور ہیں....بعض اهل علم نے ایسے تعویذات اور گنڈے کا باندهنا واسطے ازالۂ مرض کے جائز رکھا ہے، جو ماخوذ هو

قرآن یا حدیث سے - لیکن بہتر یہ ہے کہ تعلیق سے بچے .... مانا کہ یہ بات فی الجملہ جائز بھی ہو' لیکن پھر اردگرد شرک کے پھرنا اور مشتبہات میں گھسنا کیا ضرور - (مضمون تعویذ)

(ক) তাবীজ সম্পর্কে নির্দিষ্ট পুস্তিকা রহিয়াছে...তন্মধ্যে 'জওয়াহিরুল খামছা এবং নক্শে ছোলায়মানী' অধিক প্রসিদ্ধ...কিছু সংখ্যক আলেম এরূপ তাবীজগুলা রোগমুক্তির জন্য ব্যবহার করা জায়েজ বলিয়াছেন যাহা কোরআন অথবা হাদিছ হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাবিজ প্রভৃতি লটকান হইতে বিরত থাকাই শ্রেয়ঃ। ইহার জায়েজ হওয়া যদি মোটামোটিভাবে স্বীকারও করিয়া লওয়া হয় তবুও শির্কের নিকটবর্ত্তী হওয়া এবং সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হওয়ার আবশ্যকতাই বা কি?

(খ) ھندوستان میں اس فن کی سب سے زیادہ جامع کتاب جواہر خمسہ مشہور ہے، جو سنہ ۹۰۶ ھ میں شیخ ابوالمؤید ما کن گجرات نے تصنیف کی ہے - اس کتاب میں ذیل کے مقاصد پر عملیات لکھے گئے ھیں -

(۱) دو شخصوں میں دوستی یا عداوت ڈالنے کے لئے (۲) کسی آدمی کی شفا یا بیماری عارض کرنے کے یا مارڈالنے کے لئے (۳) حصول مراد کے لئے (۴) لڑائی مین فتح پانے کے لئے (۵) جنات کو حاضر کرنے کے لئے وغیرہ -

(খ) পাক-ভারতে এই (তাবীজ প্রভৃতি) বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সম্পূর্ণ গ্রন্থ জওয়াহিরুল খামছা সমধিক প্রসিদ্ধ। যাহা শেখ আবুল মুয়াঈদ গুজরাতী কর্ত্তৃক ৯০৬ হিজরীতে রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে আমল করার বিধিব্যবস্থা রচিত হইয়াছে:—

(১) দুইজনের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি,

(২) কোন ব্যক্তিকে রোগাক্রান্ত অথবা তাহার রোগমুক্তি অথবা তাহাকে মারিয়া ফেলার জন্য,

(৩) যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য,

(৪) যুদ্ধে জয়ী হওয়ার মানসে,

(৫) জিনদিগকে হাজির করার পদ্ধতি প্রভৃতি।

(গ) اسماء الهیه کا عمل کرنے سے پشتر جو کسی مرد یا عورت کی حب یا دشمنی ڈالنے کے لئے کیا جائے، لازم ہے کہ ان کے نام کے پہلے حروف لئے جائیں....،

(গ) আল্লার নামের আমল যাহা কোন পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোকের ভালবাসা অথবা বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য করা হয় তাহার পূর্ব্বে আমলকারীর পক্ষে ইহার সহিত তাহাদের নামের প্রথম অক্ষর গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে।

উপরের বর্ণনা হইতে এই সব দোওয়া কবজের কার্য্যকারিতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে :—

এই তাবীজের দ্বারা দুইজন মানুষের মধ্যে সদ্ভাব বা শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, কোনো নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার অথবা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। আল্লার নাম গুলির এই আমল করার পূর্ব্বে সেই সব নর নারীর নামের প্রথম অক্ষর লিখিয়া রাখিতে হইবে। কারণ তাহাদের প্রত্যেকের নাম করিয়া এক একটা আমল সম্পন্ন করিতে হইবে। পাঠকগণ পরে দেখিবেন, এই মহব্বতের আমল করিলে, নিতান্ত অনিচ্ছুক নারীও দুই ঘন্টার মধ্যে পুরুষের কাছে ছুটিয়া আসিতে বাধ্য হইবে। দুইজন মানুষের মধ্যে খুব সদ্ভাব সম্প্রীতি বর্ত্তমান আছে। তাবীজের বলে তাহাদিগকে প্রাণের শত্রুতে পরিণত করিয়া দেওয়া সহজে সম্ভব হইয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত, আরও অনেক প্রকারের অতি কুৎসিত ও অতি কদর্য্য অভিযানের শিক্ষার ব্যবস্থা এতদসংক্রান্ত বহি পুস্তকে উল্লেখিত হইয়াছে। মফস্বলের মূর্খ মোল্লা ও ব্যবসাদার ওঝারা, তাহার সাহায্যে একদিকে মোছলেম জনসাধারণের ঈমান এবং অন্যদিকে তাঁহাদের বহু কষ্টে অর্জিত অর্থ অপহরণ করিয়া বেড়ায়। পাঠকগণের বিশ্বাসের জন্য ইহার দুই চারিটা নমুনা পরে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিব।

এখানে প্রথম দ্রষ্টব্য হইতেছে যে, আমাদের লেখকগণ এই শ্রেণীর তাবীজের ও তাহার আনুসঙ্গিক ক্রিয়া কালপের আমদানী করিলেন কোথা হইতে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোরআন, হাদীছ ও অন্য এছলামী সাহিত্যে ঘুর্ণাক্ষরেও উহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। তাহার কোনো সম্ভাবনাও নাই এবং থাকিতেও পারে না। ঐসব বেহুদা ব্যাপারগুলি পুঞ্জিভূত হইয়া আছে, ভারতীয় হিন্দু সমাজের বেদে, পুরানে, তন্ত্রে ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে।

এই সব দোওয়া তাবীজ যখন কেতাব আকারে সঙ্কলিত ও মুদ্রিত হইল, বিশেষতঃ নাক্শে ছোলায়মানী আজাএবে ছোলায়মানী এবং "ছহি-এছরারুল খাবনামা" প্রভৃতি পুথি বহুলভাবে মুদ্রিত হইয়া বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তখন হইতে মুছলমান সমাজ বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার বা কোনো মোরাদ হাছেল করার জন্য এই শ্রেণীর উর্দ্দু ও বাংলা পুথির উপর নির্ভর করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িল।

উপরে জওয়াহেরে খামছার সহিত নকূশে ছোলায়মানীর নামও সুবিখ্যাত ও জনপ্রিয় কেতাব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা এই নাক্শে ছোলায়মানী হইতে কতকগুলি দোওয়া কবচ পাঠকগণের খেদমতে উপহার দিতেছি। তাহা হইলে তাঁহারা নিজেই অবগত হইতে পারিবেন যে, এই অনাচারগুলি কিরূপে কাহাদের দ্বারা দেশময় প্রচারিত হইয়াছিল এবং তাহাদ্বারা দেশবাসীর এছলামী ধ্যানধারণা কতদূর বিপর্য্যস্ত হইয়াছে

এবং তাওহীদের আকীদা, ঈমানের দৃঢ়তা হইতে সাধারণ মুছলমান কত দূরে সরিয়া গিয়াছে :—

(১) মাওলানা মোহাম্মদ আছগর নামেতে।
আপন মজরেবাতে লিখিল এমতে॥
কারো তরে বানাইতে আশক আপনা।
কিম্বা কারে বানাইতে পাগল দেওানা॥
এইছাই এরাদা দেল হইবে যাহার।
তবে ত উচিত হয় করে এ প্রকার।
চান্দের তারিখ দিচে যেই জুম্মা হয়।
আমল শুরু করা চাহি সে সময়।
চল্লিশ দিবস তক জান বা একিন।
পড়িবে চল্লিশ বার হর হর দিন॥
প্রথম হইতে আর শেষ যে লাগাত।
মতলবের ধেয়ান রাখিবে নেকজাত—ইত্যাদি।

(২) দোছরা তরতিবে দেখা যাইতেছে যে, কেহ কাহাকেও মহব্বতে দেওয়ানা করিতে চাহিলে তাহাকে চল্লিশ দিন যাবত পাঞ্জেগানা নামাজের বাদে একবার করিয়া ছুরা ইয়াছিন পড়িতে হইবে এবং সাদা সরিষার উপর ফুক দিতে হইবে। অতঃপর আগুনে উহা পোড়াইলে—

শও কোশ দূরে যদি মতলুব থাকিবে।
বহুত সেতাবি সেই হাজির হইবে॥

(৩) আর এক তরতিবে দেখা যাইতেছে যে, আশিক সাতটি তিন ইঞ্চি পেরেক লইয়া ছুরা ইয়াছিন পড়িয়া মহব্বতের নিয়তে উহাতে দম করিবে। দম করিবার সময় অবশ্যই আশিক ও মাশুকের নাম ও যথাক্রমে তাহাদের পিতা ও মাতার নাম নিতে হইবে। অতঃপর সেই পেরেক চুলায় জ্বালাইতে হইবে। অতঃপর

যখন পেরেক সব গরম হইবে।
মতলুব দেওয়ানা হয়ে হাজের হইবে॥ ১

(৪) শুধু মহব্বতই নহে জুলাইয়ের ব্যাপারেও এই পুঁথিকারেরা আমালিয়াত ও তাবিজ ইত্যাদি নোছখা বাতলাইয়াছেন। যেমন :—

যদি কেহ 'জুলাই করিতে পয়দা বিচে দুজনার' চাহে তবে তাহাকে চল্লিশ রোজ চল্লিশটি সাদা পাথরে ছুরা ইয়া আ'তায়না পড়িতে হইবে। অতঃপর সেই সব পাথর তাহাদের ঘরে ফেলিতে হইবে। তাহা হইলে :—

(১) নকশে ছোলেমানী, ১ম ভাগ, ৩৩-৩৫ পৃঃ

আলবত্তা হইবে কীনা বিচে তুজনায়।
আদাওত ওাস্তে মোজারে'ব থতম।
অর্থাৎ এ আমলের তরতিব উত্তম॥ ১

(৫) শুধু ইহাই নহে। বিমারির হাল দরিয়াপ্ত করিবার জন্য এই সকল পুথিতে যাহা লিখিত আছে, তাহাও কম আশ্চর্যের নহে :—

রোগীর রোগ ঠাওর করিতে হইলে, রোগীর 'পায়ের আঙ্গুল হইতে পেশানীতক' মাপের সাত গুণ সুতা লইতে হইবে। উহাতে একবার দুরুদ শরীফ, সাতবার আলহামদো ও একবার আয়াতুল কুরছী পড়িয়া দম করিতে হইবে। অতঃপর নিম্নলিখিত দোআ সাতবার পড়িয়া প্রতিবার সুতার উপর ফুক দিতে হইবে।

قبوس مقوس و حماش ميعاش شافيش ماش ابوش برحمتك يا ارحم الرحمين -

তার পরে সেই সুতা লইবে তখন।
সেই বিমারী ফের মাপিবে বদন॥—
পায়ের অঙ্গুল হইতে পেশানী তক নিয়া।

কিন্তু এবারের মাপে সুতা কম অথবা বেশী হইয়া যাইবেই। এবং—

এক আঙ্গুল কম হইলে দেওয়ের নজর,
দুই আঙ্গুল কম হইলে আছিবের নজর,
তিন আঙ্গুল কম হইলে যাদুটোনা,
চারি আঙ্গুল কম হইলে উম্মে ছুব্বিয়ান।

পক্ষান্তরে ঐ সুতা—

এক আঙ্গুল বেশী হইলে মানুষের নজর,
দুই আঙ্গুল বেশী হইলে কাফতার নজর
তিন আঙ্গুল বেশী হইলে বাদের উৎপত্তি
এবং চারি আঙ্গুল বেশী হইলে—
"জ্বর জ্বালা হইল তায়
বুঝো এ বারতা।" ২

(৬) এই সকল দোআ তাবিজের সঙ্গে সঙ্গে বহু মন্ত্র—এছলামী মন্ত্র হিসাবে বাজারে চালু রহিয়াছে। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য উহার দুই একটা নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

—ভূত বন্ধন মন্ত্র—

কিছু সরিষার তৈল হাতে লইয়া নীচের মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করিয়া ঐ তৈল

১) ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭। ২) ঐ, পৃষ্ঠা ৫১।৫২।

মুখে মালিতে হইবে। তাহা হইলে কোন প্রকার ভূত প্রেত তাহার কাছে আসিতে পারিবে না, নিঃসন্দেহে ভাগিয়া যাইবে। মন্ত্রটি এই :—

মন্ত্র মন্ত্র মহামন্ত্র হরে মন্ত্র ছু,
ভাগ ভূত পালা ভূত, যারে ভূত ফু।
মামদো ভূত সামদো ভূত সর্ব্ব ভূত ভাগ,
মহা অগ্নি মহা অগ্নি শীঘ্র করি হাগ।
সর্ব্ব ভূত বন্ধ করি মন্ত্রের জোরে,
আমার কাছে নাহি আসিস কহি বারে বারে।
আল্লার ও নবীর দোহাই তোর তরে লাগে,
মোর নজর হতে ভাগরে ভূত
তোর বাপের আগে।
লাএলাহা ইল্লাহ ফু॥ ১

(৭) ঝড়ের ধ্বংসলীলার কারণ জানেন কি? এছলামী মন্ত্র নামক উক্ত পুথিতে বলা হইতেছে :

"যখন অতি প্রবল বেগে ঝড় হইতে থাকে তখন অনেক দেও, পরী, জেন, ভূত শয়তান ইত্যাদি ঝড়ের সঙ্গে মিশিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত চতুর্দ্দিকে নাচিয়া বেড়ায়, তাহারাই মানুষের ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়।"—

ঝড়ের তথা এইসব দেও ভূতের ধ্বংসলীলা বন্ধের বিভিন্ন আমালিয়াত ছাড়াও এক মোক্ষম 'ঝড় বন্ধন মন্ত্র' রহিয়াছে। তাহা এই :—

হুকার মন্তর মহামন্তর ঝড় বন্ধন করি,
ঝড়ের সাথে দেও দৈত্য জেন আর পরি।
বন্ধন করিয়া ফেলি চারিকুলের জোরে,
নাহি লাগিস আমার ঘরে বলি বারে বারে।
দোহাই ধর্ম্মের আল্লাহ নবীর কিরে,
আমার এই ঘরের দিকে নাহি তাকাস ফিরে।
ইল্লাহ ২ কুল কুল ফু,
বন্ধন লাগে ফট,
বালা ভাগে চট,
লাএলাহা ইল্লাল্লাহ
মালেকুল হক মাওলা। ২

১) এছলামী মন্ত্র, ৩৭।৭০ পৃঃ।
২) ঐ, ৭১ পৃঃ।

আরেকখানি পুথিতে "নারী বশীকরণ মন্ত্র" লিখিত আছে এই ভাবে:—

(১) এই ফুল কেতরে তোর ফুল ততরে
তোর ফুল স্বর্গে দোহাই এও ফুল পড়ে দিলাম
অমুক অঙ্গে গায় অমুক ঘর ছাড়ে দ্বার ছাড়ে
ছাড়ে বিবাহ স্বামী বা পাশ ছাড়ে
আমার সিজ্জে দিয়ে পা
সাত সমুদ্দুর পারে যা
কার আজ্ঞে কামরূপ কামাখ্যার আজ্ঞে
হাড়ি ঝি চণ্ডির আজ্ঞে
কার দোহাই ছোলেমানের দোহাই
শীঘ্র লাগ লাগ। ১

(২) মেয়ে মরদ ভুলানো মোহনী" মন্ত্র
কামরূপ কাউর দেশে কামিখ্যা দেবী যাহা বছে,
ইছমাইল যোগী দাগায়ে
বান সে ফুল নড়ে নয়না চমাইন ফুল
মোহে ফুল বছে যেছকি লাগে ফুলকি
রসে ও আবে মেয়ে পাছ পহ্লা পান
থর থর কাঁপে দোছরা পান ভূত ভূতনে চাপে
তেছরা পান শুরুকা জ্ঞান ছুত শুরুকা বন্দে
পান খয়ের সুপারী চুনা পান যা লাগে
গাথি নং হাতে সোবে হাতলিয়া তৈয়র শোবে
কপাল নর সিং কি মোহিনী
বিজলী চমকে লিলার পৌরী
দেখে জল মরি মেকো দেকে
অড়া দোহাই মহা দেও গৌরী পার্ব্বতী
নয়না চামাইন॥ ২

এই শ্রেণীর কদাচারগুলি যে হিন্দুসমাজে দীর্ঘকাল হইতে বহুলভাবে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, এক্ষণে তাহারও দুই একটা প্রমাণ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

(ক) মন্ত্রশক্তির দুর্জ্জয় প্রভাব সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন:—
দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাস্ত ব্রহ্মদৈবতম।

১) ছহি এলাজে লোকমানী বা দুনিয়াতে হুনিয়া, ১৮ পৃঃ।
২) ঐ, ১৮-১৯ পৃঃ।

অর্থাৎ "সমস্তই দেবতাদিগের অধীন, এবং দেবতারা মন্ত্রের অধীন এবং মন্ত্র সকল ব্রাহ্মণদিগের অধীন, অতএব ব্রাহ্মণগণ দেবতা কথিত হন।" কারণ যাহাকে ইচ্ছা হইবে সেই দেবতাকে মন্ত্র বলে আহ্বান করতঃ প্রসন্ন করার অধিকার (সনাতনী হিন্দুদের) আছে—ইত্যাদি। বন্ধনীর মধ্যস্থ অংশ স্বামী সত্যানন্দ বর্ত্তৃক মূল শ্লোকের অনুবাদ। তাহার পর স্বামীজী মন্ত্রশক্তির সত্যতার বিরুদ্ধে নানা প্রকার যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য মূল শ্লোকটা সম্বন্ধে। ইহা জানা যাইতেছে যে, হিন্দু শাস্ত্রমতে মন্ত্রের শক্তি দুর্জ্জয়। তাহাদ্বারা সকল প্রকার অসাধ্য সাধন করা যায়।

স্বামীজী সত্যার্থ প্রকাশের একাদশ সমুল্লাসে মন্ত্রদাতা পুরোহিতদিগের সম্পর্কে বলিতেছেন:—

"বাঙ্গলা দেশে তাহারা বিশেষতঃ একাক্ষরী মন্ত্রের উপদেশ দিয়া থাকে...দশ মহাবিদ্যার এইরূপ মন্ত্র:—

হ্রাং হ্রাং বগল মুখৈ ফট স্বাহা। ॥ হ্রাং ফটস্বাহা॥

কামরত্ন তন্ত্র, বীজমন্ত্রঃ ৪ ॥

"তদ্ব্যতীত মারণ, উচ্চাটন, মোহন বিদ্বেষণ ও বশীকরণ প্রয়োগ করিয়া থাকে।" ১

হিন্দু সমাজের ধর্মীয় সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহাদের সামান্য পরিচয়ও আছে, সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত "অভিচার" শব্দ তাহাদের অবিদিত থাকিতে পারে না। এই শব্দটি আমাদের দাবীর একটা বড় প্রমাণ। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে এখানে কিছু বলার দরকার আছে। সংস্কৃত অভিধানে আছে:—

অভিচার:...হিংসা কর্ম্ম। ইত্যমরঃ॥ অথর্ব্ব বেদোক্ত মন্ত্রযন্ত্রাদি-নিষ্পাদিত মারো-ণোচ্চাটনাদি হিংসাত্মক কর্ম্ম। ইতি ভরতঃ। মারণাদিফলকতান্ত্রিক প্রয়োগ বিশেষঃ। স -ষড়্‌বিধঃ। মারণং ১ মোহনং ২ স্তম্ভনং ৩ বিদ্বেষণম ৪ উচ্চাটনং ৫ বশীকরণম্‌ ৬। ইতিতন্ত্র সারঃ। ইত্যাদি। ২

বশীকরণের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইতেছে:—

'ওঁ নমঃ কামদেবায় সহকল সহদশ সহাম সহালিমে বহ্নে ব ধূননজনং মমর্দনং উৎকণ্ঠিতং কুরুকুরু দক্ষদধর কুসুমবাণেন হন হন স্বাহা'—ইহা যে নারীর উদ্দেশ্যে সপ্তাহ কাল জপ করা যাইবে, সেই নারী নিকটে আগমন পূর্ব্বক তাহার বশীভূতা হইবে। ৩

উপরের বিবরণে কএকটা উদাহরণ উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা এই শ্রেণীর কর্ম্মের উদাহরণের সামান্য নমুনা মাত্র। দোওয়া কবচ, মন্ত্রতন্ত্র, যাদুটোনা প্রভৃতির অন্ততঃ একশত উদাহরণ মুছলমান প্রচলিত "ইছলামী পুঁথি" পুস্তক হইতে সহজে সংগ্রহ

১) সত্যার্থপ্রকাশ, ৩৬৭ পৃষ্ঠা।
২) শব্দ কল্পদ্রুম।
৩) বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড।

করা যাইতে পারে। এই সব কুসংস্কার ও কদাচারে, দীর্ঘকাল ধরিয়া সমাচ্ছন্ন থাকার স্বাভাবিক ফল কি ঘটিতে পারে তাহা আর কাহাকেও বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। দেশ বিদেশের অমুছলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতেও পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাংলার মুছলমান তাহার জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য হইতে বঞ্চিত হইয়া, একটা নিকৃষ্ট পঞ্চম সমাজে পরিণত হইতে বসিয়াছিল এবং এই পরিস্থিতির অনুভূতি পর্যান্ত তাহাদের মন ও মস্তিষ্ক হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এ সম্পর্কে জার্মান ঐতিহাসিক Hans Kohn তাঁহার A History of Nationalism in the East গ্রন্থের ১৫ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন :—

Islam in the nineteenth century offers a surprising parallel. It was a period immediately preceding the supercession of the religious by the national world principle in the East. In the eighteenth century Islam to awaken from the lethargy in which, like Christianity before the Reformation, it was sunk. In both cases there were abuses, empty formalism, decadence. In the eighteenth cencury a ferment set in which shook all the length and breadth of Islamic world and tended in its after effects to revive Mohammedanism as a living force. During the nineteenth cencury, it advanced victoriously in all directions and proved its vitality. (Page 15)

...As in Africa so too in India and Sumatra the Wahabi movement proved a stimulating and vitalising force amongst Mohammedans and led, though only temporarily, to the establishment of theocratic Mohammedan States which sought to revert to the earliest traditions of Islam and were, at the same time, hostile to European influences. The Wahabi leaders in India were Syed Ahmed and Ismail Haji Maulvi Mohammed at the beginning of the nineteenth century. They had come under Wahabi influence on their pilgrimage to Mecca. They were deeply impressed with the religious corruption among India Mohammedans and the entermixtue of Hindu with Mohammedan customs and habits, and they resolved to dedicate themselves to the reform of Islam in India on the Wahabi model. In India, especially, many people were Mohammedans only in name. They

observed the customs of Hindus, celebrated their festivals, maintained there laws of inheritance and marriage, and prayed to their neibours' many gods. All this was to be changed. Islam was revived in all its primitive purity and fanatical austerity and the holy war against the Sikhs was preached. For a brief space the Indian Wahabies succeed in establishing a realm of their own in the Punjab, but in 1831 it was overthrown by the Sikhs. Nevertheless the influence of Wahabi doctrine was by no means extinguished. Its influence spread. A copious literature came into being, writen by the tow leaders already mentioned and their disciples. The Koran was diligently studied. The titles of the books are characteristic of the spirit which gave them birth. "The Awakener of the Heedless," "Confirmation in the Faith," "A Call to the Holy War," these are some of the titles. The Wahabi tropid exis-movement had breathed new life into the tropid existence of the Indian Mohammedans. 1

তরজমা:—"উনিবিংশ শতাব্দীতে এছলামে একটা চমৎকার সাদৃশ্য দেখা যায়। তখন ছিল প্রাচ্য জাতী নীতি কর্ত্তৃক ধর্মীয় স্থান অধিকারের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ। 'রিফরমেশনের' পূর্ব্বে খৃষ্টান ধর্ম যেমন জড়তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এছলামের অবস্থাও ঠিক তেমনি হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এছলাম ইহা হইতে জাগিয়া উঠিতে শুরু করে। উভয়ের ক্ষেত্রে অর্থহীন অনুষ্ঠান প্রিয়তা, অধঃপতন ও গ্লানী আসিয়া গিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমন একটা আন্দোলন শুরু হইয়া গেল যাহা সমগ্র মোছলেম জাহানকে কাঁপাইয়া তুলিল এবং পরবর্ত্তীকালে উহা এছলামকে একটা জীবন্ত শক্তিরূপে পুনরায় জাগরিত করিয়া তোলার শক্তিতে রূপান্তরিত হইল। উনবিংশ শতাব্দীতে দিকে দিকে ইহার জয়-যাত্রা চলিতে লাগিল। তাহাই উহার প্রাণশক্তির পরিচয় দিল।" (পৃষ্ঠা ১৫)

..."আফ্রিকার মত ভারত এবং সুমাত্রায়ও ওহাবী আন্দোলন মুছলমানদের মধ্যে একটা উদ্দীপনাময়ী ও প্রাণ সঞ্চারক শক্তি হইয়া পড়িল এবং অস্থায়ীভাবে হইলেও মোছলেম ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইল। এই রাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল এছলামের প্রথমযুগের ঐতিহ্যে ফিরিয়া যাওয়া। উহা ইউরোপীয় প্রভাবের বিরোধী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতে ওহাবীদের নেতা ছিলেন সৈয়দ আহমদ ও হাজী

1) Pages 25—26.

মৌলবী মোহাম্মদ এছমাইল। মক্কায় হজ্ব করিতে যাইয়া তাঁহারা ওহাবীদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতীয় মুছলমানদের ধর্মীয় কলুষ পরায়ণতা এবং হিন্দু রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের সাথে মোছলিম রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের মিশ্রণ দেখিয়া গভীরভাবে মর্মাহত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ওহাবী আদর্শে ভারতে এছলামের সংস্কার সাধনে নিজেদের উৎসর্গ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। তৎকালে অনেক লোক বিশেষ করিয়া ভারতে শুধু নামেমাত্র মুছলমান ছিল। তাহারা হিন্দুদের রীতিনীতি মানিয়া চলিত। তাহাদের পর্ব্ব-পার্ব্বনের অনুষ্ঠান করিত। বিবাহ-শাদী ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে তাহাদের আইন-কানুন মানিয়া চলিত এবং তাহাদের বহু দেব-দেবীর উপাসনা করিত। ওহাবীদের চেষ্টায় এই সবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। এছলামকে পুনরায় জাগাইয়া তোলা হইল। এছলামের প্রথমযুগের পবিত্র-নৈতিক দৃঢ়তা ফিরাইয়া আনা হইল এবং শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হইল। কিছুদিনের জন্য ভারতীয় ওহাবীরা পাঞ্জাবে নিজেদের একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইল। কিন্তু ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে শিখদের দ্বারা উহার পতন ঘটিল। ইহা সত্ত্বেও ওহাবী মতবাদের প্রভাব একটুও কমিল না বরং আরও বিস্তৃতি লাভ করিল। পূর্ব্বোল্লেখিত নেতৃবৃন্দ ও তাঁহাদের শিষ্যবৃন্দের দ্বারা প্রচুর সাহিত্য রচিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। অত্যন্ত যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে কোরানের পঠন ও অনুশীলন হইতে লাগিল। তৎকালীন গ্রন্থগুলির নাম দেখিলেই বুঝা যায় তাহারা কী উদ্দীপনা এবং তেজস্বিতা লইয়া উহা রচনা করিয়াছিলেন। এখানে কয়েকখানার নাম দেওয়া হইল:—তাম্বেহুল গাফেলীন, তকভিয়াতুল ঈমান, দাওয়াতে জেহাদ প্রভৃতি।

... ...

ভারতীয় মুছলমানদের জড়ত্ব-প্রাপ্ত জীবনে ওহাবী আন্দোলন নূতন প্রাণের সূচনা করিয়া দিয়াছিল।

Lt. Col. U. N. Mukherji তাঁহার "A Dying Race" গ্রন্থের ৮৯—৯১ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন:—

"Seventy five years ago there was little difference between a Mahomedan cultivator and Hindu of the same class. The cultivating Mahomedans and the degraded castes among the Hindus were undistinguishable excepting in name. Practically, the Mahomedans were regarded as one of the Hindu low castes. They were equally ignorant, equally poor, Their habits, mode of living, religious observances were practically the same."

"A local writer speaking from personal ecquaintance with the Mussalman peasantry in the northern districts of Lower Bengal

states that not one in ten can recite the brief and simple Kalma or creed whose constant repetition is a matter of most unconscious habit Mahomedans. He describes them as a sact which observes none of the ceremonies of its faith which is ignorant of the simplest formulas of its creed which worships at the shrines of a rival religion, and tanaciously adheres to practices which were denounced as the foulest abominations by its founder."

Things have changed considerably since. In such matters it is best to take the testimony of one who is neither a Hindu nor a Mahomedan. Sir W W. Hunter, Director General of Statistics with the Government of India, may be taken to be a sufficient authority Commenting on the above he writes :—

Fifty years ago these sentences would have truly described the Mahomedan peasantry, not only in the Northern districts, but throughout all Lower Bengal. In the cities or imid the serene palace life of the Mussalman nobility and their religious foundations, a few Maulvis of piety and learning calmly carried on the routine of thair faith. But the masses of the rural Mussalmans had relapsed into somthing little better than a mongrel breed of circumcised low caste Hindus. Since then, one of those religious awakenings, so characteristic of India, has passed over the Mahomedans of Bengal. Itinerant preachers, generally from the north have wandered from district to district, calling on the people to return to the true faith, and denouncing God's wrath on the indifferent and unrepentent. A great body of the Bengali Mussalmans have purged themselves of the taint of Hinduism and shaken off the yoke of ancient rural rites. The revival has had a three-fold effect-religious, social and political. It has a stimulated the religious instinct amon an imprissonable people, and produced an earnest desire to cleanse the worship of God and His Prophet from idolatry. This stern rejection of ancient superstitions has widened the fulf between

the Mahomedans and the Hindus. Fifty years ago the Bengali Mussalmans were simply a recognized caste, less widely separated from the Lower orders of the Hindus than the latter were from the Kulin Brahman. There were certain essential points of difference of doctrinal sort between the Hindu and Mahomedan villages; but they had a great many rural customs and even religious rites in common. The Mahomedan husbandman theoretically recognised the one Semetic God; but in a country, subject to floods, famines, the devastations of banditti and the ravages of wild beasts he would have deemed it a simple policy to have neglected the Hindu festivales in honour of Krishna and Durga * * * The reformed Mahomdean husbandmen now stand aloof from the village writes of the Hindus. The have ceased to be merely a seperate caste in the rural organisation and have become a distinct community, keeping as much apart from their nomiual co-religionists of the old unreformed faith as from the idolaterous Hindus. This social isolation from the sorrounding Hindus is the second effect of the Mussalman revival in Bengal. Its third result is political and affects ourselves."

তরজমা :—

পচাত্তর বৎসর আগে একজন মুছলমান কৃষক ও একজন হিন্দু কৃষকের মধ্যে সামান্যই তফাৎ ছিল। শুধু নাম ছাড়া মুছলমান কৃষক ও হিন্দুদের মধ্যে অধঃপতিত জাতের লোকের পার্থক্য করার আর কিছু ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মুছলমানদিগকে হিন্দুদের একটা নীচ জাতি বলিয়া গণ্য করা হইত। তাহারা সমান অজ্ঞ ও সমান দরিদ্র ছিল। তাহাদের আচার ব্যবহার, জীবন যাপনের ধরণ ও ধর্মাচরণ একই রকম ছিল।

"একজন স্থানীয় লেখক দক্ষিণ বাংলার...উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের মুছলমান কৃষক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয়ের অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়াছেন, প্রতি দশজনের মধ্যে একজনও সামান্য কলেমা পর্য্যন্ত জানে না অথচ জ্ঞাতে হউক অজ্ঞাতে হউক সর্ব্বদা এই কলেমা পড়া মুছলমানদের একটা অভ্যাসের ব্যাপার। তিনি তাহাদের এমন একটি সম্প্রদায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যাহারা নিজেদের ধর্ম্মের কোন নিয়ম

মানিয়া চলে না, বিধর্মীদের মন্দিরে যাইয়া পূজা করে এবং এছলাম প্রবর্ত্তক যেসব রীতিনীতিকে অতিশয় ঘৃণ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহারা তাহাই আঁকড়িয়া রহিয়াছে।"

তাহার পর সবকিছুর যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এ সম্পর্কে হিন্দুও নহেন মুছলমানও নহেন এমন একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করাই ভাল। ভারত সরকারের ডিরেক্টর জেনারেল অব ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ স্যার ডব্লিউ, ডব্লিউ, হাণ্টারের বিবরণকে যথেষ্ট প্রামাণ্য বলিয়া ধরা যায়। উপরোক্ত বিষয়ে মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, পঞ্চাশ বৎসর আগে কথাগুলির দ্বারা শুধু উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলির নহে, সমগ্র বাংলার মুছলমান কৃষকদের অবস্থা বুঝান যাইত। শুধু শহরে অথবা মুছলমান আমির ও ওমরাহের প্রাসাদের শান্ত জীবনে এবং তাহাদের ধর্মস্থানে নিষ্ঠাবান এবং পাণ্ডিত্যসম্পন্ন কতিপয় মৌলবী নিয়মিত ধর্মানুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু পল্লী এলাকার মুছলমান জনসাধারণ যে অবস্থার মধ্যে ছিল, তাহা থত্না করা নীচ হিন্দু জাতির বর্ণ শঙ্করের চাইতে সামান্যই উন্নত ছিল। তারপর ভারতে ধর্মীয় জাগরণের ওই প্রবাহ বাংলার মুছলমানদের উপর দিয়াও প্রবাহিত হইয়া গেল। প্রধানতঃ উত্তরাঞ্চলের পরিব্রাজক প্রচারকগণ জেলা হইতে জেলান্তরে গমন করিয়া মুছলমানদের আবার ঈমানের পথে ফিরিয়া আসার আহ্বান জানাইতে লাগিলেন। এবং বেখেয়াল ও অন-অনুতপ্তদের উপর আল্লার গজব সম্পর্কে হুঁশিয়ার করিয়া দিতে লাগিলেন। ফলে বহু সংখ্যক বাঙ্গালী মুছলমান পুরাপুরীভাবে হিন্দুয়ানী ত্যাগ করিয়া শুরু হইলেন, এবং প্রাচীন কাল হইতে গ্রামে গ্রামে যেসব আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তাহা ত্যাগ করিলেন। এই পুনরুজ্জীবনের ত্রিবিধ ফল হইল: ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক। এই আন্দোলন লোকের ধর্ম-বোধ জাগরিত করিয়া তুলিল, এবং তাহাদের মনে পৌত্তলিকতা হইতে আল্লাহ ও রছুলের নামকে পবিত্র রাখার একটা আন্তরিক বাসনা জাগিয়া উঠিল। প্রাচীন কুসংস্কারাদির এইরূপ কঠোর প্রত্যাখ্যানের ফলে মুছলমান ও হিন্দুদের মধ্যকার পার্থক্য আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর আগে মুছলমান শুধুমাত্র মুছলমান জাতি বলিয়া স্বীকৃত ছিল। কিন্তু আসলে কুলীন ব্রাহ্মণ ও নীচজাতীয় হিন্দুর মধ্যে যতটা তফাৎ ছিল তাহা অপেক্ষা কম তফাৎ ছিল নীচ জাতীয় হিন্দু ও ওই সকল মুছলমানের মধ্যে। হিন্দু ও মুছলমান গ্রামের মধ্যে তখন মতবাদ সম্পর্কিত কিছু কিছু মূল পার্থক্য ছিল সত্য কিন্তু উভয়ের মধ্যে গ্রাম্য প্রথা এমন কি একই প্রকার ধর্মানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল।...সংশোধিত মুছলমান কৃষকগণ এখন হিন্দুদের গ্রাম্য ধর্মানুষ্ঠান হইতে দূরে থাকিতে শুরু করিল। তাহারা এখন গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানে শুধু একটা স্বতন্ত্র জাতি রইল না—একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হইয়া উঠিল। এবং পৌত্তলিকদের হইতে যতটা দূরে থাকিতে লাগিল নিজেদের ধর্মের অসংশোধিত ব্যক্তিদের সংশ্রব হইতে ততটা দূরে রহিল। চারিপাশের হিন্দুদের সংশ্রব হইতে এই

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা হইতেছে বাংলায় মুছলমান পুনরুজ্জী'নের দ্বিতীয় ফল। ইহার তৃতীয় ফল হইতেছে রাজনৈতিক এবং তাহা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর।"

ঠিক এই সময় ভারত জুড়িয়া এক অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়ার সূচনা হইয়া গেল উত্তর ভারত হইতে আগত কতিপয় হক্কানী আলেমের বজ্র কণ্ঠের ছুরের ফুৎকারে। তখন তাহারা নিজেদের রহমানুর রহীম আল্লার নামে তেজঃ সঞ্চয় করিতে লাগিল, নিজেদের রাউফুর রহিম মোহাম্মদ মোস্তফার কাণ আহ্বান আবার তাহাদের মনেপ্রাণে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইল। আত্মপরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিল তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্দম আকাঙ্খা। তারপর কি হইল? উপরে উদ্ধৃত ঐতিহাসিক বর্ণনা-গুলিতে এ প্রশ্নের স্পষ্ট জওয়াবের সন্ধান পাওয়া যাইবে। মোছলেম বাংলার দিকে দিকে সেই জীবন জেহাদের দুর্বার প্রেরণা জাগ্রত হইয়াছিল কাহার ও কাহাদের দ্বারা, সম্ভব হইল ইনশাআল্লাহ পরবর্ত্তী সময়ে তাহার পরিচয় দানের চেষ্টা করিব।

পরিশিষ্ট

এছলামের আদর্শ

মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস সমাপ্ত করার পূর্ব্বে এছলামের প্রকৃত আদর্শ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় এখানে সংযোজিত করা একান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি, যাহাতে বাংলার মোছলেম সমাজ পূর্ব্বোল্লিখিত অনৈছলামিক কার্য্যকলাপ ও রীতিনীতি হইতে মুক্ত হইয়া সেই আদর্শ অনুসারে নিজেদের জীবন গঠনে প্রয়াসী হইতে পারেন। বস্তুতঃ মানবের মনের গতি পরিবর্ত্তনকারী হইতেছেন একমাত্র আল্লাহ এবং তিনিই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা রহমানুর রহীম। আমরা সঠিক পথের সন্ধান লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহারই আশ্রয় কামনা করি।

"এছলামের আদর্শ" কথাটা অত্যন্ত গভীর, অত্যন্ত ব্যাপক। এছলামের প্রকৃত স্বরূপের সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলে সে আদর্শের যথাযথ ধারণা করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। অথচ এই উপলব্ধির জন্য জ্ঞানের ও ভাবের মধ্য দিয়া যে সাধনার আবশ্যক হয়, তাহার আয়াস স্বীকারে আমরা অনেক সময় কুণ্ঠিত হইয়া থাকি। পক্ষান্তরে সে সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে যে নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের দরকার হইয়া থাকে, আমরা তাহারও বড় একটা ধার ধারিতে চাই না। ফলে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, আলোচনার সময় একদল সেই আদর্শকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া নিজেদের ধারণা ও সংস্কারের সহিত সমঞ্জস করিয়া লইতে প্রয়াস পাইতেছেন। আর এক দল নিজেদের সাময়িক খেয়াল হুজুক বা পরিকল্পনার সহিত সে আদর্শকে অসমঞ্জস মনে করিয়া সম্মোহিত মুছলমানকে তাহার মায়াপাশ মুক্ত করিয়া ফেলার জন্য ব্যাকুলি প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে এছলামী আদর্শের মারাত্মক সংকোচ ঘটাইয়া অংশতঃ অন্যান্যরূপে তাহার সংহার সাধনের চেষ্টা করিয়া নিজ নিজ শিক্ষা, রুচি ও আবহের অনুসারে সাময়িকভাবে বর্ত্তমানে যে স্বস্তি বা তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করা হইতেছে, বস্তুতঃ তাহা আত্মবঞ্চনার এবং সামাজিক হিসাবে আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র।

এই আলোচনার সময় আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই যে, সকল যুগের সকল দেশের, এবং সকল স্তরের ও সকল অবস্থার মানব সমাজের জন্য এক স্থায়ী শাশ্বত ও স্বর্গীয় আদর্শের নাম—"এছলাম"। নিজের সংস্কারের সহিত সমঞ্জস করিয়া লওয়ার জন্য তাহার সেই বিরাটত্বের খর্ব্ব করিতে যাওয়া যেমন অন্যায়, সাময়িক পরিকল্পনা বিশেষের সহিত অসামঞ্জস্যের আশঙ্কায় তাহাকে অস্বীকার করিতে যাওয়াও

সেইরূপ অসমীচীন, অযৌক্তিক। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পরিবর্ত্তনশীল বর্ত্তমানের কল্পিত বাস্তবতার মধ্যে কোন আদর্শকে আবদ্ধ করিতে যাওয়া, আর আদর্শ শব্দের মূল তাৎপর্য্যকে অস্বীকার করা একই কথা। এছলামের আদর্শ সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় এই সত্যের যথাযথ প্রণিধান করা বিশেষরূপে আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। বিশ্ব মানবকে স্তবকে স্তবকে উন্নীত করতঃ তাহাকে ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততম আদর্শের দিকে আকর্ষণ করাই এছলামী আদর্শের বিশেষত্ব। لتركبن طبقا عن طبق মানুষকে নিশ্চয়ই স্তরে স্তরে আরোহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে

يا ايها الا نسان انك كادح الى ربك كد حا فملاقيه -

"হে মানব! নিজের রবের ১ পানে (অগ্রসর হইবার জন্য) তোমাকে যথেষ্ট প্রচেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে, তাহার পর এমন এক অবস্থা আসিবে, যখন তুমি তাঁহার "লেকা" বা মিলন লাভ করিতে পারিবে ১

সেই জন্য এছলামের আদর্শ একদিকে যেমন বর্ত্তমানকে অস্বীকার করে না, অন্যদিকে বর্ত্তমানকে মাত্র অবলম্বন করিয়া তাহার মধ্যে সমাপ্ত হইয়া যায় না— সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে না। ভবিষ্যতের অসংখ্য অনাগত বাস্তব নূতনের সৃষ্টির জন্য চিরকালই সে আদর্শের সদা-সর্জ্জন কটীয়সী শক্তির অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকিবে। কোরআনের বর্ণিত বিশ্বমানবের এই অবিরত অপ্রতিহত সাধনাকে, সুনিয়ন্ত্রিত সুপরিচালিত ও সাফল্যমণ্ডিত করার নিমিত্ত, সে আদর্শের আবশ্যক চিরকালই হইতে থাকিবে। এছলামের এই আদর্শকে তাহার যথাযথরূপে দর্শন করার প্রয়াস যাঁহারা পাইয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে, বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান সাধনার মূলীভূত পিপাসার উপলব্ধি করিতে যাহারা সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ন্যায়তঃ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, মানুষের চিন্তার ক্রমমুক্তি এবং তাহার জ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, এছলামের স্বরূপ ও তাহার আদর্শও অধিকতর সুন্দর, অধিকতর উজ্জ্বল এবং অধিকতর ব্যাপক রূপে বিকশিত হইতে থাকিবে, তাহার সত্যতা অধিকতর দৃঢ় যুক্তিপ্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে রহিবে। ইহা ভাবপ্রবণতার যুক্তিহীন অভিব্যক্তি নহে—ভাবহীন যুক্তিবাদের অনর্থক আত্মম্ভরিতাও নহে। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় ইহা স্বয়ম্প্রকাশ ও স্বয়ম্প্রমাণ অকাট্য সত্য, আজিকার জ্ঞান গবেষণার বহু সিদ্ধান্তকে এই দাবীর প্রমাণরূপে পেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটা মূল প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইবে মাত্র।

এছলামী আদর্শের সত্যকার স্বরূপকে যথাযথভাবে জ্ঞাত হইতে ও গ্রহণ করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে জানিতে হইবে আল্লার প্রেরিত কোরআনকে—সেই কোরআনের বাহক ও বাস্তব স্বরূপ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে। প্রকৃত পক্ষে কোরআন ভাব,

১) আল-কোরআন।

আর মোস্তফা তাহার অভিব্যক্তি, কোরআন শিক্ষা এবং হজরত তাহার আদর্শ। ভাব ও অভিব্যক্তির এই মহা সম্মিলনের সারৎসার যাহা, তাহাই হইতেছে—"এছলামের আদর্শ।" বলা বাহুল্য যে, এ আদর্শের বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার মূল উৎসের বিশেষ পরিচয় গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। এ সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে সাধকের প্রথম দরকার হইবে—যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসার, তাহার গভীরতর সত্যলিপ্সার ও অবিচল সঙ্কল্পের। সেই জন্য কোরআনের প্রথম পারার প্রথম আয়াতে, বুখারীর প্রথম পারার প্রথম হাদীছে এই নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের ছবক পড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই নিষ্ঠা অর্জন ও সঙ্কল্প গ্রহণের পর, নিজের শক্তির পরিমাণ ও 'অধিকারে'র আয়তনটুকুকে অনতিরঞ্জিতরূপে বেশ করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। অন্যথায় সব সাধনাই পণ্ড হইয়া যাইবে। তাহার পর নিজ নিজ শক্তি ও অধিকার অনুসারে অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

কোরআন সকল দেশের, সকল যুগের সমস্ত মানুষের সর্ব্ববিধ মঙ্গল ও মুক্তির জন্য প্রেরিত আল্লার শাশ্বত বাণী—আর মোস্তফা হইতেছেন সেই বাণীর মূর্ত্ত স্ফূর্ত্ত বাস্তব বিকাশ। বিবি আয়েশাকে হজরতের 'চরিত্র' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তর বলেন, خلقه القرآن কোরআন হইতেছে তাঁহার চরিত্রের বাস্তব প্রকাশ।

অনুমান বা অনুগতির বশবর্ত্তী হইয়া একথা বলিতেছি না, কোরআন হাদীছের বহু দলিল দ্বারা ইহা স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে, এবং মুছলমান আলেমগণ ইহা একবাক্যে স্বীকারও করিয়া থাকেন। অতএব এই হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, কোরআনের শিক্ষায়, সকল যুগের সকল মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধানে এছলামের যোগ্যতায়, এবং মোস্তফা-জীবনের স্বর্গীয় আদর্শ, কস্মিনকালে কোন দিক দিয়া কোনও প্রকারের স্থবিরতা স্পর্শ করিতে পারে না। তাহা চির সরস চির সবুজ, চির সজীব চির সচল। সুতরাং সকল যুগের সকল মানুষের জন্য তাহা চির বরণীয় ও চির অনুকরণীয় আদর্শ হওয়ার যোগ্য। এই জন্য হজরত স্বয়ং এছলাম ও ফেৎরত (প্রকৃতি বা Nature) কে অভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

কোরআনেও 'দিন' ও 'ফেৎরত' একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সংক্ষেপে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি জিনিষটা যেমন ব্যাপক হইলেও দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাহার একটা স্বতন্ত্র প্রভাব বিদ্যমান, তাহা যেমন যুগপৎভাবে পুরাতন ও নিত্য উভয়ই সেইরূপ দুনয়ার প্রাকৃতিক ধর্ম্ম এছলাম ব্যাপক হইয়াও যুগে যুগে অভিনব স্বরূপ লইয়া প্রকটমান এবং যুগপৎভাবে তাহা সনাতন ও শাশ্বত উভয়ই। বুড়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকৃতির আইন কানুন যেমন অচল হইয়া পড়ে না, প্রাকৃতিক ধর্ম্ম এছলামও সেইরূপ কখনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই—হইবেও না। আদম চোখ মেলিয়া দেখিয়াছিলেন এই এছলামকে, জগতের সকল দেশের সমস্ত নবী রছুল সমস্ত সত্যকার মুনি ঋষি, এই এছলামেরই এক এক দিকের সাধনা করিয়া গিয়াছেন এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন

ভাষায় প্রকাশিত আল্লার কালামগুলি এই এছলামের এক এক অংশের এক একটা ভাবধারার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছে। তাহা পুরাতন অথচ নিত্য, তাহা সনাতন অথচ শাশ্বত। ইহা এছলামের একটা প্রধান অভিজ্ঞান এবং স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক যে, শেষ নবী ও শেষ ধর্ম্মের তাহার যে দাবী একমাত্র এই সত্যের উপর তাহার সমীচীনতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। নচেৎ দাদা আদম হইতে হজরত ঈছা পর্য্যন্ত দুনয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে এই বহু সংখ্যক কেতাব ও হাজার হাজার নবী আসিবার অনুকূলে কার্য্যকারণের যে হেতুবাদ, সে কারণপরম্পরার তিরোধান ত এখনও হয় নাই?

আমরা উপরে যে সকল মতের অভিব্যক্তি করিয়াছি, অন্ততঃ "নীতির" হিসাবে তাহা সকলের স্বীকৃত। এই মতের প্রত্যেক দিকের যথাযথ আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনার আবশ্যক হইবে। দলিল প্রমাণ উল্লেখ করা আজ সম্ভব হইবে না, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এই মতটা পরিস্ফুট করার জন্য এখনকার মত রছুলে করিমের একটি হাদীছ—স্বয়ং তাঁহার মুখের বাণী, নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি।

হজরত আলি বলিতেছেন, একদা হজরত সমবেত ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মুছলমানদিগের উপর অতঃপর একটা ঘোর বিপদ, একটা ভয়ঙ্কর পরীক্ষা উপস্থিত হইবে।" আলী বলিতেছেন, আমি আরজ করিলাম—হজরত! সে বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? হজরত বলিলেন, "উপায় আল্লার কেতাব। অতীতের সব বারতা, ভবিষ্যতের সকল পয়গাম এবং বর্ত্তমানের সমস্ত করণীয় এই কেতাবে নিহিত রহিয়াছে। এই কেতাব হইতেছে দুনয়ার সকল সমস্যার সার্থক সমাধান। সাবধান! ইহাকে পরিত্যাগ করিলে অবিলম্বে তোমাদের টুকরা টুকরা উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহাকে ছাড়িয়া পথের সন্ধান করিতে গেলেই তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। এই কোরআন হইতেছে আল্লার সুদৃঢ় রজ্জু, তাঁহার প্রেরিত জ্ঞানময় শিক্ষা এবং তাঁহার নির্দ্ধারিত সহজ সরল মুক্তিপথ। অধিকন্তু এই কেতাবের বিশেষত্ব এই যে,

لاتشبع منه علماء ولا يخلق على كثرة الرد ولاتنقضي عجائبه

অর্থাৎ (ক) বিদ্বৎসমাজ যতই তাহার অনুশীলন করিবেন, নিত্যনূতন সত্যের সন্ধান পাইয়া তাঁহাদিগের জ্ঞানলিপ্সা ততই বাড়িয়া যাইবে, সে জ্ঞানের বা জ্ঞানলিপ্সার পরিসমাপ্তি হইবে না—(খ) পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহা কখনও পুরাতন বা অব্যবহার্য্য হইয়া যাইবে না—(গ) তাহার অভিনবত্ব কখনই শেষ হইয়া যাইবে না।১

হজরত রছুলে করিমের এই হাদীছ হইতে কোরআনের ও এছলামের স্বরূপ অত্যন্ত স্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান হইয়া যাইতেছে। এছলামের আদর্শের অনুসন্ধান করিতে হইবে

১) দারেমী ও তিরমিজী—মর্ম্মানুবাদ।

এই কোরআনে—হজরতের দেওয়া এই দিব্য আলোকের সাহায্যে। অশেষ পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এ জ্ঞান হইতে মুছলমান আজ নিজেকে বঞ্চিত করিয়া লইয়াছে, এ আদর্শ হইতে সে আজ লক্ষ যোজন দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাই আজ সে অবশ অচলভাবে নিজের জাতীয় জীবনকে এমন দুর্ব্বহ বলিয়া মনে করিতেছে, তাহার স্থবির পঙ্গু মস্তিষ্কটা কেবল বিভীষিকার স্বপ্ন দেখিতেছে; আর তাহার আবিষ্ট আড়ষ্ট কণ্ঠে কেবল মরণের আর্ত্তনাদ জাগিয়া উঠিতেছে।

এছলামের প্রকৃত আদর্শের অনুশীলন ও অনুসরণ করিতে হইলে কোরআনকে অবলম্বন করিতে হইবে, একথা প্রত্যেক মুছলমানই অন্ততঃ মৌখিকভাবে স্বীকার করেন। কিন্তু কোরআনের সত্যকার স্বরূপকে কার্যতঃ অস্বীকার করিতেও অনেকে আবার কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করেন না। একটা উদাহরণ দিয়া কথাটা পরিস্ফুট করার চেষ্টা করিব।

দেশাচারের চাপ, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব এবং পূর্ব্ববর্ত্তীগণের মতের অন্ধ অনুগতি দ্বারা মানুষের জ্ঞান বিবেক ও তাহার চিন্তাধারা বিকৃত ও বিপথগামী হইয়া পড়ে, এবং কোন সত্যকে দর্শন বা গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে দাসত্বের এই লা'নৎ হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়াই যে এছলামের একটি অন্যতম সাধনা, যাঁহারা সরাসরিভাবেও কোরআনের যোন অংশ একবার পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, সে কথা তাঁহাদিগকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু কোরআন এখন আর বিশ্বমানবের সাধারণ সম্পদ নহে, হজরতের বর্ণিত তাহার সমস্ত গুণ এখন তিরোহিত হইয়া গিয়াছে! দীর্ঘ এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সে অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। কারণ আমাদিগের পুরোহিত পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, কোরআন সম্বন্ধে যাহা কিছু করার ছিল, যাহা কিছু ভাবার ছিল, যাহা কিছু বলার ছিল, বোজর্গানে দীন ও ছলফে ছালেহীন বহু পূর্ব্বে সে সমস্তই ভাবিয়া ও বলিয়া শেষ করিয়া রাখিয়াছেন। কেবল ছওয়াব হাছেল করার জন্য তুমি কোরআন শরীফের আবৃত্তি মাত্র করিতে পার, ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখাইবার জন্য তাহা চুম্বন করিতে পার, তাহা সুশ্রী যুজদানে পুরিয়া বরকতের জন্য ঘরের মাচার উপর তুলিয়া রাখিতে পার। কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত ভাব ও শিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার কোন অধিকারই তোমার নাই—আর তুমি ত' কোন্ ছার, দুনয়ার শ্রেষ্ঠতম আলেমেরও আজ সে অধিকার নাই—কস্মিনকালেও আর হইবেও না। অধিকন্তু তফছীরের রাবীগণ যে আয়তের যে শব্দের যে অর্থ এবং যে তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এক বর্ণের এক বিন্দুর যোগ-বিয়োগ হইতে পারিবে না। কারণ এজতেহাদের দরওয়াজাও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে চিরকালের তরে সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পাঠক পাঠিকাগণ কোরআনের ও হজরতের এছলামের সহিত, মানুষের রচিত এই অভিনব এছলামের তুলনায় সমালোচা করিয়া দেখুন, আর বিচার করিয়া বুকে হাত দিয়া বলুন—ইহা অপেক্ষা এছলামের সর্ব্বনাশ আর কি হইতে পারে?

ফলে মানুষের মন ও মস্তিষ্কের যে নিগড়গুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়াই ছিল এছলামের প্রথম সাধনা, তাহাই আজ এছলাম নামে অভিহিত হইতেছে। জ্ঞানের এই মর্ম্মন্তুদ আত্মহত্যার উপমা নাই, তাই মুছলমানের এই অচিন্তনীয় অধঃপতনেরও তুলনা নাই!

অথচ কোরআন প্রেরণ করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন :—

کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیذکر او لوا الا لباب ـ

"হে মোহাম্মদ! এই কল্যাণময় মহাগ্রন্থ আমরা তোমার প্রতি এই জন্য নাজেল করিয়াছি, যেন সকলে তাহার আয়াত (বচন, যুক্তি প্রমাণ) গুলি অনুশীলন করিয়া দেখে, বিশেষতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ যেন তাহা হইতে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। (ছুরা ছাদ)

চিন্তাশীল পাঠক, আল্লার এই আয়তের সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া দেখুন!

কোরআনের আর এক স্থানে বলা হইয়াছে :—

و لقد یسر نا القران للذ کر ـ فهل من مد کر ؟

"লোকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করিবে এই উদ্দেশ্যে বস্তুতঃ কোরআনকে আমরা নিশ্চয়ই সহজ করিয়া দিয়াছি, অতএব আছে কি কেহ চিন্তাশীল? ১

আল্লার এ প্রশ্নের উত্তর কি দিতে চাও, হে আলেম সমাজ! আল্লাহকে ভাবিয়া একবার মুক্ত কণ্ঠে তাহা প্রকাশ কর। আজ অগণিত আল্লার বান্দা তাঁহার তখতে আলাকে সম্বোধন করিয়া তোমাদিগের নামে যে নালিশ করিতেছে—তাহার উত্তর দাও! শ্রবণ কর, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের সমবেত আর্ত্তনাদ :—হে আল্লাহ! আমরা তোর আহ্বানে সাড়া দিবার—তোর পবিত্র কালামের অনুশীলন করার জন্য প্রস্তুত, লালায়িত। কিন্তু তোর প্রিয় নবীর নাএব হওয়ার দাবীদারগণ আজ জোর করিয়া তোর প্রদত্ত সেই "শিফা ও রহমত" হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত রাখিতেছে।

আল্লার রাছুল কিয়ামতের দিনে পরওয়ারদেগারের হুজুরে ফরয়াদ করিয়া বলিবেন :—

رب ان قومی اتخذ وا هذا القرآن مهجورا ـ

হে পরওয়ারদেগার! আমার কওম এই কোরআনকে তামাদী বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছিল। ২

আল্লাহ বলিতেছেন—বিশ্বমানবের জ্ঞান আহরণের জন্য কোরআনকে সহজসাধ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর মানুষের অভিমত তাহার প্রতিবাদ করিয়া উচ্চকণ্ঠে

---

১) ছুরা কমর, ১০ আয়ত।
২) ছুরা ফুরকান।

ঘোষণা করিতেছে—কোরআন অত্যন্ত কঠিন, মানুষের পক্ষে একেবারে অবোধগম্য। আল্লাহ্ বলিতেছেন—সর্ব্বসাধারণকে কোরআনের অনুশীলন করিতে, জ্ঞানবান ব্যক্তিবর্গকে তাহা হইতে তত্ত্ব আহরণ করিতে। তিনি ইহাও বলিয়া দিতেছেন যে, দুনিয়ায় কোরআনের আবির্ভাব হইয়াছে কেবল এই উদ্দেশ্যে। আর মানুষের ফরমান আমাদিগের জ্ঞান গবেষণার মস্তকে লাঠিঘাত করিয়া আমাদিগকে বলপূর্ব্বক তাহা হইতে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা করিতেছে। কোরআনের বাহক হজরত রছুলে করিম বলিতেছেন, ভবিষ্যতের কোন যুগেও কোরআনের অভিনবত্ব শেষ হইবে না, তাহার সজীব সচল স্বরূপের বিকাশ অনিত্য নহে, ক্ষণস্থায়ীও নহে। তিনি স্পষ্টকণ্ঠে বলিয়া দিতেছেন—বিশ্বের জ্ঞানীজনেরা যুগে যুগে যতই কোরআনের অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের সেবা করিবেন তাহার অনন্ততার স্বরূপও সঙ্গে সঙ্গে ততই স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে। তাহা ফুরাইয়া যাইবে না, পুরাতন হইবে না, কোন যুগে অচল বা তামাদি হইয়া যাইবেনা। আর সেই রছুলের নায়েবগণ বলিতেছেন—সে ভাণ্ডার ফুরাইয়া গিয়াছে, সে উৎস শুকাইয়া গিয়াছে। এখন আল্লার বাণী অচল হইয়া পড়িয়াছে, তাহার আসন অধিকার করিয়াছে—তফছিরের রেওয়ায়ত।

এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে, আল্লার কালাম বড় না কয়েকজন মওলবীর ফতওয়া বড়? অর্থাৎ এখন মুছলমানের চোখে আল্লা ও কয়েকজন মওলবীর মধ্যে কে বড় কে ছোট, কাহার আদেশ পরিত্যাজ্য এবং কাহার হুকুম অগ্রগণ্য? এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর মুছলমানের ও এছলামের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। আমাদিগের মুখে এই উক্তি শ্রবণ করিয়া অনেকে হয়ত ক্রোধে অভিমানে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিতেছেন। এমন সাংঘাতিক কথা, এমন ভীষণ উক্তি! এক আল্লার উপাসক মুছলমান, অনাবিল তাওহীদের শ্রেষ্ঠতম সেবক মুছলমান, তাহার সম্বন্ধে এমন জঘন্য অভিযোগ কি ক্ষমা করা যাইতে পারে! আমাদের এই উক্তি যদি বাস্তবে কোন মুছলমানের অন্তঃকরণে প্রকৃত ক্রোধের সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব। কিন্তু এক্ষেত্রে বিনীতভাবে জানাইয়া রাখিতে চাই যে, আল্লার শাশ্বত বাণী কোরআন মুছলমানের এই লজ্জাজনক অধঃপতনের আভাস দিয়া রাখিতেও ত্রুটী করে নাই। এহুদী ও খৃষ্টানদিগের চরম আদর্শ মুছলমানের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া কোরআন নিজেই বলিতেছে :—

। اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم

আল্লাহকে পরিত্যাগ করতঃ নিজেদের আলেম ও পীর-ফকিরদিগকেই তাহারা রব বানাইয়া লইয়াছে। আর রব বানাইয়াছে মরিয়মের পুত্র মছীহ্‌কে। এই আয়তের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা লইয়া বাকবিতণ্ডার কোন আবশ্যক নাই। কারণ, যাহার উপর ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল তিনি স্বয়ং এই আয়তের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। হাদীছের কিতাবে বর্ণিত

হইয়াছে যে, আদী এবনে হাতেম ছাহাবী হজরতের মুখে এই আয়তের আবৃত্তি শুনিয়া একটু বিস্মিতভাবে বলিলেন—কই তাহারা ত নিজেদের আলেম ও পীরদিগকে খোদা বলিয়া গ্রহণ করে নাই। হজরত তখন বুঝাইয়া বলিলেন—তাহাদের পণ্ডিত ও সাধুরা যে কাজকে সঙ্গত বলিয়া ব্যবস্থা দেয়, তাহারা বিনা বিচারে তাহাকে হালাল বলিয়া গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে ঐ আলেম ও ফকিরেরা যে কাজকে নিষিদ্ধ বলিয়া ফতওয়া দেয়, তাহারা চোখ বন্ধ করিয়া তাহাকে অন্যায় বলিয়া ধরিয়া লয়। ইহাই হইতেছে আল্লাহকে ত্যাগ করা, ইহাই হইতেছে পীর পুরোহিতদের আল্লার আসনে বসাইয়া দেওয়া, আর ইহাই হইতেছে ঐ শ্রেণীর আলেম ও পীর ফকিরদিগের স্পষ্ট খোদাই দাবী। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, কোরআনের প্রকৃত স্বরূপের যথাযথ ধারণা করিতে হইলে মানুষকে খোদার আসন হইতে নামাইয়া ফেলিতে হইবে, বহু খোদার পূজা পরিত্যাগ করিয়া মুছলমানকে আবার এক আল্লার উপাসক হইতে হইবে, আল্লার দেওয়া মুক্ত জ্ঞানকে লইয়া মুক্ত এছলামের সেবায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পথের কণ্টকগুলিকে দলিয়া মথিয়া গন্তব্যের দিকে চলিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে প্রথম প্রথম পায়ে এক আধটুক বাধিবে—তাহা সহিয়া লইতে হইবে।

আরবী ভাষা পূর্ব্বের ন্যায় জীবন্ত ও সচল হইয়া আছে। ব্যাকরণ অলঙ্কার অভিধানাদির কত অমূল্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়া আরবী সাহিত্যকে পুষ্টতর করিয়া তুলিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে তাহার সম্পদ আজ শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। দুনয়ার সমস্ত মোহাদ্দেছগণের সঙ্কলিত রত্নভাণ্ডারস্বরূপ হাদীছ গ্রন্থগুলি সমস্তই আজ আমরা একত্রে হস্তগত করিতে পারিতেছি। "দুনয়ার প্রাচীন ইতিহাস ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব পুরাতত্ত্বের নিত্য নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের উপাখ্যান ভাগের সত্যতা বাস্তবতার দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইতেছে।" ১ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত অভিনব আবিষ্কারে কোরআনের কত অজ্ঞাত পূর্ব্বতত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছে। মানুষের দেওয়া আবরণের শত অন্তরাল হইতেও এছলামের নূরের আভাস দেখিয়া আজ দুনয়া তাহাকে চিনিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে—ভবিষ্যতের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে চাহিতেছে। অথচ ইহারা কোরআনকে লইয়া সামিয়া ফেলিতেছে—হাজার বৎসরের এক ঘুণধরা দুর্গন্ধ সিন্দুকের আবর্জনা স্তূপের মধ্যে।

তফছীরকারগণের মত অর্থাৎ দীর্ঘ বার শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ণিত এক ডজন রাবীর পরস্পর বিরুদ্ধ কল্পনা—যাহা বহু স্থলে কোরআন হাদীছের ও এছলাম ধর্ম্মের মূলনীতির, ব্যাকরণ অলঙ্কার ও অভিধানের, সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের এবং নিত্য লক্ষিত শত শত প্রত্যক্ষ সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহার অধিকাংশ খোশ খেয়ালের কল্পনা, অথবা এহুদী, খৃষ্টান ও মজুছ-দিগের প্রক্ষিপ্ত পুরাণ পুঁথির প্রচলিত কিংবদন্তির বিকৃত বা অবিকল নকল ব্যতীত

আর কিছুই নহে। যে রেওয়ায়তগুলির মূল রাবীগণের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বতন এমাম ও চরিতশাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত কঠোর ও অপ্রীতিকর সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছেন—তাহার অন্ধ অনুকরণ না করিলে সমস্ত দীন, ঈমান পণ্ড হইয়া যাইবে! এই মারাত্মক সংস্কারকে দূর করিয়া দিতে না পারিলে এছলামের প্রকৃত আদর্শকে দেখা ও দেখান সম্ভবপর হইবে না।

এই চিত্রের আর একটা দিক আছে, এই প্রসঙ্গে তাহারও একটু আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আজকাল সমাজে একশ্রেণীর লোক পাশ্চাত্যবাদের অন্ধ অনুকরণে আপনহারা হইয়া পড়িয়াছেন। এই সংস্কার তাঁহাদের মন ও মস্তিষ্কের উপর এমন প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে যে, তাহার বিপরীত প্রত্যেক বিষয়কে তাঁহারা বিনা বিচারে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত। বিজ্ঞানের নামে তাঁহারা অজ্ঞানের মত অনেক প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। progressive Science-এর নিত্য পরিবর্ত্তনশীল থিওরিগুলি তাঁহাদের নিকট Exact Science রূপে গৃহীত হয়, এবং বিজ্ঞানের নামে বৈজ্ঞানিকের থিওরী মাত্রকে অবলম্বন করিয়া তাহার মধ্যবর্ত্তীতায় ধর্ম্মশাস্ত্রের সমালোচনা করার জন্য, তাঁহারা অনেক সময় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যুক্তির হিসাবে কোরআনের সমালোচনা করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না বটে, কিন্তু পাশ্চাত্যের ভাবধারার অনুকরণ করার সময় বৈজ্ঞানিক থিওরিগুলিকে অকাট্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করার কালে, তাঁহাদের যুক্তিবাদের এই বহু বিশ্রুত অভিমানটির বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, এক শ্রেণীর পণ্ডিত কোরআনকে আধুনিকতার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য অতি নির্ম্মমভাবে যথেচ্ছাচারের পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ইহাও সংস্কারের দাসত্ব, ইহাও হুজুকের গড্ডালিকা প্রবাহে আত্মসমর্পণ। এখানে তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বৈজ্ঞানিকের থিওরি আর বিজ্ঞানের সত্য এক নহে, জ্ঞানের স্বাধীনতা আর প্রবৃত্তির উচ্ছৃংখলতা এক নহে। পায়জামা কোর্ত্তা পরা সংস্কারের ন্যায় কোট পাৎলুন আঁটা সংস্কারগুলিও মানুষের জ্ঞানের পক্ষে সমান মারাত্মক। এছলামের প্রকৃত আদর্শ গ্রহণ করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে এ সংস্কারের হাত হইতেও মুক্তিলাভ করিতে হইবে।

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনার গোলাছা এই যে, এছলামের স্বর্গীয় আদর্শগুলির পরিচয় জানিতে হইলে কোরআনের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। আল্লার শাশ্বত বাণী এই কোরআন, সকল যুগের সকল দেশের সমস্ত মানুষের জন্য সমান ভাবে উপযোগী, সমান ভাবে কার্য্যকরী এক চিরস্থায়ী অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার। কোরআন দুন্‌য়ার সব সমস্যার সমাধান, কোরআন বিশ্বমানবের অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার, কোরআন আল্লার প্রতিষ্ঠিত জীবন আদর্শ। সুতরাং মুছলমান অমুছলমান নির্ব্বিশেষে আল্লার সকল বান্দার সমান অধিকার তাহাতে আছে এবং চিরকাল থাকিবে। কোরআনের জীবন্ত জলন্ত ব্যাপক ও শাশ্বত স্বরূপকে উপেক্ষা করিয়া, বিশ্বমানবের এই আল্লাহ-প্রদত্ত

অধিকারকে অস্বীকার করিয়া মুছলমান নিজের, এছলামের এবং বিশ্বমানবের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানের সমস্ত স্থবিরতা এবং সমস্ত অধঃপতনের মূল এইখানে। নূতন যাত্রার এই শুভ মুহূর্তে, জীবন সাধনার এই পুণ্য প্রভাতে আমাদিগের প্রত্যেক যাত্রীকে, প্রত্যেক হাদীকে, এ কথাগুলি সর্ব্বাগ্রে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া লইতে হইবে। সাবধান! পশ্চাতে 'ভূতের' মায়া কাঁদন, সম্মুখে আলেয়ার জলন্ত মোহ। সাবধান!

در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق
هر هو سنا کے نداند، جام و سندان باختن!

فالحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات والصلوة والسلام على مفخر الموجودات
محمد المصطفى و على اله واصحابه مادامت الارض والسموات

সমাপ্ত